কালের নায়ক

বিমল কর

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৬৩

দ্বিতীয় মুদ্রণ

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন : গৌতম রায়

মুদ্রণ : চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও তাপসী প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলি-৬ হইতে শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীসমরেশ মজুমদার

কল্যাণীয়েষু

আমাদের প্রকাশিত

এই লেখকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই :

সীমারেখা

সঙ্গিনী

যাদুকর

স্বপ্নের নবীন ও সে

পরবাস

কালের নায়ক

দেওয়ালে পিঠ দিয়ে সতীন চুপচাপ বসে ছিল। বসে বসে রাস্তা দেখছিল। অলস ভাবে বসে থাকলেও তার চোখ দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন কারও অপেক্ষা করছে। শরৎ কাফে-র সামনের সিঁড়িতে রোদ এসে গেছে অনেকক্ষণ ; আর একটু পরেই চৌকাট ডিঙিয়ে দোকানে ঢুকে পড়বে। দোকানের চৌকাটে রোদ এলে এগারোটা বেজে যাবে। সতীনরা এসব জানে। শরৎ কাফে-র দেওয়ালে ঝোলানো ঘড়ির দিকে না তাকিয়েও সময়টা বলা যায়, আরও নির্ভুল ভাবে, সঠিক ভাবে। সামনের রাস্তার দিকে তাকালেও মোটামুটি সময়টা বোঝা যায়। যেমন, এখন রাস্তার দিকে তাকিয়ে সতীন খুব একটা ভিড় দেখছে না। পাড়ার বাবুদের বাজারহাটের হিড়িক, অফিস ছোটার পালা শেষ হয়ে এসেছে। একটু পরেই এক পাল কাচ্চাবাচ্চা আর তাদের মা-মাসিদের দেখা যাবে : মানে ছেলেদের স্কুলের প্রাইমারি সেকশানের ছুটির ভিড়। সাড়ে দশটায় প্রাইমারির ছুটি হয়। এগারোটায় মেয়ে-স্কুলের ছুটির পর সামনের রাস্তা নীল স্কার্ট আর হালকা নীল শাড়িতে ভরে যাবে। খানিকটা সময় পুরো জায়গাটা কেমন কলকল করে উঠবে। মেয়েরা চলে যাবার পর দিদিমণিরা যখন একে একে যেতে শুরু করবে—তখন, ঠিক তখন শরৎ কাফে-র রান্নাঘরের দিক থেকে পিঁয়াজ-রসুনের গন্ধ ভেসে আসবে। সতীন এটা লক্ষ করেছে, লক্ষ করে দেখেছে, দিদি-মণিদের যাওয়া আর শরৎ কাফে-র রান্নাঘরে পিঁয়াজ বাটা প্রায় একই সঙ্গে ঘটে যায়। ব্যাপারটা মজার। শরৎ কাফে-র চপ-কাটলেট বিকেলে তৈরী হবে, অথচ তার যত রকম মশলা বাটা এই এগারো সোয়া এগারোতেই শুরু হয়ে যাবে।

পকেট থেকে একটা খুচরো চারমিনার বের করল সতীন। বের করে শরৎ কাফে-র নীলুকে ডাকল, দেশলাই দিয়ে যাবার জন্যে। এখন শরৎ কাফে ফাঁকা। সামান্য আগে মথুর-টথুর উঠে গেছে। মথুররা দোকানের বড় বেঞ্চিতে বসে সীতাপতি মুখুজ্যের বাড়িতে আগুন লাগার গল্প করছিল। গতকাল সন্ধ্যের দিকে সীতাপতি মুখুজ্যের বৈঠকখানা

ঘরে আগুন লেগে গিয়েছিল। লেগেছিল ভালই; ছুটো জানলা পুড়েছে, কাচের শার্সি ফেটেছে, আসবাবপত্র ঝলসে গিয়েছে, মায় পুরনো আমলের বাড়ির কড়িকাঠেও আঁচ লেগেছে। কি করে আগুনটা লাগল তাই নিয়ে নানা গবেষণা। ইলেকট্রিক তার থেকে ? নাকি কেউ পেট্রল ছড়িয়ে দিয়েছিল ? আগুন লাগার পর পাড়ার নান্নু, গোপী আর সাহেবকে দেখা যাচ্ছে না। পুলিসের একটা গাড়ি আজ সকালেও একবার পাড়ায় চক্কর মেরে গেছে।

সতীন সিগারেটটা ধরাবার সময় দেখল, কপিল আসছে।

কপিল শরৎ কাফে-র সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকল। রাস্তার মুচিকে ডেকেছে। মুচি আসার পর পায়ের চটি ছুটো মুচিকে দিয়ে খালি পায়ে সতীনের মুখোমুখি এসে বসল।

"আমি ভাবছিলাম, তুই উঠে পড়েছিস," কপিল বলল।

সতীন চারমিনার সিগারেটের তামাকের গুঁড়ো জিবের ডগা থেকে ফেলে দিতে দিতে বলল, "এই তোর দশটা ?"

"কি করব মাইরি, দেবু বিশ্বাস দেরি করিয়ে দিল। আমি সাড়ে নটা থেকে গিয়ে বসে আছি। লোকের পর লোক। দেখাই হয় না।··· চা খাবি ?"

"বল্।"

কপিল নীলুকে চা দিতে বলল।

"তোর চটির কি হল ?" সতীন অকারণে জিজ্ঞেস করল।

"স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গেল। একটা বুড়ো এমন বেকায়দায় পেছন থেকে পা চেপে ধরল···! আজকাল জুতোফুতো যা তৈরী করে মাইরি, একেবারে থার্ড ক্লাস। নতুন চটি। পুজোর সময় কিনেছিলুম।"

সতীন রাস্তার দিকে তাকাল। জ্ঞানেশদার স্কুটার নিয়ে একটা ছোকরা মতন মিস্ত্রী কি যেন করছে। পাশে জ্ঞানেশদা।

"দেবু বিশ্বাস কি বলল ?" সতীন জিজ্ঞেস করল।

"বলল, ডিসেম্বর নাগাদ কাগজে নোটিশ বেরুবে।"

সতীন মনে মনে হিসেব করল। এখন নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি।

"ডিসেম্বরের কখন ?" সামান্য সন্দেহ গলার স্বরে।

"তার কোনো ঠিক নেই, শেষের দিকে হতে পারে। আবার জানুআরিতেও।"

সতীন বন্ধুর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল, যেন বোঝবার চেষ্টা করছিল, কপিল তাকে মিথ্যে স্তোক দিচ্ছে কি না।

নীলু চা দিয়ে গেল।

সতীন বলল, "দেবু বিশ্বাস গুল দিচ্ছে না তো রে ?"

কপিল সতীনের লম্বাটে কালচে মুখ, সন্দিগ্ধ চোখ দেখতে দেখতে মাথা নাড়ল, বলল, "না। গুল নয়। আমার অন্য সোর্স আছে। দেবুদাদের ব্যাঙ্কে লোক নেবে আমি জানি।"

সতীন চায়ের কাপ তুলে নিল। "আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।"

"তোর কিছুই বিশ্বাস হয় না," কপিল ক্ষুণ্ণ হল।

সতীন চায়ের ঢোঁক গিলে ফেলল। "দেবু বিশ্বাস রুণুকে চাকরি দেবার নাম করে কতদিন ঘুরিয়েছে তুই জানিস ?"

কপিল কেমন বিরক্ত হল। বলল, "রুণুর কেস আলাদা। রুণু বেটা কিস্যু জানে না। তুই একটা সিম্পল্ জিনিস ভেবে দেখ। সেরেফ টুকে টুকে রুণু হায়ার সেকেণ্ডারী থেকে বি. কম. পর্যন্ত চালিয়ে গেল, বেটা একটা লাইন লিখতে জানে না, মামুলী যোগ করতে দিলে ভুল করে, বেটার মাথা সলিড্, ওকে ব্যাঙ্কে চাকরি দেওয়া যায় ? দিলে দেবুদার বাম্বু হয়ে যাবে।"

সতীন কিছু বলল না। রুণু যে আগাগোড়া টুকে পাস করে গেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই সতীনের, কিন্তু সতীন নিজেও একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা নয়। তার মাথা হয়ত রুণুর চেয়ে পরিষ্কার—তবে ঠিক ততটা পরিষ্কার নয় যাতে ব্যাঙ্কের চাকরির কোনও পরীক্ষা হলে সে ভাল ভাবে উতরে যেতে পারে। নিজের ওপর সতীনের সে বিশ্বাস নেই। অথচ তার দাদারা, দিদি, এমন কি ছোট বোন কাজলও লেখাপড়ায় ভাল। তার বড়দা এম. এ.-তে ভাল করেছিল। এখন সরকারী চাকুরে। মেজদা আরও ভাল। পাস করার পর কলেজে

চাকরি জুটে যায়, অবশ্য মফস্বল কলেজে। তারপর কলকাতায় চাকরি পেয়ে এখন কলকাতায়। দিদির বিয়ে না হয়ে গেলে নিশ্চয় স্কুলে মাস্টারি করত। ছোট বোন কাজল এখন কলেজে, ফার্স্ট ইয়ার শেষ করেছে। তারও মাথা আছে। শুধু সতীনেরই মাথা নেই বা ঘিলু তেমন কাজের নয়।

নিজের ঘিলুর মাপ করতে গিয়ে সতীন হেসে ফেলল। হালকা হাসি।

কপিল চা খাচ্ছিল। সে শব্দ করে চা খায়। সিগারেট টানার সময়ও মাঝে মাঝে শব্দ করে।

রাস্তায় বাচ্চাকাচ্চার ভিড়। প্রাইমারি সেকশানের ছুটি হয়ে গেছে। বড় ধরনের একটা দল চলেছে হল্লা করতে করতে। দুটো ছেলে কাঠের স্কেল নিয়ে মাথার ওপর নাচাচ্ছে। একজন তার টিনের বাক্সটা সামনের ছেলেটার কাঁধে তুলে ধরার চেষ্টা করছে বার বার। বাচ্চাদের কারও কারও সঙ্গে মা কিংবা পিসি-মাসি। সামান্য পরেই বড় ছেলেরা আসতে শুরু করবে। বড়দের স্কুল এগারোটায়। বড় ছেলেগুলো আজকাল লাটের মতন স্কুলে আসে। সতীনরা এতটা পারে নি।

কপিল বলল, "তোকে একদিন নিয়ে যাব, সতু।"

"কোথায়? দেবু বিশ্বাসের কাছে?"

"একদিন চল্।...আমার সঙ্গে আলাদা একটা ব্যাপার আছে ওদের। সানুদার আমি ফেভারিট্। সানুদা যদি তার দাদাকে বলে দেয়, তোর সেন্ট পার্সেন্ট চান্স।"

সতীন কোন উৎসাহ বোধ করল না। কপিল যতটা ভাবে ততটা নয়; বিশ্বাস-বাড়িতে কপিলের যতটুকু খাতির তাতে কিছুই ভরসা করা যায় না। সানু, মানে দেবুদার ভাই শান্তিব্রত, প্রয়োজনের সময় পাড়ার ছেলেদের খাতির করে। এখন তার খাতির করার দরকার নেই। রজনী মিত্তির ইলেকশানে জেতার পর থেকে সানু বিশ্বাস তার ডান হাত। দাপটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকে বলে, সানু রজনী মিত্তিরের পেটো পার্টির ইনচার্জ; দেবু বিশ্বাসই আসল, রজনী মিত্তিরের মাথা।

চা শেষ করে কপিল পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল।

"দুপুরে কি করছিস ?" কপিল সতীনকে সিগারেট দিল। নিজে নিল।

"কিছু না।"

"সিনেমায় যাবি ?"

"কোথায় ?"

"নিউ এম্পায়ার। দারুণ ছবি হচ্ছে একটা।"

সিগারেট ধরানো হয়ে গিয়েছিল। সতীন ধোঁয়া গিলে বলল, "দেখেছি।"

কপিল যেন অবাক হয়ে তাকাল। "কবে দেখলি ?"

"কাল। উমা নিয়ে গিয়েছিল।"

কপিল তেমন খুশী হল না। সামান্য যেন ব্যঙ্গের গলায় বলল, "তোর তাহলে ভাল দিন যাচ্ছে···! উমা তোকে সিনেমা দেখাচ্ছে!"

সতীন আলস্যের ভঙ্গিতে হাই তুলল। সামনের রাস্তায় একটা হলুদ রঙের ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে। জনা তিন-চার লোক। পাড়ার কেউ নয়। অচেনা। মেয়ে-স্কুলের ছুটি হয়ে গিয়েছে। প্রথম দলটাকে রাস্তায় দেখা গেল। আজ সকাল থেকেই উমাপদ বেপাত্তা।

মুচি এসে কপিলকে চটিজোড়া দিয়ে গেল। কপিল সেলাই দেখে পয়সা মেটাল।

"তা হলে টাইগারে চল্," কপিল বলল, "কি একটা জেমস বণ্ড হচ্ছে।"

সতীন হঠাৎ চোখের ইশারায় রাস্তার দিকটা দেখাল। "ওকে চিনিস ?"

কপিল মুখ ঘুরিয়ে রাস্তা দেখছিল। পাঁচ-সাতটি বড় বড় মেয়ের একটা দল যাচ্ছে। "কাকে ?"

"ওই যে ফরসা, রোগা মেয়েটাকে ?"

কপিল দেখল। মাথা নাড়ল—চেনে না।

সতীন বলল, "তুলসীর মামাতো বোন। তুলসীর খবর জানিস ?"

"জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিল শুনেছি।"

"মারা গেছে।" সতীন বাঁ হাতে মাথার উস্কখুস্ক চুল গোছাতে লাগল। "দুটো গুলি লেগেছিল। পিঠে।"

কপিল রাস্তায় মেয়েদের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে থাকল। তুলসী ঠিক তাদের বন্ধু নয়, এই পাড়াতেও থাকত না। এ পাড়ায় আসা-যাওয়া করত। হীরুর বন্ধু। হীরুর সঙ্গেই তুলসীকে দেখতে পেত কপিলরা। মুখ-চেনা ভাব হয়েছিল। তুলসী গত বছর ধরা পড়ে। পুরো এক বছরেরও বেশী জেলে পড়েছিল। তারপর জেল ভেঙে পালাবার চেষ্টা করে। তুলসীর জেল ভেঙে পালাবার খবরটা তারও কানে এসেছে, তবে মারা যাবার খবর সে শোনে নি।

সতীন বলল, "জেলে অনেক ছেলেকে পিটিয়ে মেরে ফেলছে, তুই জানিস ?"

মাথা নাড়ল কপিল। "শুনি তো!"

"শালারা হারামজাদা", সতীনের চোখ-মুখ ঘৃণায় কুঁচকে উঠল। "পুলিস বেটারা পয়লা নম্বরের শয়তান। এই বেটাদের হাতে গভর্নমেন্ট। ...বেণু একটা চাকরি পাচ্ছিল, পুলিসের চাকরি, আমাদের থানার ও. সি. তার চাকরির বারোটা বাজিয়ে দিল। কি লোক মাইরি!"

কপিল উঠে পড়ার জন্যে ব্যস্ত হল। "চল্, ওঠ্।"

সতীন সিগারেটের টুকরোটা চায়ের কাপের মধ্যে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

শরৎ কাফে থেকে নেমে কপিল বলল, "কি রে, সিনেমায় যাবি ?"

সতীন কি যেন ভাবছিল। বলল, "তুই যা। আজ আমায় বিকেলে এক জায়গায় যেতে হবে।"

"সন্ধ্যেবেলায় যাস।"

"না ; দেরি হয়ে যাবে।"

"কোথায় যাবি ?"

"বাবার জন্যে একবার মৌলালি যেতে হবে। সেখানে কোন্ বড়

হোমিওপ্যাথ ডাক্তার আছে।"

"তোর বাবা এখন খেতেটেতে পারছেন?"

"কই! খুব কষ্ট হয় খেতে। গলায় লাগে। একদিন একটু রক্ত উঠেছিল।"

"গলার দোষ। আমার এক মামারও রক্ত উঠত।"

"সবাই বলছে ক্যানসার। আমাদের অনিল ডাক্তারও সেই রকম বলেছে। বাবার এক বন্ধু হোমিওপ্যাথির কথা বলছিল। বড়দা মৌলালিতে কোন্ ডাক্তার ঠিক করেছে। আমি বাবাকে নিয়ে যাব, বড়দা অফিস থেকে আসবে।"

কপিল যেন কথাটা তেমন আমল দিল না। বলল, "কিসের ক্যানসার! আজকাল ডাক্তাররা সব ব্যাপারেই ক্যানসার বলে। আমার তোর সকলের ক্যানসার। তোরা অনিল ডাক্তারকে ছাড়। ও শালা তুলুর দিদিকে ইন্‌জেকশান দিতে গিয়ে মেরে ফেলেছিল, মনে নেই!"

সতীন নিজে অসুখ-বিসুখের ব্যাপার কিছু বোঝে না। তার বাবার গলা ব্যথা, খাবার কষ্ট, এমন কি শ্বাসকষ্ট যে কি ধরনের ব্যাধি সে জানে না। বাবা আজ মাস চারেক হল এই সব উপসর্গ নিয়ে ভুগছে। বড়দা বাবার ব্যাপারে বরাবরই সাবধানী। ডাক্তারটাক্তার দেখাবার কোন অযত্ন করে নি। গলার ডাক্তারও দেখিয়েছে। কিন্তু এখন এমন কোনো খারাপ সন্দেহ বড়দারও হয়েছে যাতে অ্যালোপাথির ব্যাপারটা বড়দা এড়িয়ে যেতে চাইছে। মেজদা এবং দিদির সঙ্গে বড়দার যে-ধরনের কথাবার্তা হয় তাতে সতীন বুঝতে পারে, বাবাকে কোনো রকমে যতদিন পারা যায় বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া অন্য কোন ঝুঁকি কেউ নিতে রাজী নয়।

সতীন অন্যমনস্ক ভাবে মোহনের স্টেশনারী দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে পড়ে কপিলের দিকে তাকাল।

"তুই সোজা বাড়ি যাবি তো?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে তুই যা। সন্ধ্যেবেলায় দেখা হতে পারে।"

"কোথায় থাকবি ?"

"শরৎ কাফেতে।"

"দেখি, আসতে পারি।"

কপিল চলে গেল। সতীন দু পলক তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতেই চোখে পড়ল, রাস্তার মরা বকুলগাছের তলায় স্কুলের জনা তিনেক দিদিমণি। পেছনে রিকশায় আরও দুজন। স্কুলের দু-চারজন দিদিমণি সতীনের বেশ চেনা। একজন তো আর একটু হলেই তার মেজবউদি হয়ে যেত। দিদির অমত থাকায় প্রণতিদির সঙ্গে মেজদার বিয়েটা হয় নি। মা মারা যাবার পর থেকে বিয়ে-থার ব্যাপারে দিদি এ-বাড়িতে মা'র জায়গা নিয়ে নিয়েছে। দিদির কথা বাবা খুব মানে। বড়দাও। মেজদার বোধ হয় নিজের কোন পছন্দ-অপছন্দ ছিল না। কাজেই বিয়েটা হল না বলে এখন বিয়ের কথা চাপা পড়ে গেছে। বাবা একটু ভাল থাকলে এই শীতের শেষে মেজদার বিয়ে হয়ে যেতে পারে। দিদি অন্য পাত্রী দেখে রেখেছে।

সতীন মোহন স্টেশনারীর সামনে দাঁড়িয়ে একটা ব্লেড চাইল।

"ক পয়সা রে ?"

"উনিশ।"

"ইয়ার্কি পেয়েছিস। সেদিন পনেরো নিলি।"

"দাম বেড়ে গেছে।"

"তোদের দোকানে রোজই দাম বাড়ে।···তোদের শালা কেন মিসায় ধরে না মাইরি!"

"ধরিয়ে দাও না মাইরি, আমরাও বেঁচে যাই। ব্যবসা করতে বসে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তোমাদের খিস্তি শুনি।"

সতীন পয়সা দিল। "নে শালা, নিয়ে নে। সবাই নিচ্ছে, তুই আর বাদ যাবি কেন ?"

দোকানের মালিক শঙ্কর সতীনেরই সমবয়সী। পয়সা নিয়ে বলল, "কালকের আগুনের ব্যাপারটা শুনেছ ?"

"আবার কি হল ?"

"তুমি কোনও খবর রাখ না ?"

"রাখি। আগুন লাগার ব্যাপারটা সন্দেহ করছে।"

"আজ সকালে কেস পালটে গেছে।"

"মানে ?" সতীন অবাক চোখে তাকাল।

"বড় বড় বাড়িতে কারবার অন্যরকম হয়, সতু," দোকানের শঙ্কর বলল, "আজ সকালে শোনা যাচ্ছে সীতাপতির ছোট ছেলের বউ কাল বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে সুইসাইড্ করবার চেষ্টা করেছিল।"

"সুইসাইড্ ?" সতীন যেন চমকে গেল।

শঙ্কর নাকের নস্যি মুছতে মুছতে চোখ টিপে হাসল। "কেরাসিন তেলের টিন নিয়ে মরতে গিয়েছিল, বুঝেছ ? কাপড়ে ঢেলেছিল, ঘরে ছড়িয়েছিল, ভেবেছিল একবার দাউ দাউ আগুন ধরে গেলে দিব্যি মরে যাবে। আসলে দেশলাই জ্বালাবার পরই বিবির ভয় ধরে যায়। কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিতেই ফায়ার। বিবি ভয়ের চোটে ঘর ছেড়ে পালায়। মরা অত সস্তা !"

সতীন বিশ্বাস করতে পারল না। এ সব গুজব। সীতাপতি মুখুজ্যের ছোট ছেলের বউ দেখতে সুন্দরী, বড়লোকের মেয়ে, শ্বশুর-বাড়িও যথেষ্ট বনেদী। সীতাপতির ছোট ছেলে ব্যবসা করে, চা-বাগানের যন্ত্রপাতি বেচার ব্যবসা, মোটর বাইক হাঁকিয়ে ঘোরাফেরা করে, বিশাল চেহারা, মালফাল খায়, অন্য উপসর্গও আছে, কিন্তু মুখুজ্যেবাড়ির ছেলে বা ছেলের বউদের কারও এমন কিছু সুনাম নেই যে, সাধারণ ব্যাপারে বা তুচ্ছ কারণে কেউ আত্মহত্যা করতে যাবে।

সতীন যেন বিরক্ত হয়েই বলল, "তোরা এসব খবর কোথ্ থেকে পাস্ ?"

শঙ্কর বলল, "ঘোড়ার মুখ থেকে ভাই," বলে একটু হাসল, "ফ্রম হর্সেস মাউথ্ !"

সতীন কোনো উৎসাহ বোধ করল না। কোনো সন্দেহ নেই, এসব খবর হয় বাড়ির চাকরবাকরের মুখ থেকে শোনা, না হয় কারও তৈরী করা। সীতাপতিদের বাড়ি নিয়ে এমন গুজব প্রায়ই এ-পাড়ায়

শোনা যায়। কেচ্ছার খবর ছড়িয়ে পড়তেও দেরি হয় না। সতীন অন্তত ও-বাড়ির একজনকে জানে যার সম্পর্কে তার কোনো খারাপ ধারণা নেই। সীতাপতির ভাগ্নে প্রেমকিশোর। প্রেমকিশোর সতীনের বন্ধু। ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়েছে এবার। চমৎকার ছেলে। একেবারে সাদাসিধে। নরম চেহারা, কথাবার্তাও খুব সুন্দর। কিশোরের বাবা নেই। মা বছর কয়েক হল মারা গেছে। মামার বাড়িতেই মানুষ কিশোর। তার মুখে মামার বাড়ির ব্যাপারে কোনোদিন কিছু শোনে নি সতীন।

সোজা হেঁটে এসে সতীন বাঁ দিকে মোড় নেবার সময় হঠাৎ পেছন ফিরে তাকাল। তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

গোপা। গোপা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে।

চোখাচোখি হল। গোপা যেন চোখের তলায় পাতলা করে হাসল। হেসে মুখ নামিয়ে সোজা হাঁটতে লাগল।

সতীন কয়েক পলক দেখল গোপাকে। গোপা এখন মেয়ে-স্কুলে চাকরি করে। নীচু ক্লাসে পড়ায়। থ্রি-ফোর ক্লাসে বোধ হয়। তা পড়াক। তবু চাকরি করে। অনেক হাতে-পায়ে ধরে পাড়ার স্কুলে চাকরিটা পেয়েছে গোপা। সতীন তো কিছুই পেল না। আজ দেড় বছর একেবারে ঝাড়া বেকার। মধ্যে দিন দশেক এক জায়গায় চাকরি করতে গিয়েছিল, এগারো দিনের মাথায় তাকে বলে দেওয়া হল, পুরনো লোক ফিরে এসেছে, কাজেই এবারকার মতন আর হল না।

গোপা লণ্ড্রী পেরিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে সতীনের একবার ইচ্ছে হল—তাকে ডাকে। অনেক দিন কোন খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে না গোপাদের বাড়ির। মাসিমা কেমন আছেন? মেসোমশাইয়ের সেই মামলার কতদূর কি হল?

সতীন দেখল, গোপা লণ্ড্রী পেরিয়ে ডান দিকে গলির মধ্যে ঢুকে গেল।

সামান্য দাঁড়িয়ে সতীন বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

বাড়ি ফিরে সতীন শুনল, বাবার সামান্য জ্বর এসেছে। গলার কষ্ট এত বেড়ে গিয়েছিল যে কিছুক্ষণ মুখ হাঁ করে হাঁপানী রোগীর মতন শ্বাস টানতে হয়েছে।

বড়দা অফিসে, মেজদা কলেজে। বাড়িতে বউদি আর কাজল। বুলু আর মণি স্কুলে। বুলু পাড়ার স্কুলে পড়ে না। বড়দা ছেলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব সাবধানী। পাড়ার গোয়ালমার্কা স্কুল সম্পর্কে বড়দার ধারণা খুব খারাপ, বড়দার ধারণা পাড়ার বেওয়ারিশ কুকুর আর পাড়ার স্কুল একই রকম। এদের কোন জাত নেই, ইজ্জত নেই। বড়দার ছেলেমেয়ে—বুলু আর মণি জাত স্কুলে পড়ে—ইংলিশ মিডিয়মে। নটা নাগাদ দুজনেই স্কুলে চলে যায়। পাড়ার স্কুলে পড়লে সতীন বাবার খবরটা পেয়ে যেত। কেননা শরৎ কাফে-র সামনে দিয়েই বুলুকে স্কুলে যেতে হত।

গায়ের জামা খুলতে খুলতে সতীন ছোট বোনকে জিজ্ঞেস করল, "এখন কেমন আছে রে?"

"এখন একটু ভাল," কাজল বলল।

"কিছু খেয়েছে?"

"বউদি সাবুর পায়েস করে দিয়েছে···।"

"ভাত আর খেতে পারল না?"

কাজল মাথা নাড়ল। স্নানে যাবার আগে কাজল চুল পরিষ্কার করে নিচ্ছিল। আজ তার কলেজ যাওয়া হয় নি। যাবার ইচ্ছেও ছিল না। বাড়িতেই পড়াশোনা করবে ভেবেছিল।

সতীন জানলার দিকে রোদের কাছে সরে গেল। দাড়ি কামাতে বসবে।

"আজ আবার হঠাৎ বাবার এরকম হল কেন বল্ তো?" সতীন অনেকটা আপনমনে জিজ্ঞেস করল।

কাজল কিছু বলতে পারল না। চিরুনি পরিষ্কার করতে করতে দাদার দিকে তাকাল।

"নার্ভাসনেস···," সতীন বলল, "আমার মনে হয়, বাবা নার্ভাস

হয়ে গেছে। বিকেলে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে ভেবে নার্ভাস হয়ে পড়ছে।”

কাজল বলল, “বিকেলের এখন অনেক দেরি।”

সতীন কথাটা শুনল না বোধ হয়। বাবার সব সময় এ রকম বাড়াবাড়ি হয় না। মাঝে মাঝে হয়। এক-একদিন বেশ ভালই থাকে, নরম ভাত, পানসে তরিতরকারি সবই খেতে পারে, রাত্রে সুজির পায়েস, রুটি-দুধ, দু-একটা মিষ্টিও। সেদিন হঠাৎ গরম সিঙাড়াও খেয়ে ফেলেছিল একটা। দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা কিংবা ভয় পেলে বাবার গলার কষ্ট আচমকা বেড়ে যায়। তখন গলা দিয়ে শব্দও যেন বেরুতে চায় না।

“এই, একটু জল এনে দে, দাড়িটা কামিয়ে ফেলি,” সতীন বলল।

কাজল ভাঙা কাপে করে জল এনে দিল।

সতীন দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম বের করে রোদের দিকে মুখ করে দাড়ি কামাতে বসল।

গালে সাবান মাখতে মাখতে সতীন যেন কৌতূহলবশে নিজের মুখটা দেখছিল। তার মুখ বড়দা বা মেজদার মতন নয়। দিদির আর বড়দার মুখের ধাঁচ একরকম। গোল মতন। দুজনেই বেশ ফরসা। মা'র গায়ের রঙ ফরসা ছিল, মুখ গোলগাল ছিল। মায়ের মুখ পেয়েছে প্রথম দুই ছেলেমেয়ে। মেজদার রঙ মাঝারি। চোখমুখ যেমন ঝকঝকে তেমনি কাটাকাটা। মাথাতেও বেশ লম্বা মেজদা। মেজদাকে দেখলেই বুদ্ধিমান মনে হয়, বেশ বোঝা যায় কলেজেটলেজে পড়াবার জন্যেই যেন মাস্টার-মাস্টার মুখ হয়েছে। মেজদার মাথার চুল পাতলা, চুল নিয়ে বেচারীর একটু খুঁৎখুঁতেপনা আছে। নয়ত মেজদা কোন ঝক্কি-ঝামেলায় থাকে না। নিজের ঘর, বইপত্র ঘাঁটা, বউদির সঙ্গে মাঝে মাঝে ঠাট্টা-তামাশা—এর বেশী কিছু না। কলেজে আর বাইরে মেজদার কিছু বন্ধুবান্ধব আছে। বাড়িতে ভাল না লাগলে মেজদা সেখানে চলে যায়।

জুলফির দিকে সেফটি রেজার ছোঁয়াবার আগে সতীন আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের চোখ নাক থুতনি আর একবার নজর করল। বড়দা-মেজদার সঙ্গে তার মুখের মিল প্রায় নেই। দিদির সঙ্গেও নয়। সে ফরসা নয়। তাকে শ্যামলাও বলা চলে না, বরং কালোর দিকে তার গায়ের রঙ। মুখের আদল লম্বা। থুতনি চাপা। গালের হাড় উঁচু। নাক মাঝারি। চোখ বড় বড়, কিন্তু মণি সামান্য নীলচে। বাবার সঙ্গে মিল আছে হয়তো। কাজল আর সতীনের চেহারায় খানিকটা সাদৃশ্য রয়েছে। তবে কাজল সতীনের মতন অতটা কালচে নয়। তা ছাড়া কাজলের চোখ সত্যিই সুন্দর।

সতীনের একবার মেশানো বসন্ত হয়েছিল। ফলে গালে কপালে গলায় দু-একটা দাগ থেকে গেছে। চোখের সাদা জমি সামান্য ঘোলাটে। নিজের চোখের দিকে তাকালে সতীনের কেমন মনে হয়, সে বোকা। তার বুদ্ধিটুদ্ধি কম। এ রকম কেন হয়—সে জানে না।

জুলফির তলা থেকে সতীন সেফটি রেজার টানল। বেশ জোরেই।

অন্যমনস্ক থাকার দরুন হোক বা নতুন ব্লেডের জন্যেই হোক, হাতের টান ঠিক মতন না পড়ার জন্যেও হতে পারে—গাল কেটে গেল।

সতীন দেখল, জুলফির তলা দিয়ে রক্ত পড়ছে। চামড়ার তলা দিয়ে ক্রমশই রক্ত চুঁইয়ে এসে গালের দিকে গড়িয়ে পড়ছিল।

হাতের কাছে কিছু না থাকায় সতীন গায়ের গেঞ্জি খুলে ফেলে গালটা চেপে ধরল।

॥ দুই ॥

এণ্টালী বাজারের সামনে দাঁড়িয়ে একটা ট্যাক্সি খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে যাচ্ছিল সতীন। এই সন্ধ্যের মুখে ট্যাক্সি ধরা খুবই কঠিন কাজ,

তবু জায়গাটা যখন ডালহাউসি পাড়া নয়, চৌরঙ্গিও নয়, তখন পনেরো-কুড়ি মিনিট দাঁড়িয়েও একটা ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না কেন—সতীন বুঝতে পারছিল না। চারদিকে চোখ রেখে সে সব রকম গাড়ি দেখছিল; মাঝে মাঝে ভুল করে হাত তুলে ফেলছিল, এই ট্যাক্সি বলে চেঁচিয়েও উঠছিল, তারপরই দেখছিল তার হাত তোলা এবং ডাককে পুরোপুরি উপেক্ষা করে সওয়ারী-সমেত ট্যাক্সিগুলো যে যার নিজের রাস্তায় চলে যাচ্ছে। গলির মধ্যে যে কটা ট্যাক্সি ঢুকল—কোনটাই আর ফাঁকা বেরুলো না; হয়ত অন্য রাস্তা দিয়ে চলেও গেল কেউ কেউ।

সতীন একটা চারমিনার ধরিয়ে নিল। আপাতত ট্যাক্সি পাওয়া যাবে বলে তার মনে হচ্ছে না। আরও কিছুক্ষণ হাঁ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। অনেকক্ষণ সে সিগারেট খেতে পায় নি। বাবাকে সঙ্গে করে বাড়ি থেকে বেরুনোর পর থেকেই সে সুযোগ হল না। ডাক্তারবাবুর চেম্বারে বাবাকে বসিয়ে রেখে বাইরে এসে দুটো টান মেরে যাবে তাও সম্ভব হয় নি; প্রথমত বাবার জন্যে, দ্বিতীয়ত বড়দার জন্যে। বাবা বাড়ি থেকে বেরুবার সময় এমন ফ্যাকাশে, হতাশ, অসাড় মুখ করে বেরুলো যে মনে হল, বাবা যেন বুঝেই নিয়েছে—যেখানেই বাবাকে নিয়ে যাওয়া হোক – ভরসার আর কিছু নেই, কিছুই নয়। ওরকম ঘাবড়ে যাওয়া সাদাটে মুখ দেখলে নিজেকেও কেমন ঘাবড়ে যেতে হয়। বউদি আবার বলে দিল, 'খুব সাবধানে নিয়ে যাবে, একা রেখে উঠবে না।' তার ফলে ডাক্তারখানাতে এসেও সতীন বাবাকে নিয়ে বসে থাকল। বড়দা এল কাঁটায় কাঁটায় সোয়া পাঁচটায়। ডাক্তারের ঘরে ঢুকতেই আরও আধঘণ্টা কেটে গেল। এই আধঘণ্টা বড়দা কেবল উসখুস করেছে, অধৈর্য হয়ে ডাক্তারের লোককে বার বার বলেছে, 'আমার আগে থেকেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে; আপনি ওঁকে বলবেন আমি ইনকাম ট্যাক্সের কমল মল্লিকের কাছ থেকে আসছি। পেসেন্ট বুড়ো লোক, তাঁর পক্ষে বেশীক্ষণ বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে খুব।'

হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের যে এত পশার হয় সতীন জানত না। পাড়ার কেষ্টবাবুকে সে দেখেছে, লোকে বলে, 'হোমো-কেষ্ট', শাঁখার দোকানের পাশে দেড়হাতি ঘরে সকাল-সন্ধ্যে নড়বড়ে টেবিল চেয়ার নিয়ে বসে থাকে, কদাচিৎ তার কাছে একসঙ্গে তিন-চারজন লোককে দেখা যায়। মন্মথ ভাতুড়িও হোমিওপ্যাথ; বাড়িতেই তার চেম্বার; সেখানেও লোকজনের এমন একটা আসা-যাওয়া নেই; মন্মথ ভাতুড়ি তার ছোট শালাকে দিয়ে চেম্বারের পাশে একটা দরজির দোকান দিয়েছে।

এখানে কিন্তু ব্যাপারস্যাপার একেবারে আলাদা। রুগী বসার ঘরটাই কত বড়! পর পর চেয়ার। অন্তত পনেরো-ষোলোটা। ডাইনে-বাঁয়ে আড় করে রাখা। একদিকে একটা টেবিল। দেওয়ালে বড় বড় ছবি, একটা আয়না, হ্যানিমানের মস্ত ছবির পাশে দক্ষিণেশ্বরের কালী, কালীর ছবির চারপাশে জবার শুকনো মালা ঝুলছে।

সতীন থাকতে থাকতেই ঘর প্রায় ভরে গেল, রাস্তায় গাড়ি এসে দাঁড়াল গোটা চারেক। ছুজন মহিলা এলেন, যাঁদের বয়েস পঞ্চাশ-টঞ্চাশ হবে। গায়ের রঙ, সাজগোজ দেখে মনে হল বড় বাড়ির মানুষ, প্রায় হাতভরা চুড়ি, মাথায় কাপড়, সঙ্গে বাড়ির সরকার গোছের একটা লোক, সে বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল। এই ধরনের ধুমসীদের যে কী অসুখ করে কে জানে! চর্বিটর্বির হতে পারে। এক ভদ্রলোক একটি মেয়েকে সঙ্গে করে এনেছেন, মেয়েটির সমস্ত শরীর যেন রক্তশূন্য, নাক লম্বা, চোখ গর্তে ঢুকে গেছে, চেয়ারে বসে মেয়েটি সেই যে মুখ নীচু করল, আর তুলল না। পাগলটাগল হতে পারে।

দেখেশুনে তো মনে হয়, এই ডাক্তার ফেলনা নয়। সতীন বাড়িতে শুনেছিল, চেম্বারে বত্রিশ টাকা ভিজিট। বাড়িতে পুরোপুরি চৌষট্টি নেন না, পঞ্চাশ নেন, কেননা হোমিওপ্যাথির প্রচার তাঁর লক্ষ্য। চেম্বারেও ধরা-করা করলে ষোলো-কুড়ি হয়। বড়দা ষোলোয় ব্যবস্থা করেছে। ইনকাম ট্যাক্সের লোকের মারফতে।

ব্যাপারটা সতীনের ভাল লাগে নি। বড়দার মতন মানুষের পক্ষে

ষোলো টাকা বাঁচানোর জন্যে ধরা-করার কোন মানে হয় না। বড়দার মেয়ে—মানে মণির জন্যে সেদিন এক মাস্টার ঠিক হল—যে হপ্তায় তিনদিন আসবে, দক্ষিণা একশো পঁচিশ। দেড়শো চেয়েছিল আগে। মাসে মাসে একশো পঁচিশ যে লোক মেয়ের মাস্টারের জন্যে দিতে পারে সে লোক কেন ষোলো টাকা বাঁচাবার জন্যে এত ছোট হবে?··· না না, সতীন বড়দাকে দোষ দিচ্ছে না বা বলতে চাইছে না—বাবার ব্যাপারে বড়দা গাফিলতি দেখাচ্ছে। বড়দা মোটেই তা দেখায় নি, বাবার জন্যে বড়দার চিন্তা-দুশ্চিন্তার শেষ নেই, অবহেলার কথাই ওঠে না; তবু ব্যাপারটা খারাপ লাগে চোখে। মনে হয়, নিজের ছেলেমেয়ে এবং নিজের বাবার মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। সতীন কোনদিন এসব জিনিস খুঁটিয়ে দেখতে বা ভাবতে চায় না, তার অত মাথা নেই, আগ্রহ নেই। কিন্তু যদি এসব কিছু তার হঠাৎ-হঠাৎ খেয়ালে এসে যায়—তাহলে অবাক না হয়ে পারে না। বাবা বুড়ো মানুষ, তার দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে, যতই বাবার দিন শেষ হয়ে আসছে ততই বড়দা বাবার সঙ্গে সম্পর্ক আলগা করে ফেলছে, যেটুকু কর্তব্য, যা করা উচিত, না করলে বিবেকে লাগবে, দৃষ্টিকটু দেখাবে বা মনে হবে বাবার ওপর বড়দার কোন কৃতজ্ঞতা নেই—বড়দা কি সেইটুকুই মাত্র করতে চায়। যে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে তার জন্যে খরচ বাঁচানোর মতনই না ব্যাপারটা। সতীন বুঝতে পারে না। বোধ হয় মানুষের এই রকমই হয়—বাবা-টাবা দূরের হয়ে যায় একসময়ে, ছেলেমেয়েই হয় কাছের।

"ট্যাক্সি—ট্যাক্সি—এই ট্যাক্সি···" সতীন একটা ফাঁকা ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে হাত তুলে ছুটল।

ট্যাক্সিটা দাঁড়াচ্ছিল না; হয়ত দাঁড়াত না; কিন্তু গলির দিক থেকে একটা ভ্যান বেরিয়ে আসায় রাস্তা না পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সতীন ছুটে গিয়ে ট্যাক্সিটা ধরে ফেলল।

"আমহার্স্ট স্ট্রীট যাব, রুগী আছে—", সতীন বলল মুখ বাড়িয়ে।

ট্যাক্সিঅলার পাশে একটি ছেলে। কেউ কোন জবাব দিল না।

সতীন ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। ট্যাক্সি যাবে কি যাবে না? কাজে কাজেই সে একটু কায়দা করল। পেছন দিকের দরজায় হাত রেখে যেন ট্যাক্সিঅলার সম্মতি পেয়ে গেছে, মোলায়েম গলায় বলল, "ওই যে, গলির বাঁ দিকে—ওই ডাক্তারখানায় রুগী রয়েছে। বুড়ো লোক।"

ট্যাক্সিঅলা তখনও চুপচাপ। সতীনের দিকে নজরও করল না।

হয়ত ট্যাক্সিটা চলেই যেত, হঠাৎ ড্রাইভারের পাশের ছেলেটি নীচু গলায় কি যেন বলল ড্রাইভারকে—তারপর মাথা ঘুরিয়ে পেছনের দরজা খুলে দিল।

সতীন ট্যাক্সির মধ্যে উঠে বসল।

সামান্য এগিয়েই বড়সড় গলি, গলির মুখে বাঁ হাতে ডাক্তারখানা।

ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়ে সতীন নামতে যাচ্ছে, হঠাৎ সামনের দিকের ছেলেটি বলল, "আপনার নাম সতীন দত্ত না?"

সতীন অবাক! কেমন যেন থতমত খেয়ে সামনের ছেলেটিকে দেখবার চেষ্টা করল। ছেলেটির ঘাড় সামান্য ঘোরানো, স্পষ্ট করে মুখ দেখা যাচ্ছে না; ঘন লম্বা জুলফি, মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত, থুতনি গাল তেমন পরিষ্কার নয়, পাতলা দাড়িতে ময়লা হয়ে রয়েছে।

সতীন কিছু বলার আগেই ছেলেটি আবার বলল, "সিটি কমার্স...।"

ঘাবড়ে গিয়ে সতীন বলল, "আপনি?"

"জগন্ময়। জগন্ময় সিংহ।"

সতীন যেন এক মুহূর্ত সময় নিল নামটাকে মনে করতে, তারপর খুশীর গলায় বলল, "আ-রে, জগন্ময়!"

জগন্ময় হাসল কিনা বোঝা গেল না, সতীন হাত বাড়িয়ে জগন্ময়ের কাঁধে হাত রাখল। "ভাবাই যায় না...! আশ্চর্য ব্যাপার!"

জগন্ময় বলল, "আমি দেখেই চিনেছি।"

সতীন বলল, "তুমি মুখ পালটে ফেলেছ, কেউ চিনতে পারবে না।" বলে হাসল সতীন।

জগন্ময়ও হাসল হালকা করে। "রুগী কে ?"

"বাবা।"

"কি হয়েছে ?"

"কি জানি। ডাক্তাররা তো বলছে গলায় ক্যানসার।"

"ক্যানসার !"

সতীনের হঠাৎ খেয়াল হল তার দেরি হয়ে যাচ্ছে। দরজা খুলে নামতে নামতে বলল, "বাবা আর বড়দা অনেকক্ষণ বসে রয়েছে। একটাও ট্যাক্সি পাচ্ছিলাম না ভাই। তুমি দয়া করলে তাই— ।"

"আরে দয়া কি।···যাও, নিয়ে এস।"

সতীন নেমে গেল।

জগন্ময় আর ট্যাক্সিঅলা কথা বলতে লাগল সাধারণ ভাবে।

বেশী সময় লাগল না। সতীন বাবাকে নিয়ে ট্যাক্সির কাছে এসে দাঁড়াল। পাশে তার বড়দা। জগন্ময় ওদের দেখতে পেয়েই দরজা খুলে দিয়েছিল।

সতীনের বাবা বিনয়ভূষণকে অত্যন্ত দুর্বল, অবসন্ন দেখাচ্ছিল। ছেলেরা ধরে-করে তাঁকে ট্যাক্সির মধ্যে তুলে দেবার পর বিছানায় গড়িয়ে পড়ার মতন একপাশে তিনি যেন শুয়ে পড়লেন। সতীনের বড়দা রথীন উঠল, উঠে বাবাকে আরও আরাম করে বসতে বলল।

জগন্ময় সতীনকে সামনে আসতে বলল।

গাড়ি ছাড়ার আগেই বিনয়ভূষণ যেন হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "বিকেল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে থাকার ক্ষমতা কি আমার আর আছে রথী !"

এটা অভিযোগ না নিজের অক্ষমতার জন্যে অনুতাপ—বিনয়ভূষণের গলার স্বর ও বলার ভঙ্গি থেকে বোঝা গেল না। তাঁর গলার স্বর ভাঙা-ভাঙা, খসখসে শোনাল। শ্বাসকষ্টও যেন রয়েছে।

রথীন বলল, "একটা দিন। মাসখানেক পরে আবার আসতে হবে। এর মধ্যে হপ্তায় হপ্তায় খবর দিতে বলেছেন।" বলে একটু থেমে আবার বলল, "উনি তো বললেন, দিন পনেরোর মধ্যেই উন্নতি হবার

আশা করছেন। খাওয়ার কষ্টটা মাসখানেকের মধ্যেই চলে যাবার কথা।”

বিনয়ভূষণ কেমন ছেলেমানুষের মতন বললেন, “খুবই বড় ডাক্তার, কি বলো! কত পেশেন্ট!” তাঁর কথা থেকে মনে হয়, জীবনের কোন ক্ষীণ আশ্বাস যেন পাবার চেষ্টা করছেন ঘরভরা রোগী আর নামকরা ডাক্তার দেখে।

ট্যাক্সি ততক্ষণে মৌলালির মোড়ে এসে আটকেছে, শিয়ালদা দিয়ে সোজা যাবে, গিয়ে রাজাবাজার দিয়ে বাঁ দিকে মোড় নেবে।

জগন্ময় নীচু গলায় সতীনকে বলল, “কি করছ তুমি? চাকরি?”

সতীন মাথা নাড়ল। “না। বেকার বসে আছি।” এমন মৃদু জড়ানো গলায় কথা বলল সতীন যেন তার গলার স্বর বাবা-দাদার কানে না যায়। অবশ্য মৌলালির মাথায় যে ধরনের ভিড়—ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট গাড়ি, লরি, রিকশা, ঠেলা, মানুষজনের হট্টগোল তাতে উঁচু গলায় কথা বললেও পেছনের সিটে বাবা-দাদার কানে যাবার কথা নয়।

ট্যাক্সি আবার চলতে শুরু করল।

সতীন জগন্ময়কে শুধলো, “তুমি কি করছ?”

“চালাচ্ছি।” জগন্ময় খাপছাড়া ভাবে বলল।

“এই ট্যাক্সি তোমার?”

“আমার? মাথা খারাপ তোমার! ট্যাক্সির মালিক আমি কোথা থেকে হব?”

“তাহলে—?” সতীন এমন চোখ করে তাকাল যেন সে বুঝতে পারছে না জগন্ময় ট্যাক্সির মধ্যে কেন বসে আছে তবে? তার কৌতূহল হচ্ছিল। অনেকটা ঠাট্টার মতন করেই আবার বলল, “আমি ভেবেছিলাম তোমার ট্যাক্সি। মালিক বা মালিকের ছেলেটেলেরা অনেক সময় দেখেছি ড্রাইভারের পাশে বসে থাকে। তাই না?”

জগন্ময় হাসল। “আমি মালিকের ছেলে নয়।”

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। সন্ধ্যের ভিড়ে পড়ে ট্যাক্সিটা প্রাচী সিনেমার

কাছ থেকে আর এগুতেই পারছে না, গাড়ির পর গাড়ি, বউবাজার-শিয়ালদায় প্রচণ্ড ভিড়, চারপাশ থিকথিক করছে গাড়ি ঘোড়া মানুষজনে। শীতের গোড়ায় ধুলো আর ময়লা উড়ছে অনবরত। চারদিকে এমন একটা হল্লার ভাব, মনে হচ্ছে কয়েক হাজার মানুষ এখানে দিশেহারা হয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে।

জগন্ময় বলল, "পুরনোদের খবরটবর জান ?"

"পুরনো মানে আমাদের নাইন্‌ট্ ব্যাচের কথা বলছ ?"

"সেই সলিল কি করছে ?"

"সলিল খুব লাকি; ওকে বসে থাকতে হয় নি; রেলে চাকরি পেয়ে গেছে।"

"আর তপন ?"

"তপন শুনেছি গোরখপুর চলে গেছে।"

"গোরখপুর ? সেটা কোথায় ?"

"আমিও জানি না। বেনারস দিয়ে নাকি যেতে হয়। অযোধ্যা···।"

"সেখানে তপনের কে আছে ?"

"জামাইবাবু-টামাইবাবু কেউ আছে।···কলকাতায় ওকে থাকতে দিল না। তুমি জান না ?"

জগন্ময় আড়চোখে সতীনের দিকে তাকাল। একেবারে খাটো গলায় বলল, "অ্যারেস্ট হয়েছিল।"

সতীন যেন অন্য কাউকে বলছে, রাস্তার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, "তপনকে যা টরচার করেছিল—তুমি ভাবতে পারবে না। রেক্‌টামে বরফ দিয়ে চেপে রাখত, জান ? ওর পায়ের নোখগুলো দেখলে তুমি সিঁটকে উঠবে। সাংঘাতিক টরচার।" সতীনের হঠাৎ খেয়াল হল তার কথা বাবা-দাদার কানে যাচ্ছে না তো ? ঘাড় ফিরিয়ে সতীন দেখল। বাবা সেই একই ভাবে কাত হয়ে বসে, দাদা গদিতে পিঠ দিয়ে। দুজনে কোন কথা বলছিল কিনা বোঝা গেল না। দাদা শিয়ালদার ভিড় দেখছে বিরক্ত চোখে।

সতীন চাপা গলায় বলল, "অনেক কষ্টে তপনকে ওর বাবা আর

মামা মিলে ছাড়িয়ে আনে। কনডিশান ছিল এখানে থাকতে পারবে না। ওকে গোরখপুরে পাঠিয়ে দিল বাড়ির লোক।"

ট্যাক্সি একটা জট পেরুল। আর একটা জট হ্যারিসন রোড ক্রসিং। কার বাবার সাধ্য রাস্তা দিয়ে যায়—সারকুলার রোডের সবটাই প্রায় জুড়ে বসেছে তরিতরকারিঅলারা, আবছা অন্ধকারে ছেঁড়া কলাপাতা উড়ছে রাস্তায়, ডাবের খোলা গড়াগড়ি দিচ্ছে, পচা কুমড়ো আর বেগুন থেতলে গাড়ি চলে গেছে, মলমূত্রেরও অভাব নেই; সমস্ত বাতাস দুর্গন্ধে ভারী হয়ে আছে। ওরই মধ্যে একটা রিকশায় বেশ রঙচঙা শাড়ি পরে, গিলটির গয়না-পরা এক বস্তিবাড়ির বউ তার স্বামীর সঙ্গে হেলতে হেলতে দুলতে দুলতে হাস্যমুখে চলেছে। দেখলেই বোঝা যায় বিয়ে বেশীদিনের নয়। বোধ হয় কালীঘাট-ম্যারেজ! কথাটা ভাবতেই সতীনের কেমন হাসি পেয়ে গেল।

জগন্ময় বলল, "আমাদের অমিতাভ বিজনেস করছে, শুনেছ?"

"অমিতাভ মৈত্র, না সেনগুপ্ত?"

"সেনগুপ্ত হবে—সেই কালো বেঁটে ছেলেটা, চাঁটগেয়ে···।"

"ও তো খুব চালু ছিল।"

"ভাল বিজনেস লাগিয়েছে, হাওয়াই চটি সাপ্লাই দিচ্ছে কেরালায়।"

"হাওয়াই চটি?" সতীন থ মেরে গেল যেন।

ট্যাক্সি হ্যারিসন রোডের মোড় ছাড়িয়ে যেন স্বস্তি পেল। ভিড় হালকা হচ্ছে। একটা দোতলা বাসকে কাটিয়ে বেরিয়ে এল ট্যাক্সিটা।

বিনয়ভূষণ ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, "গলার রোগটা কি তোমায় কিছু বলল?"

রথীন বাবার দিকে তাকাল। "না, রোগ কি তা বলল না; উইণ্ড্ পাইপের ইনফ্লামেশান হতে-টতে পারে···। তোমারটা ক্রনিক হয়ে গেছে আর কি! একসময়ে ব্রংকাইটিসে খুব ভুগেছ।"

বিনয়ভূষণ একটু চুপ করে থেকে বললেন, "হোমিওপ্যাথিতে তো

কোন রোগ বলে কিছু নেই—কি বল! লক্ষণই আসল।”

“হ্যাঁ; সেই রকম শুনি।” রথীন কথাবার্তা এড়াবার চেষ্টা করল।

“তোমার এই ডাক্তার জজের মতন জেরা করে। ভাল হোমিও-প্যাথ মাত্রই তাই। আমার মামাশ্বশুর প্রতাপ মজুমদারের কন্‌টেম-পোরারী, তাঁকেও দেখতাম···।” বলতে বলতে গলা একেবারে বসে গেল বিনয়ভূষণের; একটা কাশির দমক যেন গলার কাছে এসে আটকে গেল।

রথীন বলল, “কথাবার্তা আর বলো না বেশী। স্ট্রেন্‌ হবে।”

শীত যে আসছে বোঝা যায়। ধোঁয়ায় ধূসর হয়ে গেছে চারপাশ। এদিকে আলো কিছুটা কম; ডানহাতি ট্রাম ডিপো, বস্তির পর বস্তি, ধুলোয় ধোঁয়ায় বাতাস ভরা, ডিজেলের গন্ধ এসে গলায় ঢুকে গেল সতীনের, সরকারী বাস রাজাবাজারের মুখে দাঁড়িয়ে অনর্গল ধোঁয়া ছাড়ছে।

“তুমি সত্যিই কিছু করছ না?” সতীন জিজ্ঞেস করল জগন্ময়কে।

জগন্ময় বলল, “সেরকম কিছু নয়।”

“কোন রকম কিছু করছ! তাই শুনি?” সতীন একটু হাসল।

জগন্ময় কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, “আমি বেহালার রুটে কিছুদিন বাস-কণ্ডাক্টারি করেছিলাম। তারপর ওটা ঠিক আমাদের ধাতে পোষাল না বুঝলে। আমার একটু-আধটু গাড়ি চালাবার এক্সপিরিয়েন্স ছিল, পাড়ার একটা ছেলে আমায় শিখিয়েছিল। একটা ভাঙা গাড়ি পেয়ে হাত ঝালিয়ে নিলাম। তারপর এই বাদলদা—আমার গুরু—” বলে জগন্ময় পাশের ড্রাইভার লোকটিকে দেখাল, “গুরুর চেলাগিরি করে আর পঞ্চাশ টাকা বেলতলায় ঘুষ দিয়ে একটা লাইসেন্স পেয়ে গেলাম। মাঝে মাঝে ট্যাক্সি চালাই।”

ট্যাক্সি রাজাবাজারের মোড় দিয়ে ডান দিকে ঘুরল। আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরবে।

সতীন রীতিমত বিহ্বল হয়ে গেল। জগন্ময় বাসের কণ্ডাক্টারি

করেছে, ট্যাক্সি চালায়। অথচ কলেজে এই জগন্ময় সাংঘাতিক ডাঁটে থাকত, মানে জগন্ময় কিছু চেলাটেলা জুটিয়ে মাতব্বরি করতে শুরু করে দিয়েছিল। ও প্রথমে হুল্লোড়বাজ ছিল ; পরে ইউনিয়নে ঢুকে পড়ে। তখন দুটো ইউনিয়ানের মধ্যে রোজই মারপিট চলছে। লোহার ডাণ্ডা আর বোমা দিয়ে দখলের মহড়া হচ্ছে। জগন্ময় নতুন ইউনিয়নে ঢুকে পড়ে একেবারে সরাসরি ডাণ্ডাবাজিতে নেমে গেল।

জগন্ময়কে একবার ঘিরে ফেলে ছোরা মারার চেষ্টা করেছিল অন্য পক্ষ। পারে নি—কেমন করে যেন বেঁচে গিয়েছিল ও। পাল্টা মারপিটে জগন্ময়ের শত্রুপক্ষের একজন ঘাড়ে ছুরি খেয়েছিল, কলেজের বাইরে রাস্তায়।

সেই জগন্ময় এখন নাকি ট্যাক্সি চালায়!

বিশ্বাস হচ্ছিল না সতীনের। বেটা ব্লাফ দিচ্ছে না তো? যে লাইন ধরেছিল জগন্ময় সেই লাইনে ওর কিছু একটা হওয়া উচিত ছিল, অন্তত পাড়ার অমুক ব্লকটকের সেক্রেটারী, তাতে ভাল ভাতা পাওয়া যেত। জগন্ময় তো নিদেনপক্ষে ছোটখাটো একটা লাইসেন্সও বের করে নিতে পারত।

সতীনের হঠাৎ কেমন সন্দেহ হল। জগন্ময় কি তাকে বাজিয়ে দেখার চেষ্টা করছে! আজকাল, সতীন শুনেছে, অনেক ছেলে পুলিসের ইন্‌ফরমারের কাজ করে। মানে, তারা সরাসরি কোন ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত নয়, কিন্তু পুলিসের লোক এদের টোপ্ করে নানা জায়গায় ফেলে রাখে।

এ-রকম একটা চিন্তা-ভাবনার পরই সতীন দেখল তাদের ট্যাক্সির ঠিক পাশে থানার জিপ। থানার জিপ দেখেই এ-ধরনের একটা চিন্তা এল কি না সে বুঝল না। না বুঝে নিজের ওপরেই কেমন বিরক্ত হল।

ট্যাক্সি এসে আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরতেই সতীন হাত বাড়িয়ে বলল, "ডান দিক দিয়ে এগিয়ে—প্রথম বাঁ হাতি গলি।"

বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সি দাঁড়াল।

সতীন দরজা খুলে নেমে যাচ্ছিল, জগন্ময় বলল, "তুমি ওঁদের বাড়িতে দিয়ে এস। আমি আছি।"

বিনয়ভূষণকে নামিয়ে আনল রথীন। এতক্ষণ পরে নিজের বাড়ির দরজায় পা দিতে পেরে তিনি যেন শক্তি পেয়ে গিয়েছেন। নিজেই সদরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, সতীন তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। রথীন ট্যাক্সিভাড়া মেটাতে লাগল মিটারের দিকে চোখ রেখে।

দোতলার সিঁড়ির মুখেই বাবাকে ছেড়ে দিল সতীন। বউদি আর কাজল বাবার কাছে। মেজদাও বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সতীনের আর কোন দরকার নেই।

নীচে নেমে আসতেই সদরের কাছে বড়দার সঙ্গে দেখা।

রথীন ব্যস্ত হয়ে সিঁড়ির দিকে আসছিল। ছোট ভাইকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল, "ড্রাইভারের পাশে বসে ওই ছেলেটা কে রে? তুই চিনিস?"

সতীন ঘাড় নাড়ল।

"তোর সঙ্গে খুব বকবক করছিল গাড়িতে," রথীন বলল, "এ পাড়ার ছেলে?"

"না।"

রথীন আর কিছু বলল না।

বাইরে এসে সতীন ট্যাক্সি দেখতে পেল না। না পেয়ে অবাক হয়ে চারপাশ তাকাল। জগন্ময় হাওয়া হয়ে গেল নাকি! কেনই বা সে সতীনকে আসতে বলল, কেনই বা পালাল সতীন বুঝতে পারল না।

গলির মুখ দিয়ে এগিয়ে বড় রাস্তায় আসতেই সতীন দেখল, জগন্ময় উল্‌টো দিকের ফুটপাথে। সিগারেটের দোকান থেকে সিগারেট কিনে ধরাচ্ছে, ট্যাক্সি নেই।

রাস্তা পেরিয়ে এসে সতীন বলল, "আমি ভাবলাম তুমি কেটে পড়েছ।"

"না; বাদলদা গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তায় পড়তেই প্যাসেঞ্জার পেয়ে গেল।"

"তুমি থেকে গেলে ?"

"বাঃ, তোমায় আসতে বললাম···!"

"ফিরবে কি করে ?"

জগন্ময় হেসে ফেলল। "ট্রামে-বাসে ফিরব। তুমি যে কি বল !"

একটা সিগারেট এগিয়ে দিল জগন্ময় সতীনের দিকে, বলল, "চলো, চা খাই। বহুত দিন পরে দেখা। গল্পটল্প করি একটু।"

সতীন সিগারেট নিয়ে ধরাল।

"তুমি কোথায় থাক ?" সতীন জিজ্ঞেস করল।

"আগে ক্রীক রোয়ে থাকতাম। এখন তালতলায়।"

সতীনের কী যেন একটা কথা হঠাৎ মনে এসেও আসতে চাইছিল না। জগন্ময়ের দিকে তাকিয়ে আবার মুখ নামিয়ে নিল। মনে এল না। মুখ উঠিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। ছুটো বাস আসছে পেছনে পেছনে, একটা যেন আর একটাকে তাড়া মারতে মারতে আসছে। বিশ্রী হর্ণের আওয়াজ। ধুলোর ঝাপটায় রাস্তার আলো যেন ঢেকে এল।

শরৎ কাফেতে সতীন থাকে না। সেখানে এখন পাড়ার ছেলেরা বসে আছে, বন্ধুবান্ধব রয়েছে, হয়ত কপিলও বসে আছে তার অপেক্ষায়। জগন্ময়কে ওই আড্ডায় নিয়ে যেতে চায় না সতীন। তার চেয়ে কেশব সেন স্ট্রীটের দিকে চায়ের দোকানে বসবে।

সতীন হঠাৎ বলল, "আচ্ছা, তোমার বাবা না কোথাকার মুন্সেফ-টুন্সেফ ছিলেন ?"

জগন্ময় সিগারেট টানল। কিছু বলল না। সতীন তাকিয়ে থাকল।

শেষে জগন্ময় বলল, "আমার বাবা নয়। আমি বাবা বলতুম। সিউড়ির দিকে দিনছুপুরে খুন হয়ে গেছে···।"

সতীন থমকে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

॥ তিন ॥

বিছানায় শুয়ে শুয়ে সতীন সিগারেটটা শেষ করে ফেলল। বাড়ির লোকের খাওয়াদাওয়া শেষ হয়ে যাবার পর যেমন সংসারের লোকজনের সাড়াশব্দ কমে যায় সেই রকম চুপচাপ হয়ে এসেছে; বউদির গলা, লক্ষ্মীর কাজ গুটোনোর অল্পস্বল্প শব্দ ছাড়া এখন নীচের তলা শান্ত। মেজদার ঘরে রেডিও বাজছে, খুবই মৃদু স্বরে, প্রায় শোনা যায় না, কখনও কখনও অস্পষ্ট করে গানের দু-একটা কলি যা ভেসে আসছে তাতে মনে হয় কোন রবীন্দ্র-সঙ্গীত হচ্ছে। মেজদা গান-বাজনার তেমন কিছু ভক্ত নয়, তবে রাত্রের দিকে তার রেডিও খোলার বাতিক আছে। মাঝে মাঝে ইংরিজী বাজনা শোনে। রাত এখন ঠিক কত বলা মুশকিল; দ-টা বেজে গেছে বোধ হয়; তাদের বাড়ির গলি দিয়ে এক-আধটা রিকশা দু-একজন মানুষ যাচ্ছে এখনও। গা-সিরসির-করা শীতও পড়ে গিয়েছে কলকাতায়; শীতের দিন এসে গেল বলেই রাত যেন তাড়াতাড়ি নিঝুম হয়ে আসে, রাস্তাঘাট গলিটলি ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যায়।

আধ-ভেজানো দরজা ঠেলে কাজল ঘরে এল। সতীন বোনের দিকে তাকাল।

নীচের তলার এই ঘরটা তারা ভাইবোনে ভাগ করে নিয়েছে। বরং বলা যায়, তাদের দুজনের ভাগে পড়েছে। আসলে এই বাড়ি সতীনদের কথা ভেবে তৈরী হয় নি। ঠাকুরদা হাজার বিশেক টাকায় কিনেছিল, সেকালের বিশ হাজার, মানে খুব একটা কম নয় বলেই সতীন শুনেছে। দোতলা বাড়ি। ঠাকুরদা নিজে কিছু অদলবদল করেছিল বাড়িটার। বাবার আমলে বার দুই-তিন ঘরদোর সারাসারি ছাড়া দোতলার এক কোণে ছোট একটা ঠাকুরঘর, ছাদে চিলেকোঠার পাশে জঞ্জাল জমানোর চিলতে মতন টিনের শেড আর নীচের এবং ওপরতলার কলঘরের কিছু কিছু সংস্কার সাধন ছাড়া বিশেষ কিছু হয় নি। দোতলায় হিসেব মতন তিনটে ঘর; আসলে আড়াই। নীচে রান্নাবান্নার ঘর বাদ দিয়ে দুটো।

মা বেঁচে থাকার সময় ওপরের তলায় বাবা-মা'র সঙ্গে সতীনরা থাকত। বড়দার বিয়ের পর বড়দা ওপরতলায় ঘর পেল, সতীন নীচে নেমে এল। কাজল তখনও মা'র কাছে। মা মারা যাবার পর বাবা ওপরেই থেকে গেল, বড়দা নিজের ঘর ছাড়াও বাড়তি আধখানা ঘর দখল করল, কেননা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে জিনিসপত্র সমেত একটা ঘরে বড়দার কুলোচ্ছিল না। কাজল নীচে সতীনের ঘরে এসে ঢুকল। অবশ্য মেজদা যখন কলকাতার বাইরে চাকরি করছিল তখন কাজল মেজদার ঘরটায় থাকত। এখন সতীনের ঘরে থাকে। বাবার শরীরটরীর বেশী খারাপ থাকলে কাজলকে বাবার কাছেই থাকতে হয়। নয়ত নয়। এটা ঠিক, বড়দা বাবার ব্যাপারে কাজলের ওপর তেমন ভরসা করে না —কাজেই কাজলের বাবার কাছে থাকার ব্যাপারেও তেমন জোর দেয় না। তা ছাড়া কাজল ছোট বলে বড়দা, দিদি কেউই বাবার কাছে কাজলকে সারাক্ষণ থাকতে দিতে চায় না। অনেক সময় এতে নাকি ছোটদের—মানে বাড়ির ছোট সন্তানদের মনে একটা চাপা রোগটোগ দেখা দেয়। সতীন নিজে এত বোঝে না; মোটামুটি বোঝে যে, বাবার রোগ নিত্যদিনের ভোগ বা যন্ত্রণা, মনের নানা আফসোস। কাজলকে বাবা শোনায় এটা বোধ হয় দাদারা পছন্দ করে না।

এই ঘরটা মন্দ নয়। যদিও গলির গায়ে তবু জানলা খুললে গলি চোখে পড়ে না। ঘরটা পুব-দক্ষিণ ঘেঁষে, গলিটা উত্তর দিকে। মেজদার ঘরের জানলা গলির গায়ে। সতীনদের এই ঘর সামান্য বড়, পুবে হাত-কয়েক ফাঁকা জায়গা আছে, দক্ষিণে শীলবাবুদের বড় বাড়ির গা-লাগানো গ্যারেজের শেড, চাকরবাকরদের আস্তানা, দক্ষিণটা তেমন ভাবে আটকে যায় নি; ফলে ঘরগুলো তেমন দমচাপা লাগে না। মেজদার ঘরটাও গলির গায়ে গায়ে হয়েও খুব খারাপ নয়। আসলে পুরনো বাড়ির পক্ষে তাদের এই বাড়ি এখনও বেশ দাঁড়িয়ে আছে, গলির ভেতরের দিকে বলেই হইহট্টগোল, গাড়িঘোড়ার ঝঞ্ঝাট থেকে খানিকটা মুক্ত। বাবা চিরকালই বলে এসেছে, ঠাকুরদা এসব ব্যাপারে খুব বিচক্ষণ ছিল, সাত-পাঁচ ভেবে, সুখ-সুবিধে খতিয়ে দেখে, বাড়ির ভিত

দেওয়াল কড়িবরগা সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নজর করে তবে এই বাড়ি কিনেছিল। নয়ত আজও বাড়িটা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়।

সতীন বোনের দিকে তাকাল। দরজা বন্ধ করেছে কাজল। বন্ধ করে ঘরের একপাশে সরে গিয়ে মুখ হাত মুছে নিচ্ছে।

কাজল শোবার আগে কিছু মেয়েলী প্রসাধন সেরে নেয়। যেমন, শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মুখ এবং হাতের খসখসে ভাবটা মোলায়েম করার জন্যে একটা সস্তা ক্রীম মাখে। ক্রীমে কোন্ পদার্থ আছে কে জানে, সামান্য মাখার পর কাজলের মুখ একেবারে তেলতেলে হয়ে যায়। সতীনের তখন বোনের মুখ দেখতে ভাল লাগে না; গা ঘিনঘিন করে। আজকাল বাজারে কত ভাল ভাল ক্রীম বেরিয়েছে—কিন্তু কাজলের সেই আদ্যিকালের ক্রীম। ওটা মা'র কাছ থেকে শিখেছে কাজল—মা ওকে মাখিয়ে দিত।

আজ অবশ্য সতীন বোনের মুখ নিয়ে মাথা ঘামাল না। বলল, "আজ একটা ব্যাপার হয়ে গেল, বুঝলি! দারুণ ব্যাপার!"

কাজল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখে হাতে ক্রীম ঘষছিল, দাদার দিকে তাকাল।

সতীন বলল, "আমার এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আজ। কলেজের বন্ধু। জগন্ময়।"

কাজল কিছু বলল না। দাদার অজস্র বন্ধু; পাড়ার, বেপাড়ার। অনেককে কাজল ভাল করেই চেনে, কেউ কেউ মুখ-চেনা, আবার অনেকের শুধু নামই শুনেছে। জগন্ময় নামটা তার কাছে নতুন মনে হল।

সতীন এবার পাকাপাকি ভাবে বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে কাজলের মুখোমুখি তাকাল। বলল, "বাবাকে যে ট্যাক্সি করে নিয়ে এলাম, সেই ট্যাক্সিতে ও ছিল। ড্রাইভারের পাশে বসেছিল। জগন্ময় না থাকলে তখন ট্যাক্সি পেতাম না।"

কাজল হাতমুখে ক্রীম মাখা শেষ করে সামান্য সরে গিয়ে একটা বেঁটে মতন দেরাজের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সেকেলে পুরনো দেরাজ।

রঙটা ঘন খয়েরী না কালো আজকাল আর বোঝা যায় না। দেরাজের মাথার ওপর প্লাস্টিকের টুকরো পাতা। নানা ধরনের টুকিটাকি তার ওপর ; পাউডারের কৌটো, ক্রীম, চুলের ফিতে, টিপ পরার শিশিটিশি, ছুঁচ-সুতো, চিরুনি, খোলা সেফটিপিন, মায় সস্তা কলম, এক-আধটা পড়ার বই কাজলের। দেরাজের মাঝমধ্যিখানে একটা আয়না। কাচটা ভাল। ময়লা হয়ে এলেও মুখ দেখতে অসুবিধে হয় না।

কাজল আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে শাড়ির আঁচলে আলগা করে কপালের কাছটা মুছে নিল। আজ বিকেলে তার চুল এলো ছিল। মোটা চিরুনিতে চুলটা আঁচড়ে নিতে নিতে কিছু বলব বলব ভাবছিল, তার আগেই থুতনির ডান দিকে বড় আঁচিলের কাছটায় ব্যথা করে ওঠায় কাজল বাঁ হাতে চিরুনি রেখে ডান হাতে আঁচিলটা দেখতে লাগল।

সতীন বলল, "মানুষের জীবনটীবন কি রকম হয়ে যায় বুঝলি, খুকি! একেবারে পাল্‌টে যায়। এই জগা—মানে জগন্ময় কলেজে পয়লা নম্বরের দাগী ছেলে ছিল। ডেনজারাস। বেটা ইউনিয়ন-টিউনিয়ন করত, মারপিট হাঙ্গামা, শালাকে সবাই ভয় পেত। জগন্ময়কে তার অ্যান্টিপার্টি একেবারে খতম করার চেষ্টাও করেছিল। বেটা আশ্চর্য ভাবে বেঁচে যায়। সেই জগন্ময় এখন ট্যাক্সি চালায়। বিশ্বাস করতে পারবি ?"

কাজল আঁচিলের কাছ থেকে আঙুল তুলে নিল। ব্যথাটা রয়েছে। কখনও কখনও এই রকম হয়, তার এই আঁচিলটা হঠাৎ ব্যথা-ব্যথা করে ওঠে, আবার কমে যায়। কে যেন বলেছিল, ওটা তুলে ফেলতে, মানে অপারেশান করে। কেউ আবার বলেছিল, হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেতে। কাজল কিছু করে নি। করবেও না। এই আঁচিলটা তার নিজের চোখে ভাল লাগে। অনেকের চোখেই।

চিরুনি রেখে এবার কাজল তার বিছানার কাছে এসে কোমর ভেঙে দু'হাতে বিছানাটা সামান্য পরিষ্কার করে নিল। পরিপাটি করে পাতা বিছানা, পরিষ্কারের দরকার ছিল না। তবু অভ্যেসবশে করে নিল।

"তুই কিছু বলছিস না?" সতীন যেন অধৈর্য হয়ে বলল।

"কি বলব! আমি তোমার জগন্ময়কে চিনি না।"

"চেনা না-চেনার ব্যাপার নয়; একটা ছেলের কপাল দেখ্। কোথা থেকে কোথায়!"

কাজল কি বলবে বুঝতে পারল না। তবে দাদা যে জগন্ময়কে নিয়ে বেশ ভাবছে এটা কাজল বুঝতে পারল।

"বাতিটা নিবিয়ে দিই?" কাজল জিজ্ঞেস করল।

সতীন প্রথমে না বলতে যাচ্ছিল, তার পরই মনে পড়ল, গত মাসে ইলেকট্রিক বিল নিয়ে বড়দা আর বউদি চেঁচামেচি করেছে। বিয়াল্লিশ টাকা বিল উঠেছিল। ইলেকট্রিক সাপ্লাই আজকাল যা প্রাণ চায় তাই করে। কেন করবে না? সবাই করছে। সব সাপ্লাইয়ের একই হাল। হরিণঘাটার মিল্ক সাপ্লাই ডিপোতে দুটো মেয়ে দুধের বোতল ফাঁক করে জল ঢালার সময় কে যেন দেখতে পেয়ে গিয়ে হইহই করে উঠেছিল সেদিন। সমস্ত পাড়া দুধের জায়গাটায় যা নেত্য করল, যেন একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল।

কাজল বাতি নিবিয়ে দিল। দরজা আগেই বন্ধ করেছে।

বিছানায় এসে কাজল শুয়ে পড়ল। কাঁথা টেনে নিল গায়ে। এখনও লেপ বের করার শীত পড়ে নি।

সতীন অন্ধকারে দু পলক চোখ বুজে থাকল। আবার চোখের পাতা খুলল। তার এবং কাজলের বিছানার মধ্যে অন্তত দশ-বারো হাত তফাত। দেওয়ালের একপাশে সতীন; উল্টো দেওয়ালের গায়ে গায়ে কাজল। সতীন একটা ছোট পালঙ্ক পেতে পারত, নেয় নি; সাদামাটা পুরনো খাটে শোয়। কাজল ছোট অথচ ভারী পালঙ্কে শোয়। কাজলের মাথার কাছে জানলা নেই। সতীনের মাথার দিকে জানলা। এখন সেটা পুরোপুরি খোলা নয়।

শুয়ে থাকতে থাকতে সতীন বলল, "বুঝলি খুকি, বাবাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আমি বেরিয়ে গেলাম, জগন্ময় আমার জন্যে ওয়েট করছিল। দুজনে গিয়ে বলাইবাবুর চায়ের দোকানে বসলাম। অনেক

গল্পটল্প হল। পুরনো গল্প। তা জগন্ময়কে আমি নানা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম। অদ্ভুত ছেলে। ওর বাবার কথা আমরা কলেজে শুনতাম, কোথাকার নাকি মুন্সেফ ছিল। সেই বাবাকে কারা খুন করেছে। জগন্ময় বলল, ভদ্রলোক নাকি তার নিজের বাবা নয়, বাবা বলে জগা তাকে ডাকত।"

কাজল শুনছিল। দাদার অনেক কথা রাত্রে শুয়ে শুয়ে তাকে এইভাবে শুনতে হয়, মাঝে মাঝেই, শুনে শুনে সে শুধু দাদার নয়, দাদার বান্ধুবান্ধব এবং পাড়ার নানান জিনিস জেনে যায়। আজ দাদা তার পুরনো বন্ধু জগন্ময়কে নিয়ে পড়েছে। কিন্তু বাবার ব্যাপারটা সে বুঝল না। বাবা নয় অথচ বাবা বলে ডাকত—এটা যেন কানে বেমানান শোনাল।

"কি রে, তুই শুনছিস ?" সতীন বোনের মনোযোগ পরীক্ষা করল।

"বল !" কাজল সাড়া দিল।

সতীন বলল, "জগন্ময়ের মা ছিল হাসপাতালের নার্স। জগা তখন বাচ্ছা। ওর মা আবার বিয়ে করে। কাজেই মা'র পরের স্বামীকে সে বাবা বলত।"

কাজল বলল, "ওরা কি জাত ?"

"কেন ?"

"দুবার বিয়ে ?"

সতীন কেমন থতমত খেয়ে গিয়েছিল। পরে বলল, "দুবার বিয়ের সঙ্গে জাতের কি আছে ? তুই যা এক-একটা কথা বলিস ! আমাদের বাবার ঠাকুরদার দুটো বউ ছিল তা জানিস ?"

"তা থাকবে না কেন ?" কাজল বলল, "পুরুষমানুষদের দুটো বিয়ে তো আছেই।"

সতীন হেসে ফেলল। "তুই মেয়েদের কথা বলছিস! মেয়েদেরও হয়। বিধবা মেয়েরা আজকাল কেউ কেউ বিয়ে করে। ডিভোর্স করা মেয়েরাও করে। দিদির কোন্ দেওর না ডিভোর্স হওয়া মেয়ে বিয়ে করেছে, দিদি বলছিল।"

কাজল জবাব দিল না। ব্যাপারটা সে অত তলিয়ে দেখে নি। তাদের কলেজের কল্যাণীদিরও তো দুটো বিয়ে। কল্যাণীদির প্রথম স্বামী মিলিটারিতে ছিলেন। নাগারা তাঁকে মেরে ফেলে। কল্যাণীদি আবার বিয়ে করেছেন, তাঁর স্বামী দুর্গাপুরে বড় চাকরি করে। কল্যাণীদি শুক্রবার শেষ ক্লাস নিয়ে দুর্গাপুরে স্বামীর কাছে চলে যান। সোমবার ফেরেন। শনিবার তাঁর অফ্ করে নিয়েছেন।

সতীন বলল, "তুই জাতের কথা বলছিলি! জগন্ময়রা কৃশ্চান। আমি জানতাম না। আজ কথায় কথায় শুনলাম। অবশ্য জাতটাও বোগাস। জাত মানে আলাদা, আর তোর ধর্ম মানে আলাদা। জগন্ময়রা খেস্টান। তবে আমাদের মতন। আমরাও তো হিন্দুফিন্দু। ওসব কে বোঝে! আমি তো শালা বুঝিই না। তুই বুঝিস?"

কাজল মনে মনে দু-একবার দুর্গা কালী সরস্বতী রামকৃষ্ণর কথা ভাবল। অতশত সে বোঝে না। বোঝবার দরকারও কি! তাদের বাড়িটা যে হিন্দুর সে বোঝে। বাড়িতে ঠাকুরদেবতার ছবি আছে, ঠাকুরঘর আছে, বউদি সকালে ঠাকুরকে জলবাতাসা দেয়, সন্ধ্যেবেলায় পিদ্দিম জ্বালে। বউদির শরীর খারাপ হলে কাজলকে করতে হয়। বড়দা অফিস যাবার আগে ঠাকুরঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ঠাকুরপ্রণাম করে যায়। তাদের বাড়িতে সব ক্রিয়াকর্ম হিন্দুমতে, তা বিয়েই হোক আর শ্রাদ্ধই হোক।

মা যতদিন বেঁচে ছিল বাড়িতে সত্যনারাণ সরস্বতী এসব পুজোটুজো হত; উপোস করার বাতিক ছিল মা'র—কত যে উপোস করত! মা মারা যাবার পর এ বাড়িতে ঠাকুর-দেবতার ওপর ভক্তিশ্রদ্ধা যে অনেকটা কমে গেছে তা বোঝা যায়; তবে একেবারে উঠে গেছে বা নেই তা বলা যায় না। কাজল বাড়িতে যা দেখেছে, যা বাইরে দেখছে, বন্ধুবান্ধবদের সংসারেও যা দেখে—এ-সব নিয়েই তার ধর্মজ্ঞান। এর বেশী সে কিছু জানে না।

সতীন এবার শব্দ করে হাই তুলল। বলল, "জগন্ময়ের লাইফটা বড় অদ্ভুত। ওর নিজের বাবা মারা গিয়েছিল ট্রেন অ্যাক্সিডেণ্টে। ওর

মা মারা যায় আগুনে পুড়ে। আর এই ভদ্রলোক—ওর পরের বাবাকে খুন করেছে ওখানকার লোকরা।”

কাজল অন্ধকারের মধ্যেই যেন দাদার দিকে তাকাল। পর পর এতগুলো অস্বাভাবিক মৃত্যু যেন তাকে বিস্মিত করছিল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকল সতীন। তারপর বলল, “খুকি, আমি যদি ট্যাক্সি চালাই কেমন হয় ?”

কাজল আচমকা এ-রকম প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারল না। দাদা ট্যাক্সি চালাচ্ছে ভাবতেই তার অনেকটা সময় লেগে গেল।

“কি রে ?” সতীন আবার জিজ্ঞেস করল।

“তুমি ট্যাক্সি চালাবে ?”

“কেন, কি হয়েছে ?···লোকে নিজের গাড়ি চালালে তার প্রেস্টিজ বাড়ে, পরের গাড়ি চালালে লজ্জার কি আছে !···আমাদের ব্যাপারটা অদ্ভুত বুঝলি খুকী, একেবারে হযবরল ! ধর্, আমি যদি এরোপ্লেন চালাই, সেও তো আমার বাপের সম্পত্তি নয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রেস্টিজ বেড়ে যাবে, লোকে বলবে পাইলট্। তোর সেই বড়লোক বন্ধু—কি নাম রে তার, জয়তী না শাশ্বতী—তার বাবা এসে আমায় জামাই করে নেবে, আর আমি শালা চার চাকার রাস্তায় চলা গাড়ি চালালেই তোরা নাক সিঁটকে বলবি, ছি ছি ! তোদের সমাজের ব্যাপারটাই এই রকম। লুডিক্রাস !”

কাজল হেসে ফেলল। ভাবল, তা যদি হয় তবে ঠেলা চালাতেও দোষ কি !

সতীনও অবশ্য খানিকটা হালকা করে রঙ্গ করে কথাগুলো বলেছিল, অবশ্য বলতে বলতে তার গলায় এক রকম ব্যঙ্গ ও ঝাঁঝ ফুটে উঠল।

কাজল বলল, “তুমি কি গাড়ি চালাতে জান ?”

“শিখে নেব। জগার কাছে শিখব।”

“তোমায় বুঝি তোমার বন্ধু তাই বলে গেছে ?”

“না, ও কিছু বলে নি। আমি নিজেই বলছি।···চাকরিবাকরির বাজার খারাপ, হাজার হাজার লোক বেকার। এ বেটা গভর্ণমেণ্টের

বাবাও কিছু করতে পারবে না, বড় বড় কথা বলবে। কাঁহাতক বসে থাকব। কত লোককে বলেছি। কোথায় চাকরি। বাড়িতে আর প্রেস্টিজ থাকছে না খুকী। বড়দা সেদিন কি বলল শুনলি তো—বলল, ইফ দেয়ার ইজ্ এ উইল্ দেয়ার ইজ্ এ ওয়ে···! আমার চাড় নেই, গরজ নেই—এটা আমার বড়দাবাবু বেশ ধরে নিয়েছেন। বউদি তো রেগুলার আমায় সাসপেক্ট করে, ভাবে বাবার কাছ থেকে টাকাফাকা হাতাই।···কী অবস্থা বল্!"

কাজল একটু ভেবে বলল, "জামাইবাবু তোমার জন্যে চেষ্টা করছে খুব।"

"জামাইবাবুর কথা বাদ দে," সতীন বিরক্ত হয়ে বলল, "সব ব্যাপারে মাথা নাড়ে, সবাইকে হ্যাঁ বলে—কাজের বেলায় কিছু নয়। বড়দা যে বলে না, জামাইবাবু খাঁটি মিত্তির; ঠিক কথা বলে। মুখে জামাইবাবু জগৎ-সংসার মেরে বেড়াচ্ছে। একটা লোক—পুরুষ-মানুষ—দিনে কুড়ি-পঁচিশটা পান খায় আর জরদা গালে ফেলে, ও লোকের দ্বারা কিছু হবে না। বাবা মাইরি কেন যে এই রকম একটা জামাই সিলেক্ট করেছিল কে জানে!"

কাজল আবার হেসে ফেলল।

সতীনও কি মনে করে নিজের কথাতেই হাসল। তারপর বলল, "খুকি, তুই যদি পান-খাওয়া লোককে বিয়ে করিস, কিংবা মিত্তিরটিত্তির—আমি বিয়ের দিন কেলেঙ্কারি করব।"

হাসির গলায় কাজল বলল, "করো।"

"ঠাট্টা নয়; সিরিআসলি বলছি।"

কাজল হাসছিল। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না।

সামান্য চুপচাপ থেকে সতীন হঠাৎ বলল, "খুকি, তোর সেই ছবি-আঁকা ছেলেটার খবর কি?"

কাজল যে অপ্রস্তুত বোধ করল সতীন বুঝতে পারল না, দেখতেও পেল না। চুপ করে থাকল কাজল।

সতীন বোনকে ঠাট্টা করে বলল, "একদিন এসপ্লানেডে ওকে

দেখলাম, বুঝলি? মেয়েদের মতন চুল, গায়ে মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি, একটা পাজামা পরেছে, কাঁধে লম্বা থলি। ওর সঙ্গে আরও জনাচারেক ছেলে, একটা ফড়িং টাইপের মেয়ে।···বাসের সামনে দাঁড়িয়ে যা হল্লা করছিল!"

কাজল কোন জবাব দিল না কথার। সিংহী বাগানের ফ্ল্যাটে কাজলের এক বন্ধু থাকে—মানসী। মানসীর মামাতো দাদা ওই ছেলেটি। নাম উজ্জ্বল। উজ্জ্বল সরকার। ডাকনাম বাচ্চু। বেশীর ভাগ লোকই ওকে বাচ্চু বলে ডাকে। কাজলের সঙ্গে মানসীদের বাড়িতে চেনাশোনা হয়েছিল। একবার তারা কলেজের কটি মেয়ে মিলে মিউজিয়ামে যায়, মানসী আর্ট কলেজ থেকে ধরে আনে তার বাচ্চুদাকে। সেদিন খুব হইহই হয়েছিল। কলেজের আর একটা ব্যাপারে মানসী তার বাচ্চুদাকে এনেছিল, মণ্ডপ সাজাবার জন্যে। তখনও নানা রকম মজা হয়েছে। এরপর কাজল বার দুই-তিন উজ্জ্বলের সঙ্গে রাস্তাঘাটে সামান্য ঘোরাফেরা করেছে। একবার মাত্র উজ্জ্বল এ-বাড়িতে এসেছিল মানসীর দরকারে। দাদা তার পর থেকেই তাকে ঠাট্টা-তামাশা করে। করুক না। কি ক্ষতি? দাদার সঙ্গে গোপাদির ভাবসাব নিয়েও তো সে কত ঠাট্টা করে। আসলে এই বাড়ির মধ্যে একটা আশ্চর্য ভাগাভাগি রয়েছে। বাবা বাবার মতন। একা। বড়দা বউদি আর বুলু মণি মিলে একটা আলাদা অংশ। মেজদা একেবারে নিজের মতন। সংসারের মধ্যে কোন ঝঞ্ঝাট-ঝামেলায় নেই, বাবার ব্যাপারে নিস্পৃহ নয়—কিন্তু তার কোন রকম ছটফটানি নেই। অন্যদের ব্যাপারে মেজদা কেমন ঠাণ্ডা মতন, কিন্তু কাউকেই অগ্রাহ্য করে না। সতীন এবং কাজলের কিছু টাকাপয়সা মেজদার কাছ থেকেই আসে; চাইলেই দিয়ে দেয়। তবু মেজদা কিন্তু নিজের মতন থাকে। কাজল আর সতীন—দুই ভাই বোন দুজনকে অবলম্বন করে এ বাড়িতে বেঁচে আছে। এই দুই ভাই বোনের মধ্যে গোপনতা প্রায় নেই, দুঃখ-সুখের সব কথাই একে অন্যকে না বলে সুখ পায় না। এই ঘনিষ্ঠতা, অন্তরঙ্গতা এবং প্রীতি তাদের কেমন যেন বেঁধে রেখেছে।

কাজলের দিক থেকে সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না দেখে সতীন ঠাট্টা করে বলল, "কি রে, তুই ঘুমিয়ে পড়লি নাকি ?"

কাজল সাড়া দিল, "না।"

"তবে চুপ করে আছিস কেন ? সেই ছেলেটার ব্যাপারস্যাপার বল্ ?"

"আমি জানি না।"

"গুল মারিস না। তুই সামথিং জানিস।"

"না। কালী পুজোরও অনেক আগে একবার দেখেছিলাম। আর নয়।"

সতীন হেসে উঠল। কাজলের গলা করে বলল, "কালী পুজোরও অনেক আগে একবার দেখেছিলাম—" বলে আবার হাসল। তারপর চুপ করে গেল।

কাজল বোধ হয় মনে মনে উজ্জ্বলকে ভাবছিল।

সতীন আচমকা বলল, "খুকি, তোকে একটা অ্যাডভাইস দি। আমাদের এক বন্ধু, এক বছরের সিনিআর, বোধন মজুমদার, কবিতা-টবিতা লিখত। তার পদ্য কাগজে ছাপা হত, বুঝলি! বেটা কবিতা কবিতা করে মরত, কফি হাউসে মাছির মতন বসে থাকত সারাদিন। সেই বোধন আজকাল মশামারা ধূপের ক্যানভাস করে বেড়ায়। পোয়েট্রি-ফোয়েট্রি কেউ কেয়ার করে না, বুঝলি ? ছবি এঁকে, পদ্য লিখে কিচ্ছু হবে না। কোন শালা আদর করে জামাই করবে না রে। আজকাল লোকে অন্য জিনিস চায়, হয় বিজনেস, ব্ল্যাক মানি ; না হয় ঘুষের চাকরি…।"

কাজল যেন সামান্য ক্ষুণ্ন হয়েই বলল, "তা কি হবে, তোমার মতন তো সবাই ট্যাক্সি চালাতে পারবে না !"

সতীন জোরে হেসে উঠল।

কাজল আর কথা বলল না। চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরল।

সতীন আরও কিছুক্ষণ জেগে থাকল। জগন্ময় তাকে তার তাল-তলার আস্তানায় যেতে বলেছে। সেখানে নাকি জগন্ময় এমনভাবে থাকে দেখলে সতীনের মাথা ঘুরে যাবে। কিভাবে থাকে জগন্ময় অবশ্য

তা বলে নি। বলেছে—এস না একদিন, দেখবে। যেদিন যাবে সেদিন আমার সঙ্গে থাকবে সারাক্ষণ। তোমার একটা এক্সপিরিয়ান্স হবে।

তালতলায় জগন্ময় কেমন করে থাকে সতীন জানে না। সারাটা দিন জগন্ময়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে তার যে কোন্ লেজ গজাবে তাও সে বোঝে না। তবু তার জগন্ময়ের কাছে যেতে ইচ্ছে করছিল। এই বাড়ি, এই পাড়া, সেই একই চায়ের দোকান, বন্ধুবান্ধব, একই রকমের সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যে রাত আর ভাল লাগে না। একেবারেই ভাল লাগে না। কোথাও কোন স্বাদ নেই, তৃপ্তি নেই। তাছাড়া এই বাড়িতেই বা কী আছে? কী আছে এখানে? জগন্ময়ের সঙ্গে কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করে দেখাই যাক না, অন্তত খানিকটা মুখবদল হবে।

সতীন গায়ের মোটা চাদরটা মুখের ওপর টেনে নিল।

॥ চার ॥

পরের দিন সকালে আবার সেই শরৎ কাফে; নিত্যদিনের মতন সেই কপিল, উমা, তারক-টারক; বুকের কাছে চায়ের কাপ টেনে নিয়ে বসে থাকা; মাঝে-সাঝে চারমিনার ধরানো; খবরের কাগজটা অলস-ভাবে উলটে যাওয়া, কখনও কখনও রাস্তার দিকে তাকিয়ে মানুষ দেখা, রিকশা দেখা, পাড়ার ডাকসাইটে কোন মেয়েকে দেখতে পেলে দু-চারটে অস্ফুট মন্তব্য, কখনও বা অতি সামান্য ব্যাপারে প্রবল কলরোল করে ওঠা। সতীনের মাঝে মাঝে মনে হয়, ঘড়ির বারোটা ঘর যেমন ভাগ করা, দুটো কাঁটাকে তার ওপর দিয়ে ঘুরে যেতে হয়, সতীনদের জীবনের ব্যাপারটাও সেই রকম। এর সকাল, দুপুর, বিকেল, রাত—একই রকম, কোনো তফাত নেই, গতকাল যা যা ঘটেছে—যেভাবে কেটেছে, আজও সেই ভাবে কাটবে এবং আগামী কালও। বাস্তবিক নতুন কিছু ঘটছে না, ঘটবে না। সেই সকালে

ঘুম ভেঙে উঠে মুখ ধোও, বাড়ির এক কাপ বারোয়ারি চা খেয়ে থলে হাতে বাজার করতে ছোট। বড়দা বাজার যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে অনেক দিন, অত সময় তার থাকে না, রোববার-টোববার হলে শখ করে বাজারে যায় কোনোদিন; আর মেজদা তো অন্য মানুষ— বাজারহাট, তেলনুন, দুধের ডিপো এ-সবের মধ্যে থাকে না। সতীন যেহেতু জোয়ান ছেলে, একেবারে বেকার, কাজে কাজেই সংসারের এই ধরনের যাবতীয় ঝামেলাগুলো তার ঘাড়ে।

সকালের বাজারহাট এটা-ওটা সেরে সতীনের শরৎ কাফেতে আসতে আসতে আটটা সাড়ে আটটা বেজে যায়। ততক্ষণে চায়ের দোকানে কেউ না কেউ এসে গেছে। সতীন এসে বসতে না বসতেই এক কাপ চা দিয়ে যায় নীলু। তারপর চা খেতে খেতে অকারণ কথা, হাসি-ঠাট্টা, খবরের কাগজের পাতা ওলটানো। প্রায় একই জায়গায়, একই ভাবে বসে পুরো সকালটা কাটিয়ে দেওয়া।

সতীন আজ সকাল থেকেই কেমন যেন এক বিরক্তি বোধ করছিল। একঘেয়েমির না অন্য কিছুর বোঝা মুশকিল। সে সামান্য গম্ভীর, অন্যমনস্ক ছিল, বেশী কথাবার্তাও বলছিল না।

উমানাথ কাগজ দেখছিল। সতীনের মুখোমুখি উমানাথ। কপিল সতীনের পাশে। তারক পাশের টেবিলে গিয়ে বাবলুদের সঙ্গে কি কথা বলছিল।

কাগজ দেখতে দেখতে উমানাথ হঠাৎ একটা জায়গায় আঙুল রেখে বলল, "এই খবরটা দেখেছিস?"

কপিল তাকাল। সতীন রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে।

উমানাথ বলল, "কাল হেদোতে একটা মার্ডার হয়েছে। রাত ন'টা নাগাদ।"

কপিল বলল, "কি রকম মার্ডার? ছোরা না পাইপগান?"

উমানাথ খুনের বৃত্তান্ত বলতে লাগল। কাল রাত ন'টা নাগাদ, যখন পার্কে লোকজন প্রায় ছিলই না, হেদোর উত্তরদিকে একটি বছর বাইশ-তেইশের ছেলেকে কারা যেন আচমকা ঘিরে ফেলে।

ছেলেটি বোধ হয় পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, পারে নি, তার ওপর ছোরা নিয়ে অন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছেলেটির সঙ্গে এক বয়স্কা ভদ্রমহিলা ছিলেন, তিনি চেঁচামেচি শুরু করেন, কিন্তু আশপাশ থেকে কেউ ছুটে আসে নি। ভদ্রমহিলাকে পরে অজ্ঞান অবস্থায় ক্লাবের মালিরা ক্লাবঘরে নিয়ে যায়। পুলিস ঘটনার তদন্ত করছে।

কপিল বলল, "রাত্তির বেলায় পার্কে মেয়েছেলে কি করে আসে রে?"

সতীনের কান গিয়েছিল কথাটায়, কপিলের দিকে তাকাল। কেন কে জানে সতীন হঠাৎ কেমন বিতৃষ্ণা বোধ করল কপিলের ওপর। রুক্ষভাবে বলল, "কেন, মেয়েছেলে থাকলে ক্ষতি কি?"

"ক্ষতি কিছুই নয়, তবে কেস্ খারাপ।"

সতীন রেগে গেল। "কেস্ খারাপ! তোমার শালা সব কেস্‌ই ওই একটা দিক থেকে দেখা! লাইফে আর কিছু দেখতে শিখলে না!"

কপিল বলল, "অন্য কেস্ কি হবে? তুই বল না! শীতের দিন ফাঁকা পার্কে রাত ন'টার সময় কোন্ যুধিষ্ঠির মেয়েছেলে নিয়ে হাওয়া খেতে যায়?"

সতীনের মাথা গরম হয়ে গেল। বলল, "বাজে কথা বলবি না, মেয়েছেলেটিকে বয়স্কা বলা হয়েছে, তার মানে মহিলার বয়েস হয়েছিল।"

কপিল খারাপ ভাবে হাসল। "তাতে কি হয়েছিল!...বেশী বয়েস হওয়া মেয়েছেলের সঙ্গে কম বয়সের ছোঁড়া ঘোরে না শালা? আমাদের বিভু কি করছে? সে শালা তার মা'র বয়েসী মেয়ের সঙ্গে থাকছে না?"

সতীন খুব কড়া ভাবে ধমকে উঠল কপিলকে। খেপার মতন বলল, "তুমি শালা বিভুই দেখেছ আর কিছু দেখো নি। আমি যদি বলি, ওই ছেলেটা লুকিয়ে ওর মা'র সঙ্গে পার্কে দেখা করতে এসেছিল, এসে মার্ডার হয়ে গেছে...!"

"লুকিয়ে আসবে কেন ?"

"সরাসরি আসা যায় না বলে ! তুমি বাঞ্চোৎ স্বর্গে বাস করছ ? চারদিকের অবস্থা দেখছ না ? তুমি জান না শালা, কত ছেলে পাড়া ছেড়ে মা-বাপ ছেড়ে পালিয়েছে, তারা নিজের বাড়িতে আসতে পারে না ?"

কপিলও এবার বিরক্ত হয়ে উঠল। বলল, "তুই শালা পার্টিতে নাম লিখিয়েছিস নাকি ?"

"পার্টিতে নাম লেখাবার দরকার করে না। চোখ খুললেই দেখা যায়।···হোয়াট্ অ্যাবাউট্ তাপস ? এ-পাড়ার ছেলে। তুমি তাকে চেনো। আজ দেড় বছর ধরে সে পালিয়ে আছে। পাড়ায় আসতে পারছে না। এলেই তোমার সান্নুদার পার্টির লোক তাকে খতম করে দেবে। তাপসের মা তোমাদের হাতেপায়ে ধরেছে কম ! কি হয়েছে চাঁদ ?"

কপিল হাত নেড়ে বলল, "আমার হাতেপায়ে কেউ ধরে নি। আমি শালা পার্টি করি না। তবে তাপসের কথা তুললে বলে বলছি, তাপস একসময়ে খুব রাজত্ব করেছিল ভাই এ-পাড়ায়, এখন জমানা বদলে গেছে, তাপস যখন রাজত্ব করেছিল তখনও অনেকে এ-পাড়ায় ঢুকতে পারে নি, এখন তার পালা, সেও ঢুকতে পারবে না। এটা সোজা কথা।"

সতীন কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই উমানাথ বলল, "সতু যা বলছে সেটা হতে পারে। সেদিন বেলঘরিয়াতে ঠিক এই রকম একটা কেস্ হয়েছে। একটা ছেলে তার মা'র সঙ্গে দেখা করার জন্যে নার্সিং হোমে গিয়েছিল। তাকে মাইরি ঠিক ঠিক চেঞ্জ্ করে ধরে ফেলল। তারপর সেরেফ লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে শেষ করে দিল।"

কপিল কোনো কথা বলল না।

সতীন সামান্য চুপ করে থেকে যেন কপিলকেই শোনাচ্ছে এমন ভাবে বলল, "এ-সব কেসের কোন ইন্‌ভেসটিগেশান হয় না। সবাই

জানে, সবাই বোঝে ব্যাপারটা। খুব বেশী কিছু হলে কাগজে বেরুবে —উগ্রপন্থীর সঙ্গে সংঘর্ষ।...সবাই শালা আজকাল উগ্রপন্থী, রাম শ্যাম যদু সবাই। আমরাও যদি শালা খুন হয়ে যাই উগ্রপন্থী হয়ে যাব।"

কপিল সতীনের মেজাজটা বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ আজ সকাল থেকেই বেটার হল কি ? সামান্য কথায় এত খেপে গেল কেন ?

তারক ওপাশের টেবিল থেকে ফিরে এসে বসল। বসেই বলল, "গোটা পঁচিশেক টাকা কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারিস ?" বলেই কপিলের দিকে তাকাল।

কপিল চোখ ফিরিয়ে নিল।

উমানাথ ঠাট্টা করে বলল, "মাত্র পঁচিশ...। এক কাজ কর্, দীনবন্ধুদের বাড়ির তলায় একটা শেতলা-ফেতলা নিয়ে বসে পড় গে যা।"

তারক রাগ করল না। হেসে হেসেই বলল, "যা বলেছিস ! ওই লাইনেই যাব মাইরি ! ভাল লাইন।"

তারক সামনে থেকে চারমিনারের প্যাকেটটা তুলে নিল। সতীনের প্যাকেট। "কপিল, আমার জন্যে একটা চা বল্।"

কপিল চায়ের কথা বলল না।

উমানাথ বলল, "তারক, তুই বেটা আজকাল সাট্টা পার্টিতে ভিড়েছিস !"

তারক যেন অবাক চোখে উমানাথকে দেখল, তারপর বলল, "না মাইরি, সাট্টা নামেই শুনেছি।"

"তা হলে টাকা কি করবি ?"

তারক সিগারেটটা ধরিয়ে নিল। নিয়ে চা দিতে বলল নীলুকে। একবার সতীনের দিকে তাকাল, তারপর কপিলের দিকে। বলল, "আমার এক মাসি আছে। মা'র ছেলেবেলার ফ্রেণ্ড। বেলতলায় থাকে। তার টিবি-ফিবি হয়েছে বোধ হয়। মা'র কাছে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে কিছু। মা আবার বাবাকে এসব কথা ভয়ে বলে না। বললেও কোনো সুবিধে হবে না। আমার কাছে ঘ্যানঘ্যান করছে। আমি কোথায় টাকা পাব বল্ ?"

কপিল উঠে পড়ার ভাব করল। সতীনকে আজ সে কিছু বলবে না। সকালবেলায় চায়ের দোকানে ঝগড়াঝাঁটি করতে চায় না সে। তাছাড়া তার অন্য কাজ রয়েছে। একবার গড়পারে যেতে হবে।

কপিল বলল, "তোরা বস্। আমি যাই।"

"এত সকাল সকাল?" উমানাথ বলল।

"একবার গড়পারে যেতে হবে।"

তারক বলল, "চায়ের দাম দিয়ে যা···। তুই শালা এত কিপ্টে হয়ে যাচ্ছিস কেন আজকাল?"

কপিল পকেট থেকে একটা টাকা বের করে টেবিলের ওপর ফেলে দিল। "বাকিটা তোরা দিয়ে দিস।"

কপিল চলে গেল।

সতীন কপিলকে রাস্তায় নামতে দেখল। তারপর আড়ালে চলে গেল কপিল।

কপিলের সঙ্গে আচমকা যে মন-কষাকষি হয়ে গেল, তার জন্যে সতীন কোনো অনুতাপ বোধ করল না। কপিল তার বন্ধু; অনেক কালের। একই পাড়ার ছেলে। দুজনে গলাগলি করে অনেক ঘুরেছে, এখনও ঘুরে বেড়ায়। প্রয়োজনে কপিল তাকে কম সাহায্যও করে নি। কোনো সন্দেহ নেই, কপিল তাকে বন্ধু হিসেবে ভালবাসে। তবু কপিলের অনেক কিছু সতীন পছন্দ করে না। কপিলের মধ্যে কেমন একটা গায়ে ফুঁ দিয়ে থাকার অভ্যেস আছে। সেটা অস্বাভাবিক নয়। তার বাবার পয়সা আছে। রঙটঙের কারবারী। স্ট্র্যাণ্ড রোডে দোকান। দু'তিন পুরুষ ধরে কপিলদের পরিবার রঙের কারবার করছে। পয়সাকড়ির অভাব নেই তাদের পরিবারে। এই পাড়ায় তাদের মস্ত বড় বাড়ি, পরিবারও বড়, একান্নবর্তী পরিবার। কপিলের দাদা বাবার সঙ্গে ব্যবসায় ভিড়ে গেছে। কপিল ওপথে পা মাড়ায় নি এখনও। এমনিতে দরাজ গোছের ছেলে। কিন্তু ওই যে বড়লোকের বাচ্চা বলে সব ব্যাপারে গা এলানো ভাব। কোনো দুঃখকষ্টই যেন বেটার গায়ে লাগে না।

বাস্তবিকপক্ষে কাগজের ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেবার কি আছে ? কেনই বা কপিল মনে করবে এক বয়স্কা ভদ্রমহিলা রাত্রের দিকে পার্কে এলেই তাকে নোংরা চোখে দেখতে হবে ? বরং সতীন তো মনে করে, তার ধারণাই ঠিক। নিশ্চয় কোন নকশাল ছেলেটেলে লুকিয়ে তার মা কিংবা মাসি কিংবা দিদিটিদির সঙ্গে পার্কে দেখা করতে এসেছিল। আজকাল হামেশাই এইভাবে ছেলেতে-বাপেতে, মায়েতে-ছেলেতে দেখা হয়। আগে থেকে খুব গোপনে খবর দেওয়া-দেওয়ি করে দেখা করে দুজনে কোনো নিরিবিলি জায়গায়। এই ঘটনাটাও সেই রকম। সতীন অন্তত সেই রকম মনে করে।

কপিল শালা কিছু না বুঝেই দড়াম করে খারাপ রিমার্ক করবে কেন ? এ-রকম কোনো অধিকার তার নেই।

তারক চায়ে মুখ দিল।

উমানাথ বলল, "তোকে আমি দশটা টাকা দিতে পারি।"

"দশ ?"

"আর নেই।"

তারক সতীনের দিকে তাকাল। "সতু, তুই কিছু পারিস ?"

সতীন মাথা নাড়ল।

"চেষ্টা করে দেখ্।"

সতীন তারকের দিকে তাকাল। দু মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, "খুকির কাছে দশ-বিশ টাকা থাকে। কিন্তু সে একটু পরেই কলেজ চলে যাবে।"

"বিকেলে দিস।"

"বিকেলে আমি থাকব না।"

কোথায় যাবি ?"

"যেখানে হোক যাব, পাড়ায় থাকব না।···সারাদিন শালা এই পাড়া, চায়ের দোকান, রাস্তায় গজাজ্‌লা, রেলিংয়ে পাছা ঠেকানো— আর ভাল লাগে না।"

উমানাথ বলল, "বেপাড়ায় যাবি ? যা। গিয়ে দেখ্ কত ভাল

লাগে।”

সতীন কোন জবাব দিল না। কোথায় যাবে সে বিকেলে ? যাবার জায়গা কোথায় ? জগন্ময়ের কাছে তালতলায় যাবে ? অসময়ে গেলে জগন্ময়কে পাওয়া যাবে না। তা হলে ?

অনেক ভেবেও সতীন কোথাও যাবার জায়গা পেল না। যেন এই কলকাতা শহরে তার যাবার কোনো জায়গা নেই।

॥ পাঁচ ॥

অফিস থেকে ফিরতে বেশ দেরিই হল রথীনের ; শীতের দিন, সন্ধ্যে বলে তখন আর কিছু ছিল না, রাত হয়ে গিয়েছিল। সচরাচর রথীন সন্ধ্যের মুখেই বাড়ি ফিরে আসে। আজ দেরি হল।

অফিসের জামা প্যাণ্ট ছাড়তে যে সময়টুকু লাগল, তার পরই রথীন বাবার ঘরে গিয়ে বলল, “কেমন আছ ?”

বিনয়ভূষণ পিঠের তলায় বালিশ রেখে মাথা সামান্য উঁচু করে শুয়ে ছিলেন। তাঁর বিছানার পাশে পুরনো একটা বই, ভাগবত বোধ হয়। ঘরের জানলা বন্ধ। হাল্‌কা বাতি জ্বলছে। ক্লান্তি এবং দুর্বলতা কাটাবার জন্যে মানুষ যে ভাবে অলস হয়ে বসে থাকে তিনি সেই ভাবেই বসে ছিলেন।

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ খুশীর গলায় বিনয়ভূষণ বললেন, “আজ তো ভালই লাগছে। এক-আধবার একটু কষ্ট হয়েছিল, নয়ত বেশ আছি।”

“খাওয়াদাওয়া ঠিক মতন করতে পেরেছ ?”

“দুপুরে ভাত খেয়েছি। বিকেলে দুধ। দুটো বিস্কুট ভিজিয়ে খেয়েছি। রাত্রে খই-দুধ খাব…”

রথীন আর দাঁড়িয়ে থাকার দরকার মনে করল না। ফিরে আসতে যাচ্ছিল। বিনয়ভূষণ কথা বলায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

“তোমার আজ দেরি হল, না ?”

"হ্যাঁ, একটা কাজে দেরি হল—।"

"তার পর যা কলকাতার অবস্থা। গাড়ি ঘোড়া পাওয়াই যায় না…"

"যাচ্ছেতাই অবস্থা।"

"আমি ভাবছিলুম তুমি বুঝি আবার কারও সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছ। বলেছিলে না কোথায় যেন যাবে একবার!…আমি কি বলি জান, তোমার এই নতুন হোমিওপ্যাথী ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে আজ চার পাঁচ দিন আমি বেশ ভালই থাকছি। ডাক্তারটি ভাল। বুঝলে রথী, ভেরী গুড ডক্টর। তুমি আর ছোটাছুটি করো না…।"

রথীন দু-মুহূর্ত বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। বলল, "বেশ।"

আর দাঁড়াল না রথীন, বাবার ঘর থেকে চলে এল।

বাথরুমে একটু সময় লাগে রথীনের। বরাবরই। মানুষটা যে কিছুটা শৌখিন প্রকৃতির, আর হুড়মুড় করে কিছু করে না এটা নাকি তার বাথরুমে সময় কাটানো দেখেই বোঝা যায়। অন্তত রথীনের স্ত্রী নন্দা তাই বলে। স্বামীকে ঠাট্টা করে। বিয়ের পর থেকেই করে আসছে। বলে, "তোমার সাবান মাখা আর জল ঢালার বহর বাবা মেয়েদেরও হার মানায়। গায়ের রঙ আর ফরসা করো না, তোমার পাশে আমাকে ঝি-দাসীর মতন দেখাবে।"

শীত পড়তে শুরু করেছে বলে রথীন সন্ধ্যের দিকে জল ঘাঁটাঘাঁটি একটু কম করে। আজ আরও সংক্ষেপ করল।

দোতলায় নিজের ঘরে ফিরে এসে শুকনো হয়ে, চুলটুল আঁচড়ে গোছগাছ হয়ে বসার মুখেই নন্দা চা নিয়ে ঘরে এল।

রথীন বলল, "ও-সব খাবারটাবার দিও না, শুধু চা দাও।…আজ গুচ্ছের খাওয়া হয়ে গিয়েছে।"

নন্দা বুঝতে পারল না। কোথায় যে গুচ্ছের খাওয়া হল জানবার জন্যে সে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকল।

সাবেক আমলের ইজিচেয়ারে বসে আরামের শ্বাস ফেলল রথীন। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, "মুখার্জি সাহেবের সঙ্গে লেক টাউন গিয়েছিলাম। মুখার্জি ওখানেই থাকে। জমি কিনেছে। বাড়ি করার ধান্দায় আছে।"

নন্দা স্বামীর হাতে চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। বোঝাই যাচ্ছে, মুখার্জির বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করেছে রথীন।

"খুব খাওয়াল বুঝি! কি খেলে?"

মিষ্টিফিষ্টি, তার ওপর মুখার্জির বউ কিসের চপ করেছিল···মাছের বোধ হয়, ভালই করেছিল। বেশ গুণী মহিলা।"

নন্দা আড়চোখে দরজার দিকে তাকাল। পাশের ঘরে ছেলেমেয়ের মধ্যে একটা ছোটখাটো বচসা হচ্ছে। এরকম সারাদিনই হয়। হোক।

"মাছের চপ তৈরী করা ছাড়া আর কি কি গুণ দেখলে মহিলার?" নন্দা প্রায় ঠাট্টার গলায় বলল।

"খুব পলিশ্‌ড্‌।···ঘরদোর যা সাজিয়ে রেখেছে—একেবারে ছবির মতন। কাজের মেয়ে। সারাদিনই সংসার নিয়ে খাটছে।"

"তাই নাকি?" নন্দা এবার আর ঠিক ঠাট্টা করল না।

রথীনের প্রথমটায় খেয়াল হয় নি, পরে হল। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রথীন বলল, "তোমরা—মেয়েরা বড় জেলাস হও।···যাক্ গে, ওসব বাজে কথা ছাড়। আমি লেক টাউনটা একবার দেখে এলাম। মুখার্জির জমির কাছে আড়াই কাঠা মতন একটা প্লট রিসেল রয়েছে। জমিও দেখলাম—অন্ধকারে। মানে একটা আইডিয়া হল। ভাল জায়গা। ইস্ট ফেসিং। দক্ষিণেও জায়গা ছাড় থাকবে। ভি আই পি রোড কাছেই। জায়গাটা চমৎকার করেছে। গভর্ণমেন্ট নিয়েছিল বলে উতরে গেল।" রথীন যতটা জোরে কথা শুরু করেছিল শেষের দিকে ততটা থাকল না, কেমন যেন চাপা হয়ে এল।

নন্দা স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকল, চোখের পাতা না ফেলেই। খানিকটা যেন কৌতূহলের দৃষ্টিতে।

চায়ে পর পর কয়েকটা চুমুক দিল রথীন। "বসো না।···আচ্ছা

দাঁড়াও, আমার সিগারেট দেশলাইটা এনে দাও।" বলে দেরাজের দিকটা দেখিয়ে দিল।

নন্দা দেরাজের মাথার উপর থেকে সিগারেট দেশলাই এনে দিয়ে বিছানার মাঝামাঝি জায়গায় বসল, রথীনের কাছাকাছি।

রথীন বলল, "একদিন সকালের দিকে যাব। তোমাকে নিয়েই যাব। একবার নিজের চোখে দেখো।"

নন্দা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, "সত্যি সত্যি জমি কিনবে ?"

"বাঃ! সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে এখন···"

"কই, তুমি তো সেভাবে বলো নি! বলতে, কোথাও একটু জমি কিনে রাখলে হয়!"

"বলেছি।··তোমাদের মাথায় হাতুড়ি মেরে কিছু ঢুকিয়ে না দিলে কিছু ঢোকে না।"

"তা তো বলবেই। তোমার অর্ধেক কথা মনে অর্ধেক কথা মুখে, কে বুঝবে বাবা তোমার কথা!"

রথীন কথাটা কানেই শুনল না। সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে বলল, "জমির দামটা বড় বেশী চাইছে।"

"কত ?"

"দশ-টশ বলছে।···এত হাই প্রাইসের কোনো মানে হয় না। দশ-পনেরো বছর আগে তো বাবা হোগলা বন না হয় জলা জমি কিনেছিলি। দু-চারশো টাকা বিঘেও দাম ছিল না। আমি তোমায় বলছি, যখন ওদিকে মার্টিন রেল চলত—দু-চার বার ওই রাস্তা দিয়ে জেসপ্ কোম্পানীর ফ্যাক্টরিতে গিয়েছি। সেটা ধর, ফিফ্‌টি ওয়ান-টুয়ান হবে।" বলেই রথীন যেন সাল-টাল মনে করার চেষ্টা করল। চোখ ভুরু কোঁচকাল সামান্য। তারপর বলল, "সালটা আমার মনে পড়ছে না, ওই ধর পনেরো-কুড়িই হবে—একেবারে জঙ্গল ছিল। জেসপের কোয়ার্টারে বড় পিসিমারা থাকত। তখন গিয়েছি। দেখেছি সব। সেই জমির এখন কি দাম! তাও শুনলাম, নয়-দশ কম,

বারো-টারোতেও জমি বিক্রী হচ্ছে।”

নন্দা যেন কোন গল্প শুনছে এই রকম চোখ করে মাথার খোঁপাটা ঠিক করে নিতে লাগল। তার খোঁপার ভার এখনও কম নয়, ঘোরাফেরা কাজকর্ম করতে করতে প্রায়ই আলগা হয়ে ঘাড়ের দিকে ঝুলে যায়, অন্তত ঝুলে যাচ্ছে মনে হলেই অস্বস্তি হয়। তখন আবার খোঁপা তুলে চুলের কাঁটাগুলো ঠিক করে গুঁজে নিতে হয়। এই চুল নিয়ে এখন মাঝে মাঝে বিরক্ত হলেও নন্দা জানে, বিয়ের সময় তার মাথার চুল দেখেই শ্বশুরবাড়ির লোক কনে পছন্দ করে ফেলেছিল। সত্যি, এমন ঘন, কালো, পিঠ-ছড়ানো চুল আজকাল মেয়েদের খুব কমই দেখা যায়। সেই চুল এখন আর অতটা সুন্দর নেই। কেমন করেই বা থাকবে! বিয়ের সময় নন্দা যেমন ছিল এখন কি তেমন আছে? বিয়ের সময় নন্দার গড়ন ছিল ছিপছিপে, একটু গোল অথচ পাতলা ধরনের মুখ ছিল, গায়ের রঙ ছিল পরিষ্কার। অল্প বয়েসেই বিয়ে হয়েছিল তার, একুশ বছরে পা দিয়েই। আর এখন পঁয়ত্রিশ বছরও বয়েস হল না—শরীরটা কী ভারী হয়ে গেল! গা ভারী হতে শুরু হয়েছিল বাচ্চাকাচ্চা হবার পর থেকেই। ছেলেটা প্রথম, বিয়ের বছর দেড়েকের মধ্যেই বুলু হল, তার তিন বছরের মধ্যেই মণি। মণি হবার পর শরীরটা সামান্য হালকা হয়েছিল, কিন্তু সেই হালকা ভাবটা থাকল না, আবার ভারী হয়ে উঠতে লাগল। নন্দার ধারণা ওই ট্যাবলেট খেয়ে খেয়ে এই রকম হয়েছে। বেশী বাচ্চাকাচ্চা ভাল নয়, আবার কখন কি হয়ে পড়ে এই ভেবে মণি হবার পর থেকে নন্দা ট্যাবলেট খাচ্ছে। ডাক্তারের কথামতন। এক নাগাড়ে মাস তিনেক খায়, এক মাস বাদ দেয়, আবার খায়। এই ভাবেই চলে যাচ্ছে। নন্দার তো দৃঢ় বিশ্বাস ওই ট্যাবলেট তার শরীরকে এরকম ভারি করে তুলেছে। মুখ, হাত, বুক, পেট, উরু সব জায়গাতেই মাংস আর চর্বি লেগেছে গাদা গাদা। স্বামীকে এসব কথা বললে তিনি তো কোন কানই দেন না, বলেন: ‘তুমি আর ডাক্তারী ফলিয়ো না। আসলে আরও দু-চারটে তোমার নাকে কানে না ঝুললে মন ভরছে না।’…

এসব কথা শুনলে কার না রাগ হয়! নন্দাও রেগে যেত। বলত, 'হ্যাঁ, শখ আমার বইকি। যাকে বাচ্চাকাচ্চার ঝক্কি বইতে হয় সে বোঝে, তোমাদের আর কি, পুরুষমানুষ, নিজের সুখটাই বোঝ।'

রথীন চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল। সিগারেট খেল চুপচাপ। তারপর গলা আরও নামিয়ে বলল, "আমি ন' হাজার দর দিয়েছি। যার জমি সে এখন একটা ঝামেলায় পড়েছে। ন'য়ে না দিলেও সাড়ে নয় দশে দিতে পারে।"

নন্দা বলল, "কত টাকা লাগবে?"

"তা হাজার বিশ-বাইশ।"

টাকার অঙ্ক শুনে নন্দা যেন বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকল। টাকাপয়সার ব্যাপারে স্বামী কি করে কি রাখে সে ভাল করে কিছুই জানে না, স্বামীও জানায় না। তবু তার মনে হল, এত টাকা নিশ্চয় কোথাও জমানো নেই তাদের।

নন্দা বলল, "অ-নেক টাকা!"

"হ্যাঁ, তা মন্দ কি?"

"কোথায় পাবে?"

রথীন কথার জবাব দিল না। নন্দাকে দু'চার পলক এমন ভাবে দেখল যেন স্ত্রীর বুদ্ধি কিংবা সাংসারিক জ্ঞান পরীক্ষা করছে। কোন আচম্‌কা খবর জানানোর মতন রথীনের চোখ একটু চকচক করে উঠল। চাপা গলায় বলল, "টাকা হয়ে যাবে।"

নন্দা ঠিক বুঝতে পারল না।

রথীনও পুরোপুরি ভাঙল না। বলল, "ব্যাঙ্ক, অফিস, লোন এসব বাদ দিয়েও হাজার ছয়-সাত লাগবে। তোমার গয়নাগাঁটি..." রথীন এবার যেন একটু হাসার চেষ্টা করল।

"গয়না বেচবে?"

"বুঝতে পারছি না। দেখি কি দাঁড়ায়।"

নন্দা কিছু না বললেও গয়না বেচার কথায় খুশী হল না।

রথীন স্ত্রীর মুখ দেখে সবই বুঝতে পারছিল। বলল, "তুমি সংসারের

কিছু বোঝ না। একেবারে নিরেট। আজ ক'বছর ধরে তোমায় দু'শো পাঁচশো করে খেপে খেপে যে টাকা দিয়েছি—দিয়ে বলেছি সোনাদানা করিয়ে রাখ, সেটা কি এমনি এমনি? কাজে লাগবে বলেই করাতে বলেছিলাম। ওসব টাকা ব্যাঙ্কে রাখা যায় না···বুঝলে না?"

নন্দা একেবারে বোকা নয়, খানিকটা বুঝল। বলল, "তুমি তো বলতে মেয়ের বিয়ের জন্যে ধীরেসুস্থে করে রাখতে···।"

"কি বলেছি সে-সব কথা ছাড়। মুখে এসেছে বলেছি। তোমার মেয়ের বিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে না। তার অনেক দেরি আছে। আমি মরে যাচ্ছি না।"

নন্দা কোন জবাব দিল না।

সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দেবার জন্যে হাতের কাছে কিছু না পেয়ে চায়ের কাপেই ফেলে দিল রথীন। মুখ তুলে বলল, "তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, গয়না বেচার কথায় বুক ফেটে যাচ্ছে তোমার।··· অত বুক ফাটার কিছু নেই। তোমার বাপের বাড়ি থেকে যা দিয়েছিলেন তার এক আনা সোনাও তোমায় বেচতে হবে না। আমি যা করিয়ে দিয়েছি তার কিছু দিলেই চলবে।"

নন্দা বলতে যাচ্ছিল, আহা কতই না দিয়েছ যে বলছ। কথাটা জিভ পর্যন্ত এসে আটকে গেল।

রথীন বলল, "এটা কি মাস, মানে বাংলা মাস?"

"অগ্রাণ পড়ল।"

"আমার ইচ্ছে ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি একটা কিছু করে ফেলা।"

নন্দা কি যেন ভাবছিল, বলল, "বাবাকে তুমি জমি কেনার কথা বলেছ?"

রথীন স্ত্রীর দিকে তাকাল, এমন ভাবে তাকাল যেন বুঝতে পারল না—নন্দা এ-রকম একটা কথা বলে কি করে? মাথা নাড়ল রথীন, "মাথা খারাপ! বাবাকে বলব— ?"

"বলবে না?"

"না। কাউকেই বলব না। দয়া করে তুমিও বলো না। মেয়েমানুষের পেট··· ।"

"কিন্তু না বলে·· "

"কোন দরকার নেই বলে। বললে বাবা কষ্ট পাবে মনে ; মানে পেতে পারে। ··বুড়োদের মন জিনিসটা বড় খুঁতখুঁতে। যদি শোনে আমি জমি কিনছি, ঠিক ভাববে—এই সংসার ভেঙে গেল, ছেলেরা সব আলাদা হয়ে গেল। বাবা শক্‌ড্‌ হবে।"

নন্দা শাড়ির আলগা আঁচল কাঁধে রাখল। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে এখনও বেশ রহস্যময় মনে হচ্ছে। নিজেদের আলাদা জমি আলাদা বাড়ি এ-কথা ভাবতে কার না ভাল লাগে! কিন্তু এই বাড়ি —এর কি হবে?

নন্দা বলল, "এখানকার কি হবে?"

"এখানকার মানে? এই বাড়ির কথা বলছ? ··সে সব আমি ভেবেছি। এই বাড়ির ভবিষ্যৎটা দেখেছ? এই তো সেকেলে বাড়ি, গোনাগুনতি পাঁচ-ছ'টা ঘর। এখন কোন রকমে চলে যাচ্ছে—এর পর চলবে না। তোমার মেজো দেওর ছোট দেওরের বিয়ে হবে, তাদের বাচ্চাকাচ্চা হবে—তখন এই রাবণের গুষ্টি থাকবে কোথায়? এ যা বাড়ি—একটা ঘর বাড়াবার মতন জায়গা নেই, তো অন্য কথা। এ-বাড়িতে থাকা অসম্ভব।"

"তুমি তো ভবিষ্যতের কথা বলছ?"

"বলছিই তো। এখন থেকে ভবিষ্যতের ভাবনা না ভাবলে পিঁড়ি পেতে বসে থাকতে হবে, বুঝলে নন্দরাণী", রথীন স্ত্রীকে ঠাট্টা করে বলল, "কাল কি হবে সেটা আজই ভেবে রাখা ভাল। আমি সেটাই ভাবছি।"

নন্দা চুপচাপ। হঠাৎ হাতের চুড়ি ক'গাছা অন্যমনস্ক ভাবে নাড়তে লাগল। নীচে বোধ হয় কাজল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নন্দাকে কিছু বলছে। রান্নাঘরে এখনও কাজ পড়ে আছে নন্দার।

রথীনই কথা বলল, "জমি আজ কিনছি বলে আজই বাড়ি করছি

না। বছর ছ-সাতের মধ্যে ওদিকে হাত দিতে পারব না। আমি ভেবে দেখেছি, এর মধ্যে কি কি হতে পারে ··” বলে রথীন গলার স্বর আরও নীচু করল, স্ত্রীর দিকে ঝুঁকে পড়ল সামান্য, “বাবার আর বেশী দিন নেই। ডাক্তার যেরকম বললো-টললো তাতে আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ভগবানের হাতে। হুট্ করে একটা কিছু হয়ে যেতে পারে—আবার ছ-সাত মাস বছরখানেক টিকে যেতেও পারে। কোন ডাক্তার সোজা কিছু বলে না। মুখ দেখলেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। বাবা এখন একটু-আধটু ভাল থাকার কথা বলবে। ওটা সাইকোলজিক্যাল। ওষুধের গুণও হতে পারে। তবে সবই টেমপোরারি। ক্যানসার সারে না। এ দেশে তো নয়ই।···বাবা বেঁচে থাকতে কিছু করছি না, অকারণ বুড়ো মানুষকে কষ্ট দেওয়া।”

নন্দা বুকের কাছে কেমন অস্বস্তি অনুভব করল। চাপা-চাপা লাগছে। বলতে নেই, সে নীচের জামার মাপ এই বছরেই দু’বার পালটেছে। এখন ছত্রিশেও কুলোয় না, সাঁইত্রিশে যেতে হয়। কিনতে হয় আটত্রিশ। আজকাল নীচের জামার কাপড়, ইলাস্টিক সব এত খারাপ যে জলে পড়তে পড়তে গুটিয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। আঁচলের তলায় হাত ঢুকিয়ে নন্দা ব্লাউজের সেফটিপিন খুলে ওপরের জামাটা আলগা করতে লাগল।

রথীন বলল, “এই বাড়িতে আমাদের সমান অংশ। বাড়ি মান্ধাতা আমলের হলে কি হবে—পজিসন আমহার্স্ট স্ট্রীটের ওপরই বলতে পার। শুধু জমির ভ্যালুয়েশনই কত হবে জান?···আমি আমার অংশ বেচে দেব।”

“বেচে দেবে?”

“না তো কি এই বাড়ি আমি মাথায় নিয়ে বসে থাকব। তুমি একেবারে মুখ্যুটুখ্যুর মতন কথা বলো। তোমার শ্বশুরবাড়ির এই ইটকাট আমার ওপর চাপলে এর পেছনে বরাবর আমায় টাকা ঢেলে যেতে হবে। আর অন্য পাঁচজনে ভোগ করবে। কেন আমি আমার টাকা ঢালব?”

নন্দা স্বামীর মনের কথা বুঝতে পারছিল। না পারার কিছু নেই। বাস্তবিক এই বাড়ির তো ওই রকমই হাল হবে ভবিষ্যতে। তিন ভাই, তাদের বউ বাচ্ছা, সবাই চাইবে এ-বাড়িতে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকতে, অশান্তি বাড়বে, ঝগড়াঝাঁটি হবে, আর রথীন যেহেতু বড় ভাই তার মাথায় প্রথম থেকেই যত দায়-দুশ্চিন্তার ভার চাপবে।

নন্দা বলল, "বড় হবার জ্বালা যে কেমন তা বুঝি।"

রথীন বলল, "এখনও বোঝ নি। তোমার মেজো জা অন্তত আসুক। ছোট জা-র কথা বাদই দিচ্ছি। তখন বুঝবে।···যাক গে—এ-বাড়ির হাল তোমার সেই পিসতুতো ভাইদের মতন হবে। ভাগের মা গঙ্গা পায় না—সেই অবস্থা। তখন এই বাড়ি বেচে দিতে হবে, দিয়ে যার যা পাওনা নিয়ে সরে পড়তে চাইবে সকলে। এটা একেবারে ঘরে ঘরে হয়। আমি প্ল্যান করে রেখেছি, এ বাড়ি বেচে দেবার পর যে টাকা পাব—সেটা আমি আমার নতুন বাড়িতে খরচা করব।" বলে রথীন দু'মুহূর্ত ভাবল, তারপর বলল, "এই পজিসনে বাড়ি, কলকাতার একেবারে মাঝখানে, দামটা কম উঠবে না। সেদিন একজন এস্টিমেটারকে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, যা বলল তাতে চমকে গেলাম···!"

নন্দা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেমন মমতার চোখে বলল, "এই জায়গাটা কিন্তু ভালই ছিল; কলকাতার মধ্যে···"

রথীন যেন চটে উঠে বলল, "আর কলকাতা কলকাতা করো না। ঘরে বসে আছ, রান্নাঘর শোবার ঘর ছাড়া কিছুই তো বোঝ না। মাঝে মাঝে রিকশা ঠেঙিয়ে বাপের বাড়ি। আমাদের মতন ছোটাছুটি করতে হত তো বুঝতে।···কলকাতা, স্পেশ্যালি এই সব লোকালিটিতে কোনো ভদ্রলোক থাকতে পারে না। রাজ্যের নোংরা, ভিড়, ঘিঞ্জি, যত গুণ্ডা বদমাশ ছেলের রাজত্ব। পাড়ায় একটা ভদ্র অ্যাটমস্‌ফেয়ার দেখতে পাও? রোজই গুণ্ডামি, বদমাইসি, পুজোর প্যাণ্ডেল বেঁধে হইহই। কোনো সভ্যভব্য ব্যাপার এখানে নেই। এ-সব পাড়ায়

থাকলে ছেলেমেয়েকে আর মানুষ করতে হবে না। ওই লোফারদের দলে ভিড়ে যাবে। আমি আমার ছেলেমেয়েকে নষ্ট হতে দিতে পারি না।···মনে রেখো তোমার মেয়ে দেখতে দেখতে বড় হবে। ছেলে তো আছেই।"

রথীন রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, তার চোখ বিরক্তিতে ঘৃণায় কেমন যেন তীক্ষ্ণ দেখাচ্ছিল।

নন্দা চুপ করে থাকল। তার বলার কিছু নেই। এই পাড়ার কতটুকু আর সে জানে! যতটুকু কানে আসে তাতে স্বামীর কথায় সায় দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। রথীন হয়ত রাগের মাথায় বেশী বেশী বলছে, তবে যা বলছে তা মিথ্যে নয়। ছেলেমেয়ে নিয়ে তারও দুশ্চিন্তা কম নয়।

নন্দা এবার উঠল। এখন আর বসে থাকার উপায় নেই। রাত্রে কথা হবে।

বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে নন্দা বলল, "আমি যাই"; বলে চায়ের কাপ উঠিয়ে নিল নীচু হয়ে।

নন্দা চলে যাবার পর রথীন আবার ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে পড়ল। বেশ ক্লান্ত লাগছিল। অফিসের ঝামেলা মিটিয়ে মুখার্জির সঙ্গে লেক টাউন যাওয়া, সেখানে ঘণ্টা দুই কাটিয়ে আবার বাড়ি ফিরে আসা—কম ছোটাছুটি হল না। যাবার সময় একটা ট্যাক্সি ধরা গিয়েছিল—নয়ত আরও কাহিল হয়ে পড়তে হত।

আলস্যের হাই তুলল রথীন। চোখ বন্ধ করল না। লেক টাউনের বাড়িঘর রাস্তা, শীতের কুয়াশা জড়ানো আলো, সেই ঠাণ্ডার ভাব, মুখার্জির বাড়ির ঝকঝকে চেহারা, মুখার্জির স্ত্রীর শ্যামলা অথচ ছিপছিপে চেহারা, এমন কি মহিলার পরনের শাড়িটা পর্যন্ত যেন রথীনের চোখের তলায় কোথাও ভাসতে লাগল।

মুখার্জি সুখে আছে। ভেরী হ্যাপি ম্যান। তার কোন দায়দায়িত্ব নেই। সংসারে সে আর তার স্ত্রী, একটি ছেলে। মা নেই, বাবা নেই। মুখার্জিকে বাপের ক্যানসার নিয়ে ভাবতে হয় না, মেয়ে বড়

হলে কেমন করে বিয়ে-থা দেবে সে চিন্তা করতে হয় না, ছোট ভাই বোন নিয়ে তার মাথা ঘামাবার দরকার করে না। কাজেই সে দিব্যি আছে, তার বউ নিয়ে মজায় দিন কাটাচ্ছে। আর রথীনের ব্যাপারটা ভেবে দেখ, চারদিক থেকে যেন বেঁধে রাখা। বুড়ো বাপ, তার ক্যানসার। ছোট দুটো ভাই—তার মধ্যে একজন যেহেতু বিয়ে-থা করেন নি এখনও, বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেন—তিনি ভেবে নিয়েছেন সংসারের ব্যাপারে তাঁর কোনো দায়িত্ব নেই। গায়ে ফুঁ দিয়ে, ভারী ভারী কেতাব আর কাগজপত্র উলটে তিনি জীবন কাটিয়ে দেবেন। মেজো ভাই—মহীনকে রথীন পারতপক্ষে কিছু বলে না। বলে না কারণ মহীনের হাবভাব সে পছন্দ করে না। এমন একটা তাচ্ছিল্যের ভান আছে তার, এমন অহমিকা, নিস্পৃহ থাকার চেষ্টা যে রথীন এই ধরনের মগজওলা মানুষদের সহ্য করতে পারে না। লেখাপড়ায় রথীনই কি খুব খারাপ ছিল, যে তুমি তার চেয়ে উনিশ-বিশ ভাল হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছ? ও-রকম কলকাতার প্রাইভেট কলেজের অনেক লেকচারার রথীন দেখেছে। বোগাস্…।

কিন্তু মহীনই একমাত্র সমস্যা নয়। সতীন আছে। ছোট ভাই। ওটা একেবারে ওআর্থলেস। ওর কিছু হবে না। লেখাপড়া যা করেছে সে তো বোঝাই যায়, এই পাড়ার স্কুল-কলেজে পড়ে পড়ে—এখানকার যত বকাটে, বাজে ধরনের, লোফারদের সঙ্গে মিশে সতুর সর্বনাশ হয়ে গেছে। সারাদিন আড্ডা, চায়ের দোকান, রাস্তায় ঝাঁকড়াচুলো ছোঁড়াদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফোঁকা আর খিস্তি-খেউড় করা ছাড়া কিছু শিখল না। ওই ছেলে এ-বাড়ির মানসম্মান ডুবোবে। এমন অপদার্থ কেমন করে তাদের পরিবারে এল কে জানে! মানুষ চেষ্টা করলে পারে না এমন কথা আছে না কি? সতুর কোন চেষ্টাই নেই।

আর একটা দায় কাজল। ছোট বোনের বিয়েটা বাবা বেঁচে থাকতে থাকতে দিয়ে দিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু কে দেয়? কোথায় ছেলে? কে খোঁজ আনবে, কথা বলবে? মহীনের কোন

গরজ নেই। সতুর কথা বাদ দাও, তাহলে এক রথীনই থাকল। রথীন ছেলের খোঁজ করতে পারছে না—কারণ সে বুঝতে পারছে না—ছোট বোনের বিয়েতে খরচার ভারটা তার ঘাড়ে কতটা পড়বে। বাবা বেঁচে থাকতে থাকতে কাজলের বিয়ে হলে বাবা চাইত রথীনই ব্যাপারটা মিটিয়ে দিক। মানে রথীনের ঘাড়ে কোপটা বেশী পড়ত। বাবা বেঁচে না থাকলে রথীন অবশ্য অনেক কমে এবং বাঁচিয়ে সেটা করতে পারে। মহীনকে বলতে পারে, তুমি অর্ধেক দাও খরচার। বাবা বেঁচে থাকলে এসব হওয়া মুশকিল। বাবা নমো নমো করে কিছু করতে দেবে না।

বাস্তবিক এই সংসার একটা ভয়ংকর ব্যাপার। এখন যতটা সাদামাটা দেখাচ্ছে তা কিন্তু পাঁচ বছর পরে আর দেখাবে না। তখন বিশ্রী ব্যাপার হবে।

কি দরকার রথীনের অত ঝঞ্ঝাটে গিয়ে। তার আগে থাকতেই সে নিজের ব্যবস্থা করে নিতে চায়। আজকাল জগতে কেউ আর নিজের থাকে না, যে যার নিজের গুছিয়ে নেয়। রথীন তার নিজেরটা গুছিয়ে নেবে।

॥ ছয় ॥

মহীন রাত করে বাড়ি ফিরল। কোনো কোনো দিন আরও রাত হয়। দুপুরের কলেজ ছাড়াও রাত্রে তার একটা পার্ট-টাইম রয়েছে। সপ্তাহে তিন দিন। পার্ট-টাইমের জন্যে তাকে যাদবপুরে ছুটতে হয়। আজ অবশ্য পার্ট-টাইম ছিল না। দুপুরের কলেজও বুড়ি-ছোঁয়ার মতন হয়েছে। আসলে আজ কলেজের মাস্টারদের বিকেলে জমায়েত ছিল এসপ্লানেডে রাজভবনের সামনে। মহীন মিছিল-টিছিলে যাবার জন্যে মোটেই ব্যস্ত ছিল না, পারলে হয়ত কলেজ থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও চলে যেত, কোনো বন্ধুর অফিসে, কিংবা এসপ্লানেডের কফি হাউসে, বা চৌরঙ্গি পাড়ার কোনো সিনেমায়, কিন্তু সেটা সম্ভব হল না। হল না,

কারণ কলেজের এ-সব ব্যাপারে যারা মাতব্বর তারা মাস্টারদের চোখে চোখে রেখেছিল— পালাবার পথ রাখে নি। এ বয়সে কিছু কিছু লজ্জা সঙ্কোচ সকলেরই হয়, ছেলেমেয়েদের মতন মিছিলের নামে কেটে পড়া যায় না। কাজেই মহীন কলেজেই থেকে গেল। তা ছাড়া সে এখানে নতুন, সহকর্মীদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চায়, অকারণে তার সম্পর্কে কোনো মন্দ ধারণা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে গড়ে ওঠে—এটা সে চায় না।

কলেজে বার কয়েক চা খাওয়া হল, কেমিস্ট্রির রমানাথ কোথা থেকে সিঙাড়া, কচুরি আনাল তাও খাওয়া হল, ঘোষ নানা রকমের মুখরোচক খেউড়খিস্তি শোনাল ছোকরা মাস্টারদের আড্ডায়, তাও শোনা গেল। শেষে চারটে নাগাদ মিছিল বেরুলো কলেজ থেকে।

মহীন ছাত্রাবস্থায় বার দুয়েক মিছিলে হেঁটেছে। দায়ে পড়ে। আজও দায়ে পড়ে হাঁটা। হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে রাজ্যের মাস্টার মশাইদের সঙ্গে কলকাতার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় মজা লাগছিল। দু-তিনটে কলেজের মাস্টার মশাইদের মিছিল ত্রিবেণী সঙ্গমের মতন কলেজ স্কোয়ারের কাছে মিশে যাবার পর ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেল। মহীনের তখন কেমন 'খারাপই' লাগছিল। এটা কোনো ছেলেছোকরাদের মিছিল নয়, পলিটিক্যাল পার্টির শোভাযাত্রা নয়, দেশের জ্ঞানগম্যিঅলা লোকেরা চলেছে—কাজেই মিছিলের মধ্যেই একটা গাম্ভীর্য ও শৃঙ্খলা থাকা উচিত। সেটা থাকছিল হয়ত, কিন্তু তেমন কি থাকছিল? কেউ কেউ বেশ ছেলেমানুষি করছিল, হাসছিল, ফুটপাথের লোকদের সঙ্গে তামাশা করছিল। মেয়েদের কলেজের কিছু মহিলা মিছিলে যোগ দেবার পর মহীন দু-একবার ঘোষদাকে একটু বেশীরকম সক্রিয় হতে দেখল। আসলে মানুষ মানুষই— কলেজে স্কুলে পড়ায় বলে আলাদা জীব নয়। তবু লোকে তাদের আলাদা দেখতে চায়।

ধরো আজ যে কাণ্ড নৃপতিবাবু, সান্যালদা, যতিশঙ্কর করল সে কাণ্ড যদি কোনো ছাত্র বা তার বাবা কাকা দেখত— কি ভাবত!

মহীন নিজের ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল। চারপাশ একবার তাকিয়ে

দেখে নিল। জানলা খুলে দিল।

গায়ের জামা খুলে ফেলে মহীন চেয়ারে বসে পড়ল।

রাজভবনের সামনে মিছিল করে এসে সকলে জমতে জমতে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। তখন চারপাশ ঝাপসা হয়ে গেছে। একেবারে সামনের দিকে মিটিংয়ের উদ্যোগ হচ্ছে—কিন্তু ততক্ষণে দু-চারজন করে মাস্টার মশাইরা সরে পড়তে শুরু করেছে। কেউ বলছে, একটু চা খেয়ে আসি; কেউ বলছে—একবার গোলঘরটা ঘুরে আসি, কেউ বউয়ের ওষুধ কেনার নাম করে—কেউ বা সরাসরি সিনেমার কথা বলে পালাতে শুরু করল। ব্যাপারটা এই রকম যে—মিছিল করে আসতে বলেছিলে এসেছি, এবার যা করার লীডাররা করুক, আমরা আর নেই।

এ সময় সান্যালদা চোখের ইশারায় মহীনকে ডাকল। মহীন কাছে আসতেই সান্যালদা বলল, "তোমার কি সংগ্রামী হবার ইচ্ছে আছে?"

"মানে?"

"মানে এখন যে ভাষণ উপভাষণ চলবে, মেমোরাণ্ডাম দেওয়া হবে—ততক্ষণ তুমি থাকতে চাও এখানে? না কি চাও না?"

নৃপতিবাবু বললেন, "দূর মশায়, যত অকাম। অধ্যাপক বংশটারেই আমি ক্লীব কই। সাত কাহন কথা কয়, কামে ঘেঁটু।...চলেন, চলেন—।"

সান্যালদা বললে, "ওয়েস্টেজ অফ টাইম্। চলো, আমাদের সঙ্গে কেটে পড়।"

"কিন্তু এদিকে তো সব ফাঁকাই হয়ে আসছে—"

"ওতেই হবে। উৎসাহ দেখাবার লোকের অভাব হবে না। আমাদের সঙ্গে চলো—সন্ধ্যেটা ভাল কাটবে।"

যতিশঙ্কর সিগারেট কিনতে গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, "নৃপতি, তুই পকেটে কিছু রেখেছিস?"

নৃপতিবাবু বললেন, "রাখছি, রাখছি।"

"ভালো করে দেখ্। তোকে বিশ্বাস নেই। খাবার সময় কাছা খুলে খাস্—তারপর শালা পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে দিস।"

নৃপতিবাবু বালকের মতন হেসে বললেন, "ওরে দিইছি নাকি? আমার যে থাকে না রে, যতে!"

সান্যালদা বলল, "যতি, আজ একবার সেইটে ট্রাই করলে হয় না?"

"কোনটা?"

"সেই যে তুমি বলেছিলে, তালি বাজিয়ে খেতে হয়।"

যতিশঙ্কর বলল, "কেন হবে না। চলো। বিশ্বাস থাকলে ভাল হত, এই লাইনে সে পাকা। আমি তার পাল্লায় পড়ে শিখেছি। তবে দাদা, ওটা কি তোমায় স্যুট করবে।"

"লেট্ আস্ ট্রাই··· !"

ওরা তিনজনে মহীনকে টেনে নিয়ে কার্জন পার্কের দিকে চলে গেল। ট্রামগুমটি পেরিয়ে একেবারে দক্ষিণের দিকে। ততক্ষণে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। মহীন বুঝতে পারছিল না—এরা কোথায় যাচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিল মদ খেতে যাচ্ছে সব, পরে দেখল মদ নয়, অন্য কিছু।

একেবারে পার্কের শেষ দিকটায় এসে যতিশঙ্কর বেড়া টপকে ঢুকে পড়ল। সে কোথায় গেল, কি করল বোঝা যাচ্ছিল না।

অনেকক্ষণ পরে সান্যালদের ডাকল।

মাঠে বসে চারমিনার সিগারেটের তামাক অর্ধেকটা ফেলে দিয়ে যতিশঙ্কর কিসের গুঁড়ো ভরল। হাতে হাতে ধরিয়ে দিল। বলল, "এই শালা নৃপতি, জোরে জোরে টানবি না, মরে যাবি। বি কেয়ারফুল। দিস্ ইজ্ গাঁজা।"

মহীন মাত্র একটা টানই দিয়েছিল—তাতেই কাত। এমন জঘন্য জিনিস মানুষ খায় কি করে? সান্যালদা খুব সাহস করে টানছিল, খানিকটা পরেই সিগারেট ফেলে দিয়ে বলল, "যতি আমি আর নেই। উরে বাব্বা!" বলে সান্যালদা মাঠে শুয়ে পড়ার যোগাড়।

নৃপতিবাবু গুম মেরে গেলেন। যতিশঙ্কর একেবারে টং হয়ে বসে থাকল।

পার্ক থেকে উঠে যাবার অবস্থা বোধ হয় যতিশঙ্করের ছিল না।

ইচ্ছেও নয়। ঘণ্টাখানেকের বেশী পার্কে বসে থেকে তবে ওরা উঠল। মহীন গুমটির কাছে এসে যতিশঙ্কর আর নৃপতিবাবুর চোখ দেখল। স্বাভাবিক বলে মনে হল না।

তখন মিটিং ভেঙে গেছে। ট্রামে সমান ভিড়। সান্যালদা অস্বস্তি বোধ করছিল। যতিশঙ্কররা অন্যদিকে চলে গেল।

মহীনই সান্যালদাকে বলল, "চলুন, কে সি দাশে গিয়ে মুখটুখে জল দিয়ে একটু চা খাবেন, তারপর বাড়ি ফিরব।"

কে সি দাশের দোকানে ঘাড়ে মুখে জল দিয়ে, জিরিয়ে, চা খেয়ে সান্যালদা মোটামুটি ধাতস্থ হল ; বলল, "যতির পাল্লায় আর পড়ছি না, মরে যাচ্ছিলাম বাবা!"

সান্যালদাকে ট্রামে তুলে দিয়ে মহীন বারো নম্বর ধরল। ট্রামে আসতে আসতে মহীনের মনে হচ্ছিল, ব্যাপারটাকে কিভাবে দেখা যায়? নিতান্তই রগড়? কয়েকজন মাস্টার মিলে কার্জন পার্কের গাছতলায় অন্ধকারে বসে গাঁজা খাচ্ছে—এটাকে রগড় বলে ধরে নেওয়া চলে। আবার অন্য ভাবে দেখলে, রগড় মনে করার কোনো কারণ নেই। যতিশঙ্কর, সবাই জানে, পাকা নেশাখোর, মদ্যটদ্য সে একরকম নিয়মিত খায়। নেশার ঘোরে গোলমাল, হল্লা করায় তার সুনাম রয়েছে। নৃপতিবাবু সুযোগ-সুবিধে বুঝে মদ খেতে যান, এবং মদ খেয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সান্যালদাকে নেশাখোর বলা যায় না, কখনো-সখনো বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়ে অল্পস্বল্প খান। তাঁর কাছে ব্যাপারটা শুধুই আড্ডা-ইয়ার্কির মতন, অর্থাৎ নিত্যদিনের একঘেয়েমির মধ্যে কখনো-সখনো একটু পরিবর্তন, ফুর্তি। সান্যালদার স্বভাবের সঙ্গে মেলালে এটা বিসদৃশ মনে হয় না। যেমন উনি বছরে দু-তিনটে দিন ফুটবল মাঠে বড় খেলা দেখতে যান, টেস্ট ক্রিকেট কিংবা দলীপ ট্রফির খেলাও এক আধ দিন দেখা চাই, সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবের আড্ডায় আড্ডা মারতে প্রায়ই যান, বছরে দু-একটা লেখাও নিজে লেখেন। ছাপাও হয় কাগজে। মহীন সান্যালদাকে যতটা দেখেছে তাতে এই মানুষটিকে সে অবজ্ঞা করতে পারে না। কলেজের সিনিয়ার

লেকচারার, অল্প বয়েস থেকেই কাজ করছেন, ইংরিজী ডিপার্টমেণ্টে তাঁর সুনাম রয়েছে, ছেলেমেয়েরা ওঁকে পছন্দ করে, শান্ত স্বভাব, যদিও পড়ানো সম্পর্কে মুখে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন তবু পড়ানোর সময় তাঁর আন্তরিকতা বোঝা যায়।

মহীন আজকের ব্যাপারটাকে পুরোপুরি রগড় বলে মনে করতে পারছে না। সান্যালদার পক্ষে হয়ত রগড়—কিন্তু যতিশঙ্করের পক্ষে নয়। কি যেন—কিসের একটা টান যেন তাদেরও টানছে, সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকেই যেমন টেনে নিচ্ছে। এই টানটা কি? যদি বলা যায় নেশা, উচ্ছৃঙ্খলতা—তবে তা ভুল হবে। অন্য কিছু হয়ত। হয়ত কোনো অবজ্ঞা, আক্রোশ, উপেক্ষা কাজ করে যাচ্ছে। কে তোমায় বলেছে, আমি মাস্টারী করি বলে আমি স্বাধীন ভাবে নিজের মর্জিমতন কাজ করতে পারব না? কেন আমি মদ খাব না? কেন আমি রেসের মাঠে যাব না, রমণীসঙ্গ করব না? পেশাগত ন্যায়-বোধ বা নীতি-বোধ যদি আমাদের অন্য কারও না থাকে, আমারও নেই; যদি অন্যদের থেকে থাকে বলে মনে করো তবে সেটুকু আমাদেরও আছে। অন্তত তোমাদের কারও চেয়ে কম নেই।

মহীন নিজে ব্যাপারটা এখনও ভাল করে বুঝে উঠতে পারে নি। তর্ক তুললে অবশ্য অনেক কথা বলা যায়, আবার যায়ও না।

কাজল ঘরে এসে ডাকল, "মেজদা—।"

মহীন তাকাল। দরজার দিকে কাজল দাঁড়িয়ে আছে।

"তুমি হাতমুখ ধুয়ে নাও, বউদি খাবার বাড়ছে।"

মহীন সামান্য বিরক্তির গলায় বলল, "কটা বেজেছে?"

"দশটা বাজে।"

"তুই যা, উঠছি।"

কাজল বলল, "তোমার দুটো চিঠি এসেছে। টেবিলে রেখে দিয়েছি।"

মহীন একবার টেবিলের দিকে তাকাল।

কাজল চলে গেল।

আরও খানিকটা পরে মহীন বাথরুম থেকে ফিরে এসে মুখ মুছতে মুছতে চিঠি দুটো দেখল। একটা চিঠি লাইফ ইনসিওরেন্সের। প্রিমিয়াম নোটিশ। অন্য চিঠিটা, হাতের লেখা থেকেই মহীন চিনতে পারল সুলেখার। সুলেখার চিঠি পড়ার প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও মহীন চিঠিটা শুধু হাতে করে তুলে দেখল। খাওয়াদাওয়া সেরে এসে পড়া যাবে।

খাবার ঘরে এসে মহীন দেখল, সতীনের খাওয়া প্রায় শেষ, কাজল খাচ্ছে, বউদি দাঁড়িয়ে।

মহীন নন্দার দিকে তাকাল। "দাদার খাওয়া হয়ে গেছে ?"

মাথা হেলাল নন্দা। "অনেকক্ষণ।"

মহীন বসতে বসতে বলল, "বাবার খবর কি আজ ?"

"ভালই তো রয়েছেন।"

খাবার ঘরটা ছোট। ভেতরদিকে একটা মাত্র জানলা। সংসারের বাড়তি কিছু জিনিস এই ঘরে ঢোকানো আছে। আলো-বাতাস ঢোকে না বলে ঘরটা বরাবরই স্যাঁতসেঁতে, নোনা-ধরা গন্ধ ওঠে সর্বক্ষণ। শীত-কালে বড় কনকন করে। এককালে এই ঘরে আসন পেতে খাওয়া হত, এখন বউদি টেবিল চেয়ার আমদানি করেছে, প্ল্যাস্টিকের রঙচঙে টুকরো টেবিলের ওপর বিছানো।

খেতে খেতে মহীন বলল, "সতু, তোদের এক বন্ধু— নাম জানি না—' রাস্তার মধ্যে অত চেল্লাচ্ছে কেন রে। আসবার সময় দেখলুম মাঝ-রাস্তায় দাঁড়িয়ে গলা ফাটাচ্ছে।"

সতীন ঠিক বুঝতে পারল না কোন্ বন্ধুর কথা বলছে মেজদা। যার কথাই বলুক, তার চেল্লাবার সঙ্গে যেন সতীনের একটা সম্পর্ক রয়েছে— এ-রকম ওর মনে হল।

সতীন বলল, "আমি জানি না।"

মহীন বলল, "ছোকরা কি মাতলামি করে নাকি ?"

সতীন অস্বস্তি বোধ করে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করতে লাগল।

নন্দা বলল, "পাড়াটা এখন ওই রকমই হয়েছে। বকাটে বাঁদর

ছেলেদের আড্ডা। গোল্লায় গেছে সব।"

সতীন বুঝতে পারল, বউদির কথার মধ্যে ঠেস রয়েছে, তাকে ঠেস দিয়েই বলল বউদি। বলবেই তো, বউদি খুব উঁচুদরের ভদ্রলোক—নিজের ছেলেমেয়েদের সাহেবী স্কুলে পড়ায়, সহবত শেখায়, পাড়ার টাবলু, বিশু, পল্টুদের বাজে ধরনের শিক্ষাদীক্ষার ছোঁয়াচ লাগাতে দেয় না। প্রচণ্ড রাগ হলেও সতীন কোনো কথা বলল না।

মহীন নন্দার দিকে তাকিয়েই বলল, "সবই গোল্লায় যাচ্ছে— সবাই ; পাড়ার আর দোষ কি!" বলবার সময় মহীন আজকের মিছিল এবং কার্জন পার্কে তাদের গাঁজা খাবার কথা ভাবছিল।

নন্দা ভেতরে ভেতরে আজ সন্ধ্যের পর থেকেই চাপা একটা উত্তেজনা বোধ করতে শুরু করেছে। লেক টাউনের বাড়ি, তার অতি-অস্পষ্ট একটা ছিমছাম ছবি, নিজের সংসার, কর্তৃত্ব—যেন সেই সন্ধ্যের পর থেকেই তাকে উন্মনা ও কাতর করে তুলছে। নন্দা কিছু দেখুক আর না দেখুক, স্বামীর মুখ থেকে জমি কেনা আর বাড়ি করার কথা শোনা পর্যন্ত—যত সময় যাচ্ছে—ততই যেন কোনো অধিকার বোধ করতে শুরু করেছে।

বোধ হয় এই চাপা উত্তেজনার জন্যেই নন্দা বলল, "এই পাড়াটায় আর থাকা যায় না। দিন দিন এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তেমনি নোংরা, ভিড়।"

মহীন মুখ তুলে ঠাট্টা করে বলল, "তুমি দাদাকে বলো না বেল-ভেডিয়ারের দিকে একটা বাড়িফাড়ি করতে।"

নন্দা বেলভেডিয়ার চেনে না। বাড়ি করার কথায় সে সতর্ক হয়ে গেল। বেফস্‌কা একটা কথা মুখ থেকে বেরিয়ে গেলেই মুশকিল। নন্দা নিজেকে সাবধান করে নিল, বলল, "আমার বলতে বয়ে গেছে। তোমাদের ইচ্ছে হয় বল গে যাও।"

মহীন আবার ঠাট্টা করে বলল, "তুমি বললে তার আলাদা দাম - তোমার কথার খাতির আর আমাদের বলা কি এক হল ?"

"যাও যাও, রগড় করতে হবে না। তোমাদের দাদাকে তোমরা

চেনো না—আমি চিনি। আমি তো পরের বাড়ির মেয়ে। খাটবো খুটবো পড়ে থাকব—বাড়িঘর তোমাদের, আমার কি।"

"তোমার এরকম মা-সারদা ভাব কেন বউদি? বাড়ির বউরাই তো কর্তাদের চালায় শুনেছি", মহীন হেসে হেসে বলল।

"আমি চালাই না। কাকে চালাব? ওই মানুষকে? অফিস ছাড়া আর কিছু বোঝে! আগে চব্বিশ ঘণ্টাই মাথায় অফিস ঘুরতো, এখন বাবার অসুখের পর দেখছি—বাবার ভাবনা।"

মহীন কথা বলল না, সামান্য মাথা নাড়ল, যেন বোঝাতে চাইল: তা ঠিকই বলেছ।

সতীন উঠে পড়ল।

কাজল একটু আগে মেজদার কথায় মুখ নীচু করে হাসছিল— এখনও সে হাসি পুরোপুরি মুছে যায় নি। মেজদা মাঝে মাঝে বউদিকে নিয়ে যা রগড় করে, হাসতে হাসতে মরে যেতে হয়।

মহীন একটু তাড়াতাড়ি খেতে শুরু করল। খেতে খেতে দু-চারটে ছোট, হাল্কা কথা বলল কাজলের সঙ্গে। নন্দা একবার বাইরে গেল রান্নাঘরের দিকে, ফিরে এল সামান্য পরে।

খাবার ব্যাপারে মহীন বরাবরই স্বল্পাহারী, মানে তার খিদেটা যেন মাপা, বয়েসের এবং স্বাস্থ্যের জন্যে যতটা প্রয়োজন মনে করা হয়— তার চেয়ে কমই খায়। তবু তার স্বাস্থ্য খারাপ নয়।

খাওয়া শেষ করে মহীন উঠল। কাজল বাসনপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠবে।

মুখ ধুয়ে ঘরে এসে একটা সিগারেট ধরাল মহীন। আরাম লাগছিল। সুলেখার চিঠির জন্যে আর ধৈর্য রাখা যাচ্ছিল না।

চিঠিটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে বিছানায় এসে বসল মহীন। খামের পাশ ছিঁড়ে চিঠি বার করল।

না, খুব বড় চিঠি নয়। একেবারে ছোটও বলা যায় না।

মহীন চিঠিটা পড়ল। বার দুয়েক।

সুলেখার কথা মনে এলেই মহীন যেন বিষণ্ণ, চিন্তিত, উদাস হয়ে

পড়ে। অথচ এই স্নুলেখাকে বছর দেড়েক আগেও মহীন চিনত না। চিনেছে মথুরামোহন কলেজে পড়াতে গিয়ে। মফস্বলের কলেজে যে সাত-আট মাস ছিল মহীন সেই সময়ের মধ্যে তার সব চেয়ে বড় অভিজ্ঞতা স্নুলেখা।

স্নুলেখা সেই মফস্বল কলেজে তার সহকর্মী ছিল। বাংলা পড়াত। স্নুলেখা বিবাহিতা। ধর্মে ক্রীশ্চান। মেরুদণ্ডের কি একটা রোগে তাকে অনেক দিন বাড়ি আর হাসপাতাল করতে হয়েছে। গায়ের রঙ কালচে। কিন্তু মুখশ্রী এবং গড়ন অপরূপ। স্নুলেখার স্বামী রাজনীতি করেন, বরাবরই নাকি তাই করে আসছেন, অন্য কোনো পেশা তাঁর নেই, স্ত্রীর উপার্জনে সংসার চলে। আর যৎসামান্য কিছু জমিজমা আছে। কৃষ্ণপদবাবু যে মানুষটি খারাপ তা নন, তবে মফস্বলের নোংরা রাজনীতিতে তিনি মাথা পর্যন্ত ডুবিয়ে এখন পুরোপুরি পলিটিক্যাল ম্যান হয়ে গেছেন, রাজনীতি ছাড়া তাঁর অন্য কোনো ব্যাপারে নজর নেই, গ্রাহ্য নেই। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কটিও পোশাকী। কোনো সন্দেহ নেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই ধরনের সম্পর্ক অস্বাভাবিক—তাতে কোনো লাভ কারও পক্ষে হয় না। স্নুলেখার জীবনে যে অশান্তি সারাক্ষণ তাকে জ্বালাচ্ছে মহীন সে-অশান্তির কথা জানে। স্নুলেখাই বলেছে।

মহীন যে কোনো কারণেই হোক স্নুলেখাকে বান্ধবী হিসেবে গ্রহণ করে নেবার পর ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহীন জানে, স্নুলেখা কি বোঝাতে চায়, কেন মাঝে মাঝে চিঠি লেখে, কেনই বা মহীন কলকাতায় চলে আসার সময় বলেছিল: "তোমরা যে কেন আস, আর কেনই বা চলে যাও জানি না।"

মেয়েদের ভালবাসার কোনো রহস্যই মহীন জানে না, আর এই যে স্নুলেখা—যে বিবাহিতা তার ভালবাসার রহস্যই বা সে কি করে বুঝবে?

তবু মহীনের দুঃখ হয়। স্নুলেখাকে ভাবতে তার ভালও লাগে। অথচ বুঝতে পারে না—এই ভাল লাগার কি মূল্য!

॥ সাত ॥

শুয়ে শুয়ে সতীন একটা সিনেমার কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছিল—পুরোনো কাগজ, কাজল ঘরে এল।

সতীন বলল, "খুকি, কাল খুব সকালে আমায় ডেকে দিতে পারবি?"

কাজল হাত-পা মুছে তার রাত্রের যৎসামান্য প্রসাধনের জন্য আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলল, "কত সকালে?"

"পাঁচ, সাড়ে পাঁচ?"

কাজল নিজেই একটু ঘুমকাতুরে। সকালে তার ঘুম ভাঙতে রোজই বেলা হয়ে যায়; যখন সে বিছানা ছেড়ে বাইরে আসে তখন বউদির সকালের কাপড়-ছাড়া শেষ, উনুনে আগুন উঠে যায়, চায়ের জল ফোটে কেটলিতে। কাজলের এই বেলা করে ঘুম থেকে ওঠা বউদি পছন্দও করে না। সরাসরি না হলেও ঘুরিয়ে দু-চার কথা বলে।

বলুক। কাজল কি করবে? বরাবরই তার এই রকম অভ্যাস। সাতসকালে উঠে সে করবেই বা কি!

কাজল বলল, "অত সকালে উঠে কি করবে?"

"এক জায়গায় যাব।"

কাজল শাড়ির আঁচলে মুখটা শুকিয়ে নিয়ে ক্রিম ঘষতে লাগল। "কোথায়?"

"কাঁচরাপাড়া।"

ব্যাপারটা কাজলের বোধগম্য হল না। কাঁচরাপাড়ায় তাদের কেউ থাকে না। হালিশহরের দিকে মা'র এক পিসতুতো বোন থাকত, দামিনীমাসি, মা বেঁচে থাকার সময় কখনও-সখনও আসত, বিশাল মোটাসোটা চেহারা। দামিনীমাসি বেঁচে আছে কি না কে জানে! আর আসে না।

কাজলের হঠাৎ একটা ব্যাপার খেয়াল হল। একেবারে আজ এই মুহূর্তেই যে খেয়াল হল তা নয়, আগেও হয়েছে, তবু আজ—

এখন বেশী করেই খেয়াল হল। মা মারা যাবার পর থেকে এ-বাড়িতে লোকজন আসা আস্তে আস্তে কেমন করে যেন কমে এল। এখন দিদিরা ছাড়া কেউ আসে না। মাঝে মাঝে বউদির বাপের বাড়ির লোক যারা আসে তারা বাড়িতে ঢুকেই সোজা দোতলায় বউদির ঘরে গিয়ে বসে, মিষ্টিটিষ্টি, চা খায়; যাবার সময় একবার বাবার ঘরে ঘুরে চলে যায়। কাজল-টাজলদের দেখতে পেলে একটু হেসে—'কি কেমন আছ, ভাল?' —এই করে চলে যায়। অথচ মা যখন বেঁচে ছিল—রোজই কেউ-না-কেউ আসত. মা'র ছেলেবেলার বন্ধু, মা'র বাপের বাড়ির কেউ-না-কেউ, বাবার অফিসের বন্ধুর স্ত্রী আর মেয়েরা। পাড়ার কত বুড়ীরা এসে দুপুরে গল্পটল্প করত, মা'র চেয়েও বয়েসে কেউ কেউ বড় ছিল।

এখন আর কেউ আসে না। এমন কি মা'র বাপের বাড়ির—মানে কাজলদের মামার বাড়ির নিজের আর কেউ না থাকলেও পশুপতি মামা ছিল। মা'র জ্যেঠতুতো ভাই। আসা-যাওয়া কম করত না। সেই পশুপতি মামাও আজকাল বছরে দু-একবার ভদ্রতা করে আসে। বাবাকে দেখতেই আসে, নয়ত আসত না।

এ রকম কেন হল? এ বাড়িতে যারা মা'র টানে আসত তারা কি মা নেই বলেই আসে না? নাকি বউদির ব্যবহারের জন্য? কেউ এল বা গেল—বউদির কোন গা নেই। বরং বাড়িতে হরদম লোকজন আসা পছন্দই করে না বউদি।

হাতেও সামান্য ক্রিম ঘষে নিয়ে কাজল দাদার দিকে মুখ ফেরাল। বলল, "কাঁচরাপাড়ায় কে আছে?"

"উমার সঙ্গে যাব। তার লোক আছে।"

"চাকরি?"

"দূ-র; চাকরি কেন! চাকরি-ফাকরি না।"

চাকরি নয় তা হলে যে দাদা কেন উমাদার সঙ্গে সাতসকালে কাঁচরাপাড়া ছুটবে কাজল বুঝতে পারল না।

বিছানাটা ঝেড়েঝুড়ে নিয়ে কাজল ঘরের দরজা বন্ধ করল। বলল,

"বাতি নেবাব ?"

সতীন কাগজটা হাত বাড়িয়ে একপাশে রেখে দিল। বলল, "নিবিয়ে দে। কম্পানীর ইলেকট্রিক বিল বাড়ছে।"

কাজল বাতি নিবিয়ে দিল। দাদা যে একটু ব্যঙ্গ করল সে বুঝতে পারল। কম্পানী মানে বড়দা বউদি ; বড়দা বউদি আর তার ছেলে-মেয়েদের ও কম্পানী বলে।

বিছানায় এসে বসে কাজল পা মুছল। চুলের বিনুনি পিঠ থেকে সরিয়ে বুকের কাছে টেনে নিল। তারপর শুয়ে পড়ল।

অন্ধকারে চুপচাপ শুয়ে থাকল সতীন। দেখতে দেখতে বেশ শীত পড়ে আসছে।

"খুকি ?" সতীন বলল আচমকা।

সাড়া দিল কাজল।

"কাঁচরাপাড়ায় একটা টি বি হাসপাতাল আছে, জানিস ?"

কাজলের হঠাৎ মনে হল, এ-রকম একটা কথা সে যেন শুনেছে।

সতীন বলল, "উমার বউদিকে নিয়ে একটু গোলমাল হচ্ছে। কাঁচরাপাড়ায় ওদের এক আত্মীয় থাকে, তাকে গিয়ে ধরতে হবে। সেই ভদ্রলোক যদি হাসপাতালে একটা ব্যবস্থা করতে পারে।"

উমাদার বউদিকে দেখেছে কাজল। ওকে নিয়ে পাড়ায় নানা রকম গল্প রয়েছে। একদল বলে, উমাদার দাদা যে বউকে ছেড়ে চলে গিয়েছে তার জন্য উমাদার বউদিই দায়ী। আবার কেউ কেউ বলে, উমাদার দাদা লোকটা অত্যন্ত পাজী ধরনের। বাড়ির বউ ছেড়ে চলে গিয়ে মধ্যমগ্রামে আর-একটা বউ নিয়ে ঘর করছে। যার সঙ্গে ঘর করছে সেও নাকি পরের বউ। কাজল দু তরফের গুজব শুনেছে, সঠিক কিছু জানে না। তবে এইমাত্র জানে যে উমাদার দাদা আর বাড়িতে থাকে না।

সতীন বলল, "আমাদের বউদিকে কিন্তু বাঘেও খেতে পারবে না, কি বলিস ?" কেমন একটা রূঢ় অথচ বিদ্রূপের গলায় সে কথাটা বলল।

কাজল বলল, "যাঃ!"

"যা কি রে! চেহারাটা কেমন করে ফেলেছে দেখেছিস? মিনিমাম আশি কে-জি। একেবারে গোল হয়ে গিয়েছে।"

কাজল হেসে ফেলে বলল, "বউদির কানে গেলে মজা বোঝাবে!"

"সে তো সারাদিনই বোঝাচ্ছে।···আজ কেমন বলল দেখলি, পাড়ার গুষ্টি উদ্ধার করে দিল। নোংরা পাড়া, বাজে পাড়া, বকাটে ছোঁড়াদের পাড়া, মাতাল ছোঁড়াদের পাড়া···। ব্যাপারটা বুঝে দেখ্; এই পাড়ায় এতদিন থেকে আজ আমাদের হার মেজেস্টির সব খারাপ লাগছে। · তখন যা মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ভাবলাম বলি, তোমার বাপের বাড়ির পাড়া কত লাট-বেলাটের পাড়া, মানুষ তো হয়েছ খাটালপাড়ায়—তার আবার বড় বড় কথা।"

কাজল দাদার রাগের কারণটা জানে। তার নিজেরও যে বউদির উপর প্রচণ্ড ভক্তি রয়েছে তাও না। অথচ বড়দার যখন বিয়ে হয় তখন কাজল কতটুকু। বউদি যখন বউ হয়ে এল কাজল তখন সারা দিন বউদির গায়ে লেপটে থাকত। পায়ে পায়ে ঘুরত। বউদিও তাকে কম আদর দেখাত না। এই আদর সে অনেক দিন পেয়েছে। মানুষের দোষ ধরলে ধরাই যায়, কিন্তু সেটা করা উচিত নয়। সব সময় কেন দোষ ধরব! ছেলেরা অনেক কিছু জানে না, বুঝতে পারে না। দাদা সারাদিনই বউদির খুঁত ধরছে। কি লাভ খুঁত ধরে! মা মারা যাবার পর থেকে বউদি বাড়ির গিন্নী হয়ে উঠেছে, তার ছেলেমেয়েরা দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠছে, এখন তো বউদি নিজেরটা বুঝতে শিখবেই। সব মেয়েই শেখে।

কাজল হেসে বলল, "মেজদা বউদিকে যা করল তখন!"

"ঠিক করেছে। মেজদাই ওকে টাইট্ করতে পারে। জোঁকের মুখে নুন।"

"যাঃ, তুমি আবার বড্ড বাড়াবাড়ি কর।"

"বাড়াবাড়ির কি দেখলি তুই! যা ফ্যাক্ট্, তাই বললাম।···তুই দেখবি, মেজদার সামনে কর্তা-গিন্নী কেমন চুপ করে থাকে। আমাদের

কাছেই যত তম্বি।”

কাজল যে এটা না দেখেছে এমন নয়। মেজদাকে কেন যেন কেমন খাতিরই করে দুজনে। মেজদা বেশ মিষ্টি মিষ্টি করে কথা বলতে পারে, ঠুকে ঠুকে। রাগ করলেও মুখে কিছু বলার থাকে না। সাহেবী স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়াবার ব্যবস্থা দেখে মেজদা একদিন দাদাকে এমন মজা করে ঠুকেছিল যে দাদার চোখ-মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল রাগে। কিছু বলতে পারে নি।

মেজদা লোকটাকে বাইরে দেখতে এক রকম, ভেতরে অন্য রকম। মা এটা বুঝত। মা'র সব চেয়ে আদরের ছেলে মেজদা। বাবার যা কিছু বড়দা। বড়দা বাবার চোখে যেন গোপালঠাকুর। বাবার ধারণা ছিল, বড়দার কোন দোষ নেই, খুঁত নেই, বড়দা যা করে তার চেয়ে ভাল কেউ করতে পারে না, বড়দাই সংসারের সব দায়দায়িত্ব বইতে পারে, আর কেউ পারে না।

বাবার এই একচোখোমি মা সহ্য করতে পারত না। নিজের ঘরে দুজনে মিলে যে কথা-কাটাকাটি হত কাজল তা শুনেছে।

বাবা আবার মেজদার ব্যাপারে খানিকটা পাশ কাটিয়ে থাকত। কারণ মা'র কাছে মেজদার ব্যাপারে কিছু বললে বাবার অবস্থা কাহিল হয়ে যেত। শুধু মেজদার কথা বললেই বা হবে কেন? কাজল কি মা'র কম সোহাগী মেয়ে ছিল? আর ছোড়দা?

ছোড়দার দিকে বাস্তবিক কেউ আলাদা করে নজর দেয় নি। আদরই পেয়েছে, অবজ্ঞা নয়, তবু ওকে যেন স্বতন্ত্র করে কেউ ধরে নি।

কাজল যখন এই সব কথা ভাবছে তখন সতীন যেন কিছু বলল। কাজল কথাটা খেয়াল না করায় চুপ করে থাকল।

সতীন অপেক্ষা করে আবার বলল, “কি রে?”

কাজল বলল, “কি বললে শুনতে পাই নি!”

“ঘুমোচ্ছিলি?”

“না।”

“তা হলে? স্বপ্ন দেখছিলি?”

"কি বললে তুমি ?"

"বললাম, ধর—আমি যদি ওই লাখখানেক টাকা পেয়ে যাই—কি করব ?"

"লাখখানেক টাকা ?" কাজল দাদার কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারল না।

"ওয়েস্ট বেঙ্গল লটারি। এক লাখ পঁচিশ হাজার।"

"ও !" কাজল হেসে ফেলল।

সতীন বলল, "হাসছিস ? নে হেসে নে—কালকের দিন পর্যন্ত হেসে নে। পরশু আর হাসতে হবে না। সোয়া লক্ষ টাকার মালিক···" সতীন নিজেই হাসতে লাগল।

কাজল বলল, "টিকিট কিনেছ বুঝি ?"

"কিনেছি। টাকা আমি দিই নি। উমা দিয়েছে।"

"হঠাৎ ?"

"কিছু না। এমনি। কলেজের সামনে একটা লোক টিকিট নিয়ে বসে আজকাল। ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। উমা বলল, কিনে ফেললাম।"

কাজল বলল, "বড়দা তো প্রতি মাসে চার-পাঁচটা করে কাটে।"

"বড়দার হবে না। লটারি-ফটারি গরীব লোকরা পায়। যেমন ধর্—আমি, আমি পেয়ে যেতে পারি।"

কাজল আবার হাসল শব্দ করে।

সতীন কাজলের হাসিটা হালকা মেজাজে শুনল। তারপর বলল, "আমি টাকা পেলে কি কি করব জানিস ?"

কাজল সমান কৌতুকের সঙ্গে বলল, "কি ?"

"প্রথমে ধর্, ব্যাঙ্কে গিয়ে দড়াম করে টাকাটা রেখে দেব।" সতীন এমন ভাবে বলল যেন লক্ষ টাকার বোঝা বাক্স করে বয়ে নিয়ে গিয়ে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত করে দেবে। "তারপর ফিফটি থাউজেণ্ড থাকবে একেবারে আমার পারসোন্যাল। ওটা আমার সিকিউরিটি। হাত দেব না। বাকি পঞ্চাশ হাজার দিয়ে বিজনেস করব। চাকরি-বাকরি

হবেও না, আর চাকরির জন্যে তেল মারাও আর পোষাবে না। বিজনেস করতে পারলে আত্মসম্মান আছে, বুঝলি খুকি। টাকাও আছে। একটা জোর ব্যবসা লাগিয়ে দেব।”

কাজল দাদার কথা শুনছিল আর মনে মনে হেসে মরছিল।

সতীন বলল, “বাকি কত থাকবে– ? হাজার পঁচিশ ? তোদের সব পাঁচ দশ হাজার করে দিয়ে দেব।” বলেই কি মনে হল সতীনের, সঙ্গে সঙ্গে গলা পাল্‌টে বলল, “আরে সাব্বাস! তোর বিয়ে ? তোর বিয়েটাই তো লাগিয়ে দিতে পারি রে! পঁচিশ হাজার তোর বিয়েতেই খরচ করে দেব। কোন জিনিসের অভাব রাখব না, সব দেব, গয়নাফয়না, শাড়ি, ফার্নিচার, ফ্রিজ্‌···এভরিথিং।” বলেই সতীন বেজায় জোরে হো হো করে হেসে উঠল। “তোর সেই আর্টিস্ট ছোঁড়াটাকে রাজা করে দেব, বুঝলি!”

কাজলও হেসে ফেলল। বলল, “গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল।”

সতীনও হেসে হেসে বলল, “এ-রকম গোঁফে তেল দেওয়া ভাল।··· মনটন খারাপ থাকলে লটারি-টটারি পাবার কথা ভাবলে একটু ভালই লাগে। লাগে না, বল ?”

“কি জানি!”

“আজকাল লটারির টিকিট কাটার হিড়িক দেখেছিস ? যেখানে যাবি সেখানে একটা করে দোকান। ফুটপাথেও কত দোকান। এত লোক টিকিট কাটছে কেন ? সকলেই এখন কপাল বিশ্বাস করছে। ভাবছে যদি কপালে লেগে যায়।”

কাজল এবার আর হাসল না।

একটু চুপ করে থেকে সতীন আবার বলল “আচ্ছা, শোন্— চাকরিবাকরি তো জুটছে না। হবে বলেও মনে হচ্ছে না। ধর, আমি যদি একটা লটারির টিকিট বিক্রীর দোকান করি পাড়ায় ?”

“পাড়ায় ?”

“হ্যাঁ। ধর, শঙ্খ ভাণ্ডারের গায়ে একটা ছোট্ট দোকান করলাম। দোকান না পাই বিকেলে শঙ্করের দোকানের পাশে টেবিল চেয়ার আর

টিকিট নিয়ে বসে থাকব।"

কাজল বলল, "টিকিট কিনতে টাকা লাগবে না?"

"তা লাগবে।"

"কোথায় পাবে?"

সতীন কোন জবাব দিতে পারল না। চুপ করে গেল।

কাজলও চুপচাপ। তার ঘুম পাচ্ছে না। তবু একবার হাই উঠল। ঘরের মধ্যে অন্ধকার গাঢ় হয়ে থাকলেও অনুমানে অনেক কিছু যেন চোখে পড়ে। কড়িকাঠ, জানলা, দাদার বিছানা। কাজল যখন জেগে থাকে তখন চোখ খুলে থাকে, চোখ বুজে শুয়ে থাকতে তার ভাল লাগে না।

হঠাৎ যেন কি মনে পড়ে গেল কাজলের। "দাদা?"

"বল্।"

"একটা খবর জান?"

"কি খবর?"

কাজল বলব কি বলব না ভেবে শেষে বলল, "গোপাদির বিয়ের কথা হচ্ছে।"

সতীন জানত না। অবাক হয়ে বলল, "না। কে বলল তোকে?"

"চনু বলছিল।"

"চনু মানে?"

"হেম ডাক্তারের মেয়ে।"

"ও, চন্দনা···। সে কি করে জানল?"

"পাশাপাশি বাড়ি তো। চনুদের এক মামা থাকে—ছাপাখানা আছে—তার সঙ্গে।"

"মামা? মামার আবার বিয়ে কি রে? দ্বিতীয় পক্ষ করছে—না তৃতীয় পক্ষ?"

"মামা হলেই কি সে বুড়ো হবে?"

"বুড়ো নয়? ছোকরা?"

"ওই রকম।"

"ও !"

কাজল আবার একটু চুপ করে থাকল। পরে বলল, "বিয়ে হবেই এমন কথা নয়। তবে গোপাদির মা নাকি চন্নুর মাকে খুব ধরেছে।"

সতীন কিছু বলল না। কি বলবে ? তার ভাল লাগল না খবরটা। আবার খবর শুনে একেবারে মনমরাও হল না। গোপার সঙ্গে সতীনের দেখাসাক্ষাৎও তো আজকাল হয় না। রাস্তায় হয়ত পরস্পরকে দেখে, এ ওর দিকে তাকায়, চেনা চোখে হাসি-হাসি ভাব করে, তারপর গোপা চোখ নামিয়ে নেয়, চলে যায়। সতীন একটু দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে।

মাঝে মাঝে সতীনের ইচ্ছে হয়, গোপাদের বাড়ি গিয়ে একবার তাদের খোঁজখবর নিয়ে আসে। আগে তো যেত। প্রায়ই যেত। এখন আর যায় না। যায় না, কারণ সতীনের বড় লজ্জা করে। গোপা এখন বয়েসে কত বড় হয়ে গেছে, সতীনের কাছাকাছি বয়স, মেয়ে-স্কুলে চাকরি জুটিয়েছে, তার হাবভাব পাড়ার মধ্যে এত সংযত যে সব সময়ই ছেলেছোকরাদের চোখ বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা রয়েছে বোঝাই যায়। সতীনের বন্ধুবান্ধবরা সকলেই এমন কিছু ভদ্র নয়, কখনও কখনও বেলেল্লাপনা করে ফেলে। খুব সম্ভব গোপা ওই ধরনের অস্বস্তিকর অবস্থা এড়াবার জন্যে রাস্তাঘাটে সতীনকে দেখলেও চেনার মতন মুখ করে—কিন্তু কথাবার্তা বলে না, চলে যায় মাথা নীচু করে।

সতীনের হঠাৎ মনে হল, শুধু গোপা কেন, সে নিজেও তো কত সময়ে গোপাকে দেখে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, যেন দেখে নি গোপাকে। কিংবা মাথা নামিয়ে মাটি দেখেছে। আশ্চর্য। খুবই আশ্চর্য। কেমন সব হয়ে যাচ্ছে, তাই নয় ? গোপা মাথা নামায়, সতীনও মাথা নামিয়ে নেয়। কেন ? আর কি তাদের পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকার, হাসার, কথা বলার যোগ্যতা নেই ? তারা কি কোন কারণে অপরাধী হয়ে গিয়েছে ?

সতীন বুঝতে পারল না, তার সমস্ত যোগ্যতাই কি এইভাবে হারিয়ে

যাচ্ছে ? কেন ? কেমন করে হারাচ্ছে ?

বুকের মধ্যে কেমন যেন কষ্ট হল সতীনের। কষ্টটা সে চুপচাপ অনুভব করতে লাগল।

॥ আট ॥

সতীনের উঠতে সামান্য দেরি হয়ে গিয়েছিল। কোনো রকমে চোখেমুখে জল দিয়েই জামা প্যান্ট পরে নিল। চা খাবার কোন উপায় নেই। সবেই উনুনে আঁচ দেওয়া হয়েছে। ছুটতে ছুটতে উমানাথের বাড়ি গিয়ে হাজির। শুনল, উমা একটু আগেই বেরিয়ে গেছে, বলেছে সতীন যেন শিয়ালদা স্টেশনে চলে যায়।

উমা চলে গেছে শুনে সতীনের আর যাবার ইচ্ছে করল না। একলা একলা এখন শেয়ালদা স্টেশন ছোট ! কোনো মানে হয় না। এত হুড়োহুড়ি করার কি ছিল উমানাথের ! যাবি তো কাঁচরাপাড়া, গাড়ির কি অভাব ছিল !

প্রথমটায় যাব-না যাব-না ভেবেও শেষ পর্যন্ত সতীন সারকুলার রোডে এসে ট্রাম ধরল। উমা হয়ত তার জন্যে শিয়ালদায় হাঁ করে অপেক্ষা করছে। এমন একটা কাজে যাচ্ছে উমা যে কাজে বন্ধুবান্ধব থাকলে ভরসা হয়।

বন্ধুর ওপর বিরক্ত হলেও সতীন শিয়ালদায় এসে নামল। এই এলাকাটাই তার কোনো দিন ভাল লাগে না। কলকাতায় তার জন্মকর্ম, তার বাড়িও বলতে গেলে শিয়ালদা থেকে মাইল খানেক মাত্র দূরে, তবু সতীন খুব কমই এদিকে আসে। শিয়ালদা থেকে সে বার দুই মাত্র গাড়ি চেপে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছে। আগরপাড়া, সোদপুর কিংবা বনগাঁ রাণাঘাট—এর কোন্‌টা যে কোথায় সতীনের মাথায় ঢোকে না। বন্ধুরা বলে, 'তুই শালা পাকা ঘটি, শিয়ালদা পর্যন্ত চিনিস না।' সতীন সত্যিই চেনে না। তার চেনার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং এই জায়গাটাতে এলেই তার মনে হয়, পিলপিল

করে বাঙাল বেরিয়ে আসছে। সতীনও তার বন্ধুদের ঠাট্টা করে বলে, 'শোন বেটা, ওই স্টেশনটা—হোল এরিয়াটা তোদের ছেড়ে দিয়েছি। তোদের সঙ্গে পারা যাবে না।' বন্ধুরা সতীনের মাথায় চাঁটি মেরে বলে, 'পারবি না শালা, আমাদের জার্মান পার্টির সঙ্গে পারবি না। ঘটিদের আমরা মাইনরিটি করে ছাড়ব।'

শিয়ালদায় নেমে সতীন এই সাতসকালেও ভিড় দেখল। যত ব্যাপারীর ভিড়। ক্যানিং-ট্যানিংয়ের দিক থেকে দল বেঁধে ব্যাপারী আসছে। মাছ, শাকসবজি, দুধ, জলছানা।

স্টেশনের দিকে চলে গেল সতীন। রোদ উঠে গেছে।

কাঁচরাপাড়ার গাড়ি কোন্ প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ে জেনে নিয়ে সতীন চারপাশে উমানাথকে খুঁজল। তারপর শুনল ট্রেন মিনিট কয়েক আগে ছেড়ে গেছে। বাঃ, বেশ হল! এত ঝঞ্ঝাট করে এসেও উমাকে ধরতে পারল না। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল সতীনের।

সকাল থেকে চা খাওয়া হয় নি। সতীনের শরীর যেন ধাতে আসছিল না। আগে চা, পরে অন্য কথা।

চা খেতে খেতে সতীনের হঠাৎ জগন্ময়ের কথা মনে পড়ে গেল। তালতলা কাছেই। আর সময়টাও সকাল। এই সকাল সকাল গেলে জগন্ময়কে পাওয়া যেতে পারে। জগন্ময় বলেছিল, সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যে এলে আমায় পেয়ে যাবে।

চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে সতীন একটা সিগারেট ধরাল। সাত-সকালে পাড়া ছেড়ে যখন বেরিয়েই পড়েছে, কাজের কাজ হল না, তখন জগন্ময়ের কাছে গেলে ক্ষতি কি! সতীন তো কথা দিয়েছিল, যাবে। বাড়িতে বা পাড়ায় ফিরে গিয়েই বা সে কি করবে? সেই শরৎ-কাফেতে বসে বসে গেঁজানো। ভাল লাগে না। তার চেয়ে জগন্ময়ের কাছে যাওয়াই ভাল।

সতীন আবার ট্রাম লাইনের দিকে হাঁটতে লাগল। বারো নম্বর ধরবে। জগন্ময়ের বাড়ির হদিসটা তার মনে আছে।

তালতলায় এসে সতীন কেমন ঘাবড়ে গেল। সে স্বপ্নেও ভাবে নি জগন্ময় এ-রকম একটা জায়গায় থাকতে পারে। সরু গলি। রোদের কোন বালাই নেই। বেখাপ্পা ভাঙাচোরা বাড়ি, একদিকে একটা বস্তি, কলের জল গড়িয়ে যাচ্ছে, ভাঙা টিউবওয়েল, দু-একটা ঝাঁপ-খোলা দোকান, একচিলতে মাঠে ভাঙাচোরা গোটা তিনেক ট্যাক্সি পড়ে আছে।

খুঁজে খুঁজে সতীন জগন্ময়ের বাড়িটা পেল। বাড়িটার চেহারা দেখলেই এই হালকা শীতের সকাল যেন রীতিমত গায়ে শীত ধরিয়ে দেয়। কবেকার কোন্ যুগের একটা বাড়ি, বাইরেটা কদাকার হয়ে আছে, ভাঙা-ইট বেরনো, দরজা-জানলা এতই পুরনো যে শুকনো কাঠের রঙ ধরে গেছে। বড় বাড়ি। খোপ খোপ ঘর। বারোয়ারি কলপায়খানা নীচে, দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে; চীনে, অ্যাংলো থেকে শুরু করে একেবারে মিস্ত্রী-মজুর ধরনের দু'পাঁচটা বাঙালীও আছে।

সতীন বেশ ঘাবড়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত জগন্ময়ের ঘরে গিয়ে মুখ বাড়াল।

জগন্ময় একটা খাটিয়ায় শুয়ে তখনও ঘুমোচ্ছে।

ডাকাডাকিতে জগন্ময় জেগে উঠল। যেন প্রথমে চিনতে পারল না সতীনকে। চোখ লাল। মুখে ক্লান্তি আর অবসাদ। শেষে চিনতে পেরে উঠে বসল। অবাক হয়েছে জগন্ময়। "আরে তুমি?"

সতীন হাসবার চেষ্টা করল।

জগন্ময় পরনের লুঙ্গিটাকে ঠিক করে নিল। গায়ে ভুট কম্বল। একেবারে খালি গায়ে শুয়ে ছিল। চওড়া বুক, কালো লোম। মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া, রুক্ষ। গালের দাড়ি যেন আরও মোটা দেখাচ্ছিল।

"এখনও ঘুমোচ্ছ!"

"বস বস", জগন্ময় খুশী হয়ে উঠছিল, "আমি ভাবতেই পারি নি তুমি আসবে।"

"বাঃ, আসতে বলে এখন বলছ ভাবতেই পার নি—!"

জগন্ময় বিরাট করে হাই তুলল, মাথার উপর হাত তুলে গা খেলিয়ে অবসাদ ভাঙল। হেসে বলল, "আরে ভাই, পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে যাকেই আসতে বলেছি, কেউ আসে নি। তুমি যে আসবে কেমন করে ভাবব!"

সতীন ঘরটা দেখছিল। হাত পাঁচেকের একটা ঘর। ভাঙা পাল্লার লম্বাটে এক জানলা। দেওয়াল যে কত কালো বোঝা যায় না। শোবার খাটিয়া ছাড়া জগন্ময়ের সম্পত্তি বলতে একটা কেরাসিন কাঠের ছোট্ট টেবিল, লোহার একটা সস্তা চেয়ার। কয়েকটা প্যাণ্ট আর জামা ঝুলছে। এক প্যাকেট মোমবাতি। কাগজের ছুটো ফুল। ঘরের এক কোণে গোটা ছুয়েক পুরনো টিউব, একটা ব্যাটারির খোল, গোটা ছুই-তিন খালি মদের বোতল। দেওয়ালে বোম্বাইবালী কোনো ফিল্মস্টারের ছবিঅলা ক্যালেণ্ডার। ময়লা ঘর, তার চেয়েও ময়লা বিছানা-টিছানা।

জগন্ময় এবার উঠে পড়ল। উঠে পড়েই একটা চারমিনার ধরাল দেশী লাইটার দিয়ে। বলল, "কাল রাত আড়াইটে পর্যন্ত খেটেছি। এক শালা পার্টিকে চাঙওয়া হোটেলের কাছ থেকে তুলে শখের বাজার নিয়ে গিয়েছিলাম। একেবারে আউট ছিল। শালাকে ছেড়ে আসছি, একটা বুড়ো মাইরি ধরল, তার মেয়ের ডেলিভারি কেস। তাদের কি হল্লা রে ভাই, মেয়ে কাঁদছে, মা ধড়ফড় করছে, ওদের নিয়ে হাজরার একটা নার্সিং হোমে নামালাম; বুড়ো বলল—মেয়ের শ্বশুরবাড়ি খবর দিতে যাবে। আবার শালা রানী কুঠি। সেখান থেকে হাজরা। তারপর গ্যারেজে গাড়ি ফেলে বাড়ি।"

সতীন ঠাট্টা করে বলল, "দেদার কামিয়েছ কাল!"

"কামাই আমার আর কত? মালিকের।"

"তুমি আবার আজ বেরুবে?"

"না। আজ বাদলদা গাড়ি নেবে। আমি এই হপ্তায় তিনদিন নিয়েছি। আজ আমার ছুটি।"

সতীনকে সিগারেটের প্যাকেট লাইটার ছুঁড়ে দিয়ে জগন্ময় বলল,

"তুমি একটু বস। আমি পাঁচ মিনিটে আসছি।"

সতীন সেই লোহার চেয়ারে বসে চারমিনার ধরাল।

বাড়িটা যে জেগে উঠেছে বোঝাই যায়। নানা ধরনের হল্লা হচ্ছে। হিন্দী কথাবার্তাই বেশী শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে টেঁশো ইংরেজী। বাংলাও কানে আসছে। কোথায় যেন এই সকালেই দুর্গন্ধ কিছু পোড়ানো হচ্ছে। নাক টেনে টেনে সতীনের মনে হল, পচা লেইয়ের পাত্রে জল ঢেলে ফোটানো হচ্ছে হয়ত। কিংবা শিরীষ-টিরীষ হবে। আসবা। সময় একটা ঘরের সামনে কিছু কাগজের রঙচঙে বাক্স দেখেছিল সতীন।

জগন্ময় এখানে থাকে কি করে? তার মতন ছেলের পক্ষে এই জায়গায় থাকা কেমন করে সম্ভব? কলেজে জগন্ময় একেবারে চোস্ত ছেলে ছিল, জামা প্যাণ্ট যা পরত সব যেন হালফিলের। সেই জগা এখন এই নোংরার মধ্যে পড়ে আছে—কোনো রকম তোয়াক্কা নেই। ট্যাক্সি চালাতে চালাতে বেটা যেন নিজের সব ভুলে গেছে। জগা যে কাল নেশা টেনেছিল বোঝা যায়, কেননা তার চোখ-মুখ ঠিক স্বাভাবিক হয়ে ওঠে নি এই সকালেও।

সতীন অবাক হয়ে দেখল, একটি মেয়ে ঘরে ঢুকছে। পায়ে হাওয়াই চটি, গায়ে ময়লা ফ্রক। হাঁটু পর্যন্ত ঝুল। মেয়েটার বেশ বয়েস: অন্ততঃ সতেরো-আঠারো। রোগা। কালো রঙ গায়ের। মাথার চুলে বিনুনি। এত বড় মেয়েকে ফ্রক পরতে দেখেই সতীন যেন কেমন বোকার মতন তাকিয়ে থাকল।

মেয়েটি জগন্ময়কে খুঁজতে এসেছিল, দেখতে না পেয়ে কৌতূহলের চোখে সতীনকে দেখল। তারপর এগিয়ে এসে খাটিয়ার তলা থেকে একটা থালা বার করল। কলাই করা থালা, বাটি। রাত্রের কিছু বাসী খাবার পড়ে আছে থালায়।

সতীন নজর করে মেয়েটিকে দেখল। শরীর রোগা, ঢিলে ফ্রক, তবু তার পা, পেছন, কাঁধ বয়েসের কথা বলে দেয় খানিকটা। থালা নিয়ে মেয়েটি যখন উঠে দাঁড়াল, সতীন কেমন অভ্যাসবশে তার বুকের

দিকে তাকাল। হয়ত ভেতরে কিছু পরে নি ; শরীরের তুলনায় ভারী বুক টলটল করছে।

মেয়েটি চলে গেল। সতীন বোকার মতন বসে বসে নানারকম ভাবতে লাগল। মেয়েটা কি অ্যাংলো ? রঙ বড্ড কালো। মুখটা কিন্তু মন্দ নয়। বরং বেশ পাতলা, কাটা-কাটা। ওই রোগাসোগা মেয়ের বুকটুক এমন হয় কি করে ? জগন্ময়ের সঙ্গে কি সম্পর্ক মেয়েটার ?

জগন্ময় ঘরে এল। মুখটুখ ধুয়ে এসেছে।

"একটা মেয়ে এসেছিল, তোমার খাটের তলা থেকে থালা বাটি নিয়ে গেল", সতীন বলল এবং তাকিয়ে থাকল বন্ধুর দিকে।

"ও ! ডলি !"

"ডলি নাম ?"

"হ্যাঁ। পাশেই থাকে।"

"অ্যাংলো ?"

"ওর বাবা হোটেলে চাকরি করত। চুরিচামারি করত বলে চাকরি গিয়েছে। বেটা এখন একটা বেকারীতে ঢুকেছে। ওর মা এখানে কোনো একটা রেড্ ক্রশ অফিসে কিসের একটা কাজ করে। গোটা পাঁচেক বাচ্ছা। ওরা খৃশ্চান ঠিকই, তবে অ্যাংলো-ক্লাসের একেবারে লোয়ার লেভেলের মানুষ। বাপটা পাঁড় মাতাল, তার ওপর একটা চোখ অন্ধ। ভীষণ হারামজাদা। মা-টা মোটামুটি।"

সতীন একটু তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমায় ওরা খাবার তৈরী করে দেয় ?"

"রাত্রে দেয়। আমাদের আবার খাওয়া ! হোটেল-ফোটেলে চালিয়ে দিই। রাত্রে ঝামেলা থাকে, ওরাই রুটি, ঢেঁড়স-চচ্চড়ি, দু-এক টুকরো বীফ দিয়ে যায়—তাতেই চলে যায়। ওরাও ক'টা টাকা পায়।"

জগন্ময় প্যান্টটা পরে নিল, একটা হাতকাটা গেঞ্জিও গায়ে চাপাতে চাপাতে বলল, "এই বাড়িটা পিকিউলিয়ার। এখানে তুমি হরেক

রকম লোক পাবে। দু-চারটে পকেটমারও আছে। সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে, চাকু চালায়, ছিনতাই পার্টি···এ শালা স্বর্গ!" জোরে জোরে হাসল জগন্ময়।

সতীন বলল, "তুমি এখানে আছ কি করে?"

"কেন?"

"জায়গাটা বড় বাজে।"

জগন্ময় আবার জোরে হেসে উঠল। "ট্যাক্সিঅলার আর কত ভাল জায়গা হবে!"

সতীন কিছু বলল না। জগন্ময়কে দেখতে লাগল। ততক্ষণে জামা পরে ফেলেছে ও। জামা পরে মোটা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে নিল।

"তোমার আজ কোনো কাজ নেই তো?" জগন্ময় জিজ্ঞেস করল।

"না। কেন?"

"চল, আজ তোমাকে নিয়ে বেরুই। বিকেলে ছেড়ে দেব।"

"বিকেল? না না, বিকেল কি?"

"তোমার সঙ্গে সে-রকম কথা ছিল", জগন্ময় বলল. "সারাদিন থাকবে বলেছিলাম।"

সতীন কথাটা ভাবে নি। তা ছাড়া আজ সে সে-রকম কোনো [illegible] নিয়ে আসে নি। হঠাৎই এসেছে। উমানাথের সঙ্গে কাঁচরাপাড়ায় যাওয়া হল না বলেই জগন্ময়ের কাছে আসা। কথাটা বলতে গিয়ে সতীনের মনে হল, জগন্ময় যদি শোনে সতীন অন্য জায়গায় যেতে গিয়ে তার কাছে এসেছে তা হলে হয়ত ক্ষুণ্ণ হবে; সতীন তাই উমানাথের কথা বলল না।

জগন্ময় তৈরী। বিছানার তলা থেকে টাকাপয়সা বের করে পকেটে পুরে নিল। বলল, "চল।"

আসবার সময় দরজা ভেজিয়ে তালা দিয়ে জগন্ময় বলল, "চাবিটা ডলিদের জিম্মায় দিয়ে আসি, দাঁড়াও একটু।"

ধর্মতলা স্ট্রীটের এক চায়ের দোকানে এসে বসল জগন্ময়।

"কি খাবে ?" বলে জগন্ময় দোকানের ছেলেটাকে ডাকল।

"চা।" সতীন বলল।

"শুধু চা কি খাবে। টোস্ট ওমলেট খাও।...এই, ডবল ওমলেট লাগা দুটো, টোস্ট দিবি, আর চা। জলদি কর্।"

ছেলেটা চলে গেল। জগন্ময় আবার একটা চারমিনার সিগারেট ধরাল। "আরে, খোঁজ করতেই ভুলে গেছি। তোমার বাবা কেমন আছেন ?"

"ভাল।"

"ক্যানসার, না অন্য কোন রোগ ?"

"ক্যানসারই বলে সবাই।"

জগন্ময় রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল। যেন কি বলবে বুঝতে পারল না। সামান্য পরে বলল, "তোমার নিজের খবর কি ?"

সতীন মামুলী গলায় বলল, "একই রকম। বেকার।"

জগন্ময় হঠাৎ হেঁচে উঠল। বার কয়েক হাঁচির পর তার চোখ ছলছল করছিল।

সতীন বলল, "তুমি সকালবেলায় গায়ে একটা গরম কিছু দিলে না! শীত পড়ে গেছে বেশ।"

জগন্ময় নাক পরিষ্কার করে রুমালটা পকেটে রাখতে রাখতে বলল, "সকালে আমার শীত লাগে না এখনও। ডলির মা ফার্স্ট ক্লাস বুনতে পারে, একটা পুলওভার বুনতে দিয়েছি। দশ টাকা নেবে।"

সতীনের আবার ডলির চেহারা মনে পড়ে গেল। জগন্ময়কে দু মুহূর্ত দেখল সতীন, তারপর বলল, "মেয়েটাকে ও-রকম ফ্রক পরতে দেখলে কেমন লাগে! কি বল ?"

"লাগার কি আছে। ওরা ওই রকমই পরে। শাড়িও পরে। নেই, তাই যা থাকে টেনেটুনে চালায়।"

সতীন জগন্ময়ের লাইটারটা অকারণে জ্বালাল, নেবাল। তারপর বলল, "তোমার ওই বাড়িতে এদের সঙ্গে থাকতে খারাপ লাগে না ?"

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না জগন্ময়। জোরে জোরে সিগারেট টানল। ধোঁয়া গিলল। শেষে বলল, "লাগে। লাগলেও উপায় নেই, ভাই। আমি ওদের সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করি। লেখাপড়া যে দু-চার লাইন শিখেছিলাম—ওদের তা জানতে দিই না। শালারা বোকা নয়, মালুম করে ফেলে হয়ত।"

ততক্ষণে ওমলেট আর টোস্ট এল। জগন্ময় নুন গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিতে দিতে নীচু মুখে বলল, "ভদ্দরলোক হয়ে বিশ-পঁচিশ বছর থেকেছি। কি বল—ঠিক কি না, ভদ্দরলোক অনেক দেখলাম। শালা বটু—বটেশ্বর আমায় অ্যায়সা ফাঁসিয়ে দিয়েছিল, মার্ডার চার্জে পড়ে গিয়েছিলুম। জেলে পাক্কা আট মাস। তারপর খালাস পেয়েছি।"

"বটুকে তুমি বিশ্বাস করেই সাংঘাতিক ভুল করেছিলে।"

"ভদ্দরলোকদের বিশ্বাস করা যায় না", জগন্ময় বলল, "এ শালারা অদ্ভুত ক্লাস। এরা তোমায় হাসতে হাসতে চাকু মেরে দেবে। ছোটলোকরা অনেক ভাল। সাফ কারবার করে।" বলেই জগন্ময় অনেকটা ওমলেট মুখে পুরে দিল। দিয়ে চিবোতে লাগল।

সতীনের খিদে পেয়েছিল। সে আস্তে আস্তে খেতে লাগল। খেতে খেতে তার মনে হল, আজ দু-চারটে টাকা পকেটে বেশী থাকলে হত। জগন্ময়ের পয়সায় সে খাচ্ছে। লজ্জাই করে। সতীনের পকেটে টাকা দুই আছে। তাতে এই চা খাওয়ার বিল মেটানো যাবে না। মেটাতে পারলে ভাল হত। আত্মসম্মানটা যেন বাঁচত। অবশ্য এখানে আত্মসম্মানের কোনো মানে হয় না। জগন্ময় তাকে আদর করে খাওয়াচ্ছে। তবু যেন কেমন লাগে- !

জগন্ময় খেতে খেতে বলল, "তুমি একদিন আমার সঙ্গে ট্যাক্সিতে যদি সারাদিন থাকো, ভদ্দরলোকদের চিনতে পারবে। হরেক রকম ভদ্দরলোক।"

"তুমি যেখানে থাকো এর চেয়ে ভাল জায়গায় থাকতে পার না?" সতীন হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

"ভাল জায়গা মানে ?"

"বেটার অ্যাটমস্ফেয়ারে।" সতীন টোস্টে কামড় দিল।—"তোমার জায়গাটা আমার কেমন ভাল লাগছে না।"

জগন্ময় হেসে উঠল। জোরে নয়। বলল, "তুমি মাইরি মিডল্ ক্লাস কথা বলছ! তোমার মনে গোঁড়ামি আছে।"

সতীনও ঠাট্টা করে বলল, "তুমিও ট্যাক্সিঅলার মতন কথা বলছ না, জগন্ময়। তুমিও মিডল্ ক্লাসের মতন কথা বলছ।"

"তুমি আমায় বলাচ্ছ।" জগন্ময় বলল। বলেই একেবারে চুপ

চা এল।

চায়ে চুমুক দিয়ে জগন্ময় বলল, "জানো সতীন, আমি আমার সমস্ত পাস্টকে ঘেন্না করি। যেভাবে মানুষ হয়েছি, যে সমাজে যাদের মধ্যে বড় হয়েছি, শালা ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত লিখতে পড়তে শিখেছি—সমস্ত আমি ভুলে যেতে চাই। কিন্তু ভুলতে যখন পারি না—তখন শালা মন ছট্‌ফট করে, কথা বলার একটা লোক পাই না। নিজের ক্লাস থেকে হাত-পা ধুয়ে বেরিয়ে আসা মুশকিল। আই নো ছ্যাট্। তবে কি জান, তোমায় শালা সকলেই ক্লাস থেকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দিচ্ছে। তুমি ভেবে দেখ—দিচ্ছে কি না! আমার সঙ্গে তুমি চল, আমি তোমায় এই কলকাতায় হাজার ছেলে দেখাব, গুড ফ্যামিলির ছেলে—সব কেমন ভাবে বেঁচে থাকে! দেখবে তুমি ?"

সতীন চায়ের কাপ তুলে নিয়ে বলল, "পরে দেখব। তোমার কথা এখন বল, আমার ভীষণ ভাল লাগছে।"

জগন্ময় বলল, "চা খেয়ে চল কোথাও চলে যাই। দুপুরে তুমি আমি একসঙ্গে খাব। আমি তোমায় বলব।"

॥ নয় ॥

ঘণ্টা দুই আড়াই জগন্ময়ের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে সতীন কোনো রকমে বন্ধুর কাছ থেকে ছাড়ান পেল। ছাড়তে চাইছিল না জগন্ময়; সতীন অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলল, "না ভাই, আমি বাড়িতে বলে আসি নি, দুপুরে বাড়ি না ফিরলে ভাববে; তা ছাড়া বাবার শরীর খারাপ— কখন কি দরকার পড়ে, বোঝোই তো. আমিই শালা এক বেকার ছেলে বাড়িতে বসে আছি।"

জগন্ময় ছেড়ে দিল। বলল, "আবার কবে আসবে?"

"আসব। শীঘ্রি আসব।"

"প্রমিস?"

সতীন হেসে ফেলে শপথ করল, "আসব।"

ফেরার সময় ট্রামে চেপে সতীনের নানারকম কথা মনে হচ্ছিল। সত্যি, মানুষ কেমন বদলে যায়! কিংবা এক সময় একজনকে যেমন মনে হয়, বাইরে থেকে পরে তাকে ভাল করে দেখতে পেলে ধারণা একেবারে পাল্টে যায়। এই জগন্ময় কলেজে নটোরিয়াস ছেলে হিসাবে খ্যাতি কুড়িয়েছিল। মহা কাপ্তেন ছেলে ছিল; কাপ্তেন আর ফেরোসাস। সতীনরা জগন্ময়ের সঙ্গে মেশামেশি করত না, করতে ভয় পেত। ওই ধরনের ছেলের সঙ্গে ঘোরাফেরা করা ঝুঁকি ছিল; কখন চোট খেয়ে যাবে কেউ বলতে পারে না। সেই জগন্ময়কে এখন দেখো, কেমন বন্ধুবৎসল! কত অন্তরঙ্গ! তার সমস্ত হাবভাবে সে যে সতীনের চেয়ে অনেক আন্তরিক এটা বোঝা যাচ্ছিল। জগন্ময় কী খুশীই হয়েছিল সতীনকে পেয়ে! অথচ সতীন কেন যেন অত খুশী হতে পারছিল না। কেন?

নিজেকে মাঝে মাঝে অপরাধী-অপরাধী লাগছিল সতীনের। তার মনে হচ্ছিল, সে যেন শুধুই কৌতূহল নিয়ে জগন্ময়কে দেখতে এসেছিল, বন্ধুত্বের টানে নয়। তার আন্তরিকতা অনেক কম।

সে যাই হোক, এই দুই-আড়াই ঘণ্টা জগন্ময়ের সঙ্গে ঘুরেফিরে গল্প

করে বেশ লাগল। পাড়ায় থাকলে কী হত? সেই চায়ের দোকান, সেই একই বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বাজে আড্ডা, সস্তা কিছু রাজনীতির তর্ক, সিনেমার মেয়েছেলের গল্প। এই করেই তো নিত্যদিন কেটে যায়। নতুন কিছু নেই, কোনো কথা নয়, কোনো স্বাদও নয় অন্য রকমের।

আজ একেবারে আলাদা। একঘেয়েমি থেকে হঠাৎ যেন ছাড়া পেয়ে নতুন কিছু দেখা।

জগন্ময় তার সব কথা বলল না। বলতে পারল না। একটা গল্প শুরু করলে তা বলতে বলতে আবার এমন একটা গল্প চলে আসে যে সময় কেটে যায় হু-হু করে। ওরই মধ্যে জগন্ময় যা বলল তাতে সতীন বুঝতে পারল: জগার নিজের বাবা ছিল না। তারা নাকি 'ফেমিন কৃশ্চান'—মানে এক সময় তাদের সমাজ এতই দরিদ্র ছিল যে মিশনারীরা খেতে দেবার লোভ দেখিয়ে তাদের ধর্মান্তরিত করেছিল। জগন্ময় জানে না তার পূর্বপুরুষ কী ছিল, কোন্ ধরনের পেশা তাদের অবলম্বন ছিল। কিন্তু জগন্ময়ের মা এবং মা'র বাবাটাবা নিশ্চয় মোটা-মুটি সচ্ছল ছিল—যার ফলে নাকি তার মা মিশনারী স্কুলে পড়েছিল, ভদ্রসমাজেই ঘোরাফেরা করতে পারত। মা'র সঙ্গে বিয়ে হয় যার সে ভদ্রলোক কারখানায় কাজ করত, ফোরম্যান গোছের কাজ। জগা জন্মানোর বছর তিনেক পরে ভদ্রলোক মারা যান; কারখানায় অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। এর পর মা বছর দুই-তিন আর বিয়ে করে নি। পরে আবার বিয়ে করে। জগন্ময়ের পালিত পিতা সাদাসিধে মানুষ ছিল, কিন্তু লোকটার এক ব্যাপারে দুর্বলতা ছিল। স্ত্রীর কাছে তার কোন ব্যক্তিত্ব ছিল না। নিজের বাচ্চাকাচ্চাও তার হয় নি। জগন্ময়ের মা ছেলের জন্যে দেদার টাকা খরচ করত তখন। যাই হোক, টাকা নেওয়া ছাড়া জগার সঙ্গে তার মা'র সম্পর্ক তেমন ভাল ছিল না। জগা ছুটিছাটায় মা'র কাছে কমই যেত। যখনই যেত, দেখত তার পালিত পিতা মদ্যপান করছে, মা মদ খাচ্ছে; দুই মাতালে চেঁচামেচি করছে, হাতাহাতিও লেগে যেত এক এক সময় নেশার ঘোরে।

সেই বাপ মরে গেল। মানে মার্ডার হল। আর মা?

• মা'র কথা জগন্ময় বিস্তারিত করে আর বলল না ; তবে সেই মা বেঁচে আছে এমন মনে করারও কোন ইঙ্গিত দিল না।

সতীন আর জগন্ময়কে খোঁচাল না। পরের ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞেস করতে লজ্জা হয়। সেটা উচিতও নয়।

জগন্ময় এই বয়েসেই অনেক দেখেছে। বার তিনেক তো মরতে মরতে বেঁচে গেছে। জেলের গন্ধও গায়ে আছে তার। দুঃখকষ্টও কম সহ্য করে নি।

"বুঝলে সতীন, নিজেকে শালা না বাঁচালে আজকাল কেউ তোমায় বাঁচাবে না। আমি যখন বুঝলাম নিজেকে বাঁচাতে হবে—নিজের ঘামের পয়সায় খেতে পরতে হবে সেদিন থেকে হুঁশমতন কাজ করি।...তুমি জানো, একদিন আমি যখন লোচ্চার মতন ঘুরে বেড়াচ্ছি তখন একদিন ট্রাম-গুমটির পেচ্ছাবখানার কাছে একটা লোক আমায় ধরেছিল। মিলিটারির মতন ড্রেস ; লোকটা বোধ হয় আপ্ কান্ট্রির। বেটা আমার সঙ্গে ইংরিজী-হিন্দীতে কথা বলে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলল। তারপর মাল খাওয়াতে নিয়ে যেতে চাইল। বার বার আমায় বলছিল, তোমার এত ভাল শরীর স্বাস্থ্য—আমার সঙ্গে চল, তোমায় মিলিটারিতে ঢুকিয়ে দেব। আমার মাইরি সন্দেহ হল, মিলিটারিতে ঢুকিয়ে দেবে এ শালা, পি. সি. সরকারের ম্যাজিক কিনা! তার পয়সায় মাল খেয়ে কেটে পড়লুম। বুঝলুম মাল গভীর জলের মাছ। আমায় কোথাও ফাঁসিয়ে দেবে। স্মাগলিং-টাগলিংয়ে।"

সতীনেরও সেই রকম সন্দেহ হল জগন্ময়ের কথা শুনে।

জগন্ময় আরও কত রকম গল্প বলল। এমন কি সেই বাঙালী মেয়ের গল্প। একদিন, তখন অবশ্য জগন্ময় সবেই ট্যাক্সি চালাতে শিখেছে, সেদিন তার হাতে অফুরন্ত সময় ছিল ; টাইগার সিনেমায় একটা গাঁজামার্কা ছবি দেখতে গিয়ে একটি মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ হল। অবশ্য মেয়ে না বলে তাকে মহিলা বলা উচিত। প্রায় বছর পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বয়েস ; কাঠকয়লার মতন কালো গায়ের রঙ। মাথার চুল কোঁকড়ানো। সেই মহিলা জগন্ময়ের মধ্যে কোন্ যাদু দেখল কে

জানে, সিনেমার পরও লেপটে থাকল। তারপর দু-চারটে এমন কাণ্ড করার চেষ্টা করল, কথা বলল যে জগন্ময় বুঝতে পারল, ভরণপোষণ দিয়ে জগন্ময়কে রাখতে পারলে মাগী বেঁচে যায়।

"সাচ বলছি সতীন, সে মাগী যদি স্লাইট মেয়েছেলে হত মাইরি আমি তার সঙ্গে ঝুলে পড়তাম।" বলে জগন্ময় হো হো করে হেসে উঠল। তার পর বলল, "মাগীর যা ফিগার, কোনো বেটাছেলে তার কাছে ভেড়ে না। সেক্সের ব্যাপার, বুঝলে না? বেটাছেলে খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

জগন্ময় বলল, "কলকাতা এক আজব চিড়িয়াখানা মাইরি, মানুষ শালা কত হারামী হয় আবার কত রেচেড্ হয় তোমায় কি বলব!"

সতীন বাড়ি ফিরে দেখল, কাজল কলেজে, বেলা একটা বেজে গেছে।

নন্দা জিজ্ঞেস করল, "কোথায় গিয়েছিলে? কাঁচরাপাড়া?"

"হ্যাঁ", সতীন খুব সংক্ষেপে জবাব দিল। বুঝতে পারল বউদি কাজলের কাছ থেকে তার কাঁচরাপাড়া যাবার কথা শুনেছে।

নন্দা মুখের ভঙ্গি বিরক্ত করে বলল, "পাড়ার বন্ধুদের বউদি-টউদির জন্যে তোমার ছুটোছুটির কী আছে? একে ওই সব খারাপ রোগ, তার ওপর কার কী মন্দ আছে কে বলতে পারে!"

সতীনের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। কাজলই নিশ্চয় বউদিকে বলেছে যে সতীন উমার বউদির জন্যে কাঁচরাপাড়া গিয়েছে। কি দরকার ছিল কাজলের কথাটা বলবার? সতীন কচি খোকা নয় যে সে কোথায় যাবে আর না যাবে বউদিকে বলে যেতে হবে। কাজলটা মুখ্যু। আসুক আজ বাড়িতে, সতীন একচোট ধমকাবে।

অনেকটা বেলা হয়ে গিয়েছিল বলে সতীন তাড়াতাড়ি স্নানে চলে গেল।

স্নান-খাওয়া শেষ করে সতীন খবরের কাগজের জন্যে ওপরে গেল

বাবার ঘরে উঁকি মারল। চুপ করে শুয়ে আছে বাবা। বোধ হয় ঘুমের তন্দ্রার মধ্যে রয়েছে। গভীর ঘুম বাবার হয় না।

বড়দার ঘরে কাগজ নেই। বউদি পান চিবোতে চিবোতে রেডিও খুলে বিছানায় গড়াবার আগে সিনেমার কাগজ-টাগজ বালিশের পাশে রাখছে।

"কাগজটা কই ?" সতীন জিজ্ঞেস করল।

"এ-ঘরে কাগজ থাকে না ; ঠাকুরপোর ঘরে দেখ।"

চলেই যাচ্ছিল সতীন, হঠাৎ তার নজরে পড়ল বউদির বালিশের পাশে একটা ইংরিজী ছবিঅলা সিনেমার কাগজ পড়ে আছে। মলাটের ছবিটাই যথেষ্ট। সতীন এই কাগজটা চেনে। দেখেছে। তার হঠাৎ কেমন হাসি পেল। বউদি এখন শুয়ে শুয়ে বোম্বাইঅলা মেয়েদের আধ-ন্যাংটো ছবি দেখবে ; তারপর যত রাজ্যের বাংলা সিনেমার খবর পড়বে, ছবি দেখবে বাংলা কাগজ থেকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হেসেই ফেলল প্রায় সতীন। ওই মোটা ধুমসী, একশো আশি কেজির বউদি নিজের ফিগার মেলাবে নাকি সিনেমা-স্টারদের সঙ্গে ? সর্বনাশ ! কৃপা করো মা কৃপা করো !

অন্যদিন সকালে মিত্র-কাফেতে কাগজ দেখা হয়ে যায়। আজ সকাল থেকে কাগজ দেখা হয় নি। রোজকার অভ্যেস বলেই খারাপ লাগছিল তার।

মেজদার ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সতীন। বাইরের জানলার কাঠের পাল্লা খোলা। শার্সি বন্ধ। ছায়া মাখানো ঘর।

মেজদার ঘরটা দেখলেই অন্য রকম লাগে। এক পাশে খাট, পাতা বিছানার ওপর বেডকভার পাতা। বইয়ের ছোট বড় আলমারি গোটা দুই। বেতের র‍্যাকের ওপর কাগজ আর বই। টেবিলের ওপর টুকটাক কত কি পড়ে আছে। আলনায় মেজদার জামাকাপড়। মেজদা মানুষটা ছিমছাম থাকতে পছন্দ করে। তার ঘরে যে ক্যাম্বিসের চেয়ারটা পাতা রয়েছে তার মাথার দিকে একটা রঙীন তোয়ালে।

এই ঘরটা, সতীনের মনে হল, এ বাড়ির সমস্ত ঘর থেকে আলাদা। বড়দার ঘর দেখলেই কেমন একটা গেরস্থ-বাড়ির ব্যাপার মনে হয়। মেজদার ঘর দেখলে মনে হয়, মানুষটা যেন একলা থাকে, নিজের মেজাজ নিয়ে।

টেবিলের ওপর কাগজ ছিল।

সতীন কাগজটা নিতে গিয়ে দেখল, একটা চিঠি চটি-গোছের এক বইয়ের মধ্যে ভাঁজ করে ঢোকানো। পুরোপুরি ঢোকানো নয়, বেশীর ভাগটাই বার করা। কোথা থেকে একটা মাকড়সার মরা বাচ্চা তার ওপর পড়ে আছে। সতীন হাতের কাগজ দিয়ে মাকড়সাটা ফেলে দিতে গেল। কাগজের ঝাপটা মারতেই চিঠিটা বই থেকে বেরিয়ে এল।

রেখেই দিচ্ছিল আবার সতীন, হঠাৎ অন্যমনস্ক ভাবে একবার খুলল। খুলেই অবাক হল।

সুলেখা! কে সুলেখা? সতীন এরকম কোনো নাম তো শোনে নি। যাঃ শালা! মেজদার লাভার নাকি?

সতীন চিঠিটা পড়তে লাগল। সে বেশ বুঝতে পারল, মেজদা চিঠিটা লিখতে বসে শেষ করে নি। শেষ না করে যেটুকু লেখা হয়েছিল মুড়ে বইয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছিল। পরে শেষ করবে।

সতীন চিঠিটা পড়তে লাগল।

চিঠিটা তেমন কিছু বড় নয়। মেজদার হাতের লেখা গোটা গোটা, বড় বড়। প্রায় শেষ করে এনেছিল চিঠিটা।

সতীন চিঠি থেকে অনুমান করে নিতে পারল। সুলেখা নামের একটি বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে মেজদার গভীর ধরনের ভাবসাব আছে। মহিলা কলেজে পড়ান। মেজদা আগে যেখানে পড়াত। সুলেখার স্বামীর কথাও চিঠিতে আছে বারকয়েক।

কিছুক্ষণ কেমন বোকার মতন দাঁড়িয়ে থেকে সতীন চিঠিটা রেখে দিল গুছিয়ে।

দরজা ভেজিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল সতীন। তার কেমন

অবাক-অবাক লাগছিল। চিঠিটা কি প্রেমপত্র! তা ঠিক মনে হয় না। একেবারে সাধারণ চিঠি! তাও নয়। সাধারণ চিঠি এ-রকম হয় না।

সতীনের আবার ভাবতে ভাল লাগছিল না যে, অন্যের বউয়ের সঙ্গে তার মেজদার এইরকম ভাব-ভালবাসা থাকে! পরের বউয়ের সঙ্গে মেজদার কেন এমন ঘনিষ্ঠতা থাকবে? মেজদার বিয়ে হয় নি। অবিবাহিত পুরুষের সঙ্গে বিবাহিতা মেয়ের এমন 'তুমি-তুমি' ভাল না।

সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে কাগজ খুললেও সতীনের মন মেজদা আর সুলেখা নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকল।

ভাবাই যায় না। মেজদা প্রেম করছে ভাবাই যায় না। কিংবা প্রেম করছে না, না করেও কোনো বউয়ের সঙ্গে চিঠি লেখালিখি করছে—তাও ভাবা যায় না।

কাজলকে কি কথাটা বলবে সতীন?

নিজের বুদ্ধিতে তার এই রহস্য যখন উদ্ধার করা যাচ্ছে না—তখন কাজলকে বলা যেতে পারে। কিন্তু বোনের কাছে মেজদার ব্যাপার বলা কি উচিত হবে?

সে যাই হোক, মেজদা ব্যাপারটা ভাল করছে না। মানে মেজদার মতন লেখাপড়া শেখা, বুদ্ধিমান, কলেজে পড়ানো একজন মানুষের পক্ষে কাজটা ভাল হচ্ছে না। এই বাড়ির পক্ষেও নয়। কথাটা বাড়িতে পাঁচজনের কানে উঠলে কী মনে করবে সবাই!

তারপর একেবারে অকারণেই সতীনের মনে হল, মেজদার কেসটা জগন্ময়ের বাবার কেস হয়ে যাবে না তো? যদি দুম করে মেজদা একদিন ওই সুলেখাকে বিয়ে করে ফেলে— তা হলে? কিন্তু কেমন করে করবে? সুলেখার স্বামী জীবিত। ডিভোর্স করে অবশ্য বিয়ে হতে পারে। কিংবা সেই ভদ্রলোক যদি মারা যায়!

সতীন নিজের খেয়ালেই মাথা নাড়ল। না, না, না। অসম্ভব। এ বিয়ে এ বাড়িতে হতে পারে না। মেজদা কখনই তেমন কাজ করবে না।

এই বাড়ির মান সম্মান আভিজাত্য যেন সতীনকে হঠাৎ কেমন একগুঁয়ে করে তুলল। অথচ সে বেশ বুঝতে পারছিল—এ সবই তার কল্পনা।

॥ দশ ॥

কলেজ থেকে ফিরে এসে কাজল দেখল, সতীন ঘুমোচ্ছে। কাজলের ফেরার কথা সোয়া চারটে নাগাদ, তার আগেই ফিরে এসেছে। শেষের দিকে ছুটো ক্লাস হল না। দিদিরা কিসের মিটিং করছেন—কাজে কাজেই ছুটি। ছুটি হয়ে যাবার পর বন্ধুদের পাল্লায় পড়ল কাজল। তারা টেনে নিয়ে চলল কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে। বনানী একটা ব্যাগ কিনবে, মীরা ব্লাউস পিস কিনল গোটা দুই। তারপর কলকল করতে করতে গেল কফি হাউসে। সকলের ব্যাগ ঘেঁটে যা জুটল তাতে দু কাপ কফি চারজনে ভাগ করে খেতে হল।

বই খাতা নামিয়ে রেখে কাজল একটু বসল। অনেকটা হাঁটাহাঁটি হয়েছে আজ। ফেরার সময়ও কলেজ স্ট্রীট থেকে সরাসরি হেঁটেই ফিরেছে কাজল। আসবার সময় হ্যারিসন রোডে কনকদির সঙ্গে দেখা হল। কেমন চেহারা হয়ে গিয়েছে কনকদির, যেমন মোটা তেমনি ধবধবে। মাথায় বেঁটে বলে যত মোটা হচ্ছে ততই যেন বেঢপ হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া অমন ভাল চাকরি করলে কে না মোটা হবে বাপু! রেলের কোন্ অফিসে চাকরি করে—ভাল চাকরি, অফিস যাও আর না যাও মাইনে ঠিকই আছে। কনকদি দু-একটা কথা বলেই ছেড়ে দিল। ট্যাক্সি খুঁজছে, হাওড়া যাবে।

কাজল সামান্য বিশ্রাম করে কলঘরে গেল। বাড়িটা এখনও নিঝুম। ফাঁকা উঠোনে রোদ নেই, ছায়া কালচে হয়ে এসেছে। ঝি'র বাসনপত্র মাজা শেষ। রান্নাঘরে কিসের কাজ করছে। বউদি নিশ্চয় ঘুমোচ্ছে। অবেলায় ঘুমোনো তার অভ্যেস; ছেলেমেয়ে বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত শুয়ে থাকবে। এক এক সময় কাজলের বড় দুঃখ হয়।

দুঃখ হয় এই ভেবে যে, মা মারা যাবার পর থেকে তাকে বাড়িতে অভ্যর্থনা করার কেউ নেই। নিজের মতন এসো, নিজের মতন যাও – কেউ কিছু বলবে না।

কাজল ঘরে ফিরে এল। কাপড়-টাপড় ছেড়ে একবার বাবার ঘরে যাবে।

সতীন তখনও ঘুমোচ্ছে।

দাদা ঘুমোচ্ছে দেখে কাজল নিজের ঘরেই কাপড়জামা পালটে নিল। বাইরের শাড়িটা গুছিয়ে রেখেছে এমন সময় সতীনের ঘুম ভেঙে গেল।

দাদার ঘুম ভেঙে গেছে দেখে কাজল বলল, "কখন ফিরলে কাঁচরাপাড়া থেকে ?"

সতীন বোনের দিকে তাকাল। বোধ হয় সে কোনো স্বপ্ন দেখছিল, আচমকা স্বপ্নটা ভেঙে যাওয়ায় ঈষৎ অন্যমনস্ক।

কাজল দাদার দিকে তাকিয়ে থাকল।

সতীন এবার হাই তুলল। "তুই এখুনি ফিরলি ?"

"একটু আগে।"

"আমার যেন তোকে দিদি-দিদি মনে হচ্ছিল। স্বপ্ন দেখছিলাম। দিদির সঙ্গে মেজদার তুমুল ঝগড়া হচ্ছে !"

কাজল বলল, "দিদি অনেক দিন আসে নি।"

সতীন বিছানায় উঠে বসল। "একটু জল খাওয়া।"

কাজল জল আনতে গেল। সতীন স্বপ্নটা মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল। এইমাত্র দেখা স্বপ্ন, তবু আর গুছিয়ে ফেলা যাচ্ছে না, শুধু মনে পড়ছে— মেজদা যেন নিজের ঘরে বসে আছে আর দিদি সামনে দাঁড়িয়ে ভীষণ ভাবে ঝগড়া করছে। কিসের ঝগড়া ?

কাজল জল নিয়ে এল।

সতীন জল খেয়ে নিল এক চুমুকে।

"কাঁচরাপাড়ায় কিছু হল ?" কাজল আবার জিজ্ঞেস করল।

"আমি যাই নি", সতীন বলল।

"যাও নি ?"

"উমা আগেই শিয়ালদা চলে গিয়েছিল। শিয়ালদায় গিয়েও তাকে ধরতে পারলাম না।"

"ওমা, তা হলে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?"

"জগন্ময়ের কাছে।"

"জগন্ময়...!" কাজল যেন প্রথমটায় মনে করতে পারল না, তার পর পারল।

সতীন উঠে পড়ে চারমিনার সিগারেট ধরাল। বলল, "জগাকে বলেছিলাম একদিন যাব। আজ চলে গেলাম।...আরে ব্বাস কী জায়গায় থাকে জগা! একেবারে রদ্দি জায়গায়। কত রকম যে লোক সেখানে খুকি, দেখলে তোর মাথা খারাপ হয়ে যাবে। যেমন বাড়ির চেহারা তেমনি থাকার বাহার। জগা বেটা একেবারে বস্তি-বাড়ির মতন করে থাকে।"

কাজল জগন্ময় সম্পর্কে কোন উৎসাহ বোধ করল না।

সতীন নিজেই বলে চলল, "আমাকে দেখে দারুণ খুশী। বলে, ছাড়ব না। সারাদিন ধরে রাখতে চায়। হোটেলে খাওয়াবে। কোনো রকমে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কেটে পড়েছি।"

কাজল বিনুনির ডগা খুলতে লাগল। কলেজ যাবার সময় তাড়াহুড়োয় বিনুনি করেছিল, ভেবেছিল বিকেলে ভাল করে চুল আঁচড়ে নেবে।

সতীন জোরে জোরে টান মারল সিগারেটে। বিছানায় বসল। বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, "জগাকে দেখে আমি স্টার্ন্ট মেরে গিয়েছি। কী কাপ্তেন ছেলে ছিল, আর কী হয়েছে! বিশ্বাস করা যায় না। তবে ওর হার্ট দেখলাম। দিলদরিয়া, পুরনো বন্ধু বলে যেন জাপটে ধরল। আমার বেশ লাগল—বুঝলি খুকি! পাড়ার এই বন্ধুগুলোকে তো দেখি, কপিল-টপিলকে—এ শালারা নানা তালে থাকে, মানে এদের বন্ধুত্ব কেমন ফিকে ফিকে, জগা বেটার লাইফটাই অন্য রকম।"

কাজল হেসে বলল, "তোমায় জগায় পেয়েছে।"

সতীন বলল, "পেয়েছে তো পেয়েছে। কি হয়েছে রে? জগা বড় বাজে জায়গায় থাকে—কিন্তু ছেলেটার হার্ট আছে, আর এই কপিল-টপিল ভাল জায়গায় থাকে—কিন্তু শালারা সব পাজী!···আমি আবার একদিন জগার কাছে যাব। সারাদিন থাকব। ওর ট্যাক্সিতে ঘুরে বেড়াব।"

কাজল কিছুই বলল না। হঠাৎ তার নলিনীদির কথা মনে হল। কাজল বলল, "আজ নলিনীদিকে দেখলাম।"

"নলিনীদি? মানে দিদির বন্ধু?"

"হ্যাঁ।"

"কী বলে?"

"এই দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করল।"

"নলিনীদির সেই গুঁফো বরটাকে দেখলি?"

"না।"

"তাকে তো তাড়িয়ে দিয়েছে!"

কাজল জানে ব্যাপারটা। সতীন যেভাবে তাড়িয়ে দেওয়া বলল—তা অবশ্য নয়। নলিনীদির বাবা নিজে দেখেশুনে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের পর শোনা গেল নলিনীদির স্বামীর নানা দোষ। ঝগড়াঝাঁটি লেগে গেল। শেষে নলিনীদি আলাদা থাকতে লাগল, তার স্বামীও চলে গেল অন্য জায়গায়।

লোকের বাড়ির মধ্যে কী হচ্ছে বাইরে থেকে বোঝা যায় না। নলিনীদি খুব নরম ধাতের মেয়ে নয়। কড়া মেজাজের। স্বামীর সঙ্গে যে বনিবনা করে চলবে সে স্বভাব তার নয়। যাই হোক নলিনীদিকে দেখলে মনে হয়, স্বামী না থাকলেও সে বেশ আরামেই আছে।

সতীনের এবার মেজদার কথা আবার মনে পড়ে গেল। মেজদার সঙ্গে দিদির ঝগড়া। মেজদার চিঠি। সুলেখা। বোনের দিকে তাকাল সতীন। বলবে কি? না, বলবে না?

শেষ পর্যন্ত সতীন বলল, "খুকি, মেজদার বিয়ের কোন কথাটথা শুনিস ?"

কাজল দাদার চোখের দিকে তাকাল। আচমকা এই কথার কী অর্থ সে বুঝল না। বলল, "কেন ?"

"জিজ্ঞেস করছি। মধ্যে দিদি না বাবার কাছে বিয়ের কথা বলছিল ?"

"হ্যাঁ, দিদি চেষ্টা করছিল। মেজদা এখন বিয়ে করবে না।"

"কেন ?"

"কেমন করে বলব ?···বাবার অসুখবিসুখ চলছে বলেই বোধ হয়।"

সতীন কি ভেবে বলল, "শুনেছিলাম, তোর আগে বিয়ে দিতে চায় মেজদা।"

"যাঃ !"

"আমি শুনেছিলাম।···তোর বিয়েটা হয়ে গেলে ভাল হয়।"

কাজল হালকা করে বলল, "আমায় তাড়িয়ে তোমার আর কি লাভ ?"

সতীন হঠাৎ বয়স্কজনের গলায় বলল, "না খুকি, বাবা থাকতে থাকতে তোর বিয়েটা হয়ে যাওয়া উচিত।"

"কেন ?"

"কি জানি। আমার মনে হচ্ছে, এ বাড়ির ব্যাপার-স্যাপার ভাল নয়। আমি বউদিকে মোটেই বিশ্বাস করি না। অবশ্য দিদি রয়েছে। তা হোক—তবু কোথ্ থেকে একটা পাঁঠা ধরে আনবে, এনে তোর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে—কে জানে। বাবা না থাকলে কেউ গ্রাহ্য করবে না তোকে। তোকেও নয়, আমাকেও নয়।"

কাজল মাথা নেড়ে বলল, "তুমি যে কি বলো তার ঠিক নেই।"

"আমি যা বলছি তা মিলিয়ে নিস।"

"মেজদা রয়েছে না ?"

"মেজদা ! মেজদাকে আমারও মনে হত ভাল, বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। কিন্তু মেজদাও···" সতীন কথা শেষ না করে চুপ করে গেল।

কাজল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। কিছু বুঝতে পারল না।

সিগারেটটা নিবিয়ে দিয়ে সতীন শেষে বলল, "তোকে একটা কথা বলব। মরে গেলেও কাউকে বলবি না।"

কাজল নীরব।

সতীন বলল, "মেজদা আগে বাইরে যেখানে পড়াত—সেখানে সুলেখা বলে একটা মেয়ে আছে—ম্যারেড্। মেজদা তাকে 'তুমি-তুমি' করে চিঠি লেখে।"

কাজল কোনো এক মহিলার চিঠি মেজদার নামে আসতে দেখেছে। খামের ওপর হাতের লেখা দেখলে বোঝা যায় মেয়েলী হাতের লেখা। কিন্তু সে কে—কাজল জানত না।

কাজল কেমন সন্দেহের গলায় বলল, "তুমি কেমন করে জানলে ?"

"আমি চিঠি দেখেছি।"

বিমূঢ় হয়ে কাজল তাকিয়ে থাকল। পরে বলল, "চিঠি লিখলে কী হয়েছে ?"

"বাঃ, কী হয়েছে!"

"আলাপ-টালাপ ছিল বলেই হয়ত লেখে।"

"ম্যারেড্ মেয়েকে 'তুমি-তুমি' করে লিখবে ?"

"বয়েসে হয়তো ছোট।"

"না, মোটেই ছোট নয়। চিঠিটা তুই দেখিস নি; আমি দেখেছি।"

কাজল বিশ্বাস করতে পারল না। বলল, "তোমার ভুল। মেজদা অন্যায় কাজ করতে পারে না। তা ছাড়া মেজদার বিয়ের জন্যে ভাল ভাল মেয়ে পাওয়া যাবে।"

সতীন বলল, "ভাল ভাল মেয়ের কথা আলাদা। কিন্তু মেজদা যদি ওই মেয়েটাকে ভালবেসে থাকে—তবে মেজদাকে কেউ নড়াতে পারবে না। মেজদা বড় একরোখা, জেদী। কোনো কিছুর তোয়াক্কা করবে না।"

কাজল বিশ্বাস করল না এ-রকম কিছু হতে পারে। যদি হয়—

তা হলে বুঝতে হবে এ বাড়িতে মেজদা আর থাকবে না।

মা নেই; বাবাও তো যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আছে, দিদি অন্য বাড়িতে। কাজলও এখানে বসে থাকবে না। তা হলে এই বাড়িতে শেষ পর্যন্ত কে কে থাকবে? বড়দা বউদি তার ছেলেমেয়েরা আর সতীন?

কাজলের মনে হল, তাদের বাড়িটা যে সত্যিই ফাঁকা হয়ে আসবে যেন তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

হঠাৎ কাজল বলল, "লোকের চিঠি দেখা ভাল নয়। তুমি কেন দেখলে?"

সতীন বলল, "হঠাৎ হাতে পড়ল।"

কাজল বলল, "হঠাৎ পড়লেও দেখবে না।"

সতীন একটু চুপ করে থেকে হেসে উঠে বলল, "কেন? তোর কাছেও সেই আর্টিস্ট ছোঁড়া চিঠি দেয় নাকি?"

কাজল আর কথা বলতে পারল না।

॥ এগারো ॥

আর একটু হলেই সতীন ফুটপাথে মুখ থুবড়ে পড়ত। কোনো রকমে হাতের র‍্যাকেটটা ফেলে দিয়ে বারতিনেক হোঁচট খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত মাটিতে হাঁটু গেড়ে পড়ল। হাতে লেগেছিল সতীনের, হাঁটুতেও।

রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে বন্ধুরা হাসতে লাগল।

মানিক হেসে বলল, "সতু, এটা হেদো নয়, মাটিতে শালা ডাইভ্ মারছ।"

ততক্ষণে সতীন উঠে দাঁড়িয়েছে। হাঁটুর চোটের জন্যে সোজা হতে পারছিল না। জোরে লেগেছে। হাতের ধুলো ঝাড়ার সময় সতীন দেখল, ফুটপাথের সঙ্গে ঘষে গিয়ে লাল হয়ে গিয়েছে হাতের চেটোর খানিকটা। জ্বালা করছে।

উমানাথ বলল, "কি রে, লেগেছে ?"

সতীন সামান্য খোঁড়াতে খোঁড়াতে পাশে সরে এল। ফুটপাত থেকে র‍্যাকেট কুড়িয়ে নিয়ে তারক আর মানিক খেলতে লাগল।

এটা বাস্তবিক কোনো খেলা নয়, মাঝে মাঝে এই রকমই হয়, ফুটপাথের ওপর হঠাৎ শখের ক্রিকেট শুরু হয়ে যায়, ছোটদের কাছ থেকে র‍্যাকেট চেয়ে কিছুক্ষণ ব্যাডমিণ্টন চলে। রাস্তার লোক বিরক্ত হয়ে অন্য পাশ ধরে চলে যায়, গাড়িটাড়ি সামান্য সাবধান হয়ে যায় কাছাকাছি এসে।

সতীন প্যাণ্ট গুটিয়ে হাঁটুর অবস্থাটা দেখতে চাইল, পারল না। পায়ের ঘের বড় ছোট। নিজেকেই যেন একটা গালাগালি দিল সতীন।

হঠাৎ উমানাথ বলল, "এই, দিদি—!"

তাকাল সতীন। শীতের বিকেল আগেই মরে গেছে। রাস্তায় আলো জ্বলে উঠল বলে। দোকানে বাতি জ্বলতে শুরু করেছে। বাস, লরি, ট্যাক্সির ধুলোয় কেমন ঘোলাটে হয়ে আছে চারপাশ, ঝাপসা অন্ধকার দেখতে দেখতে ছড়িয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই ধোঁয়া জমতে শুরু করবে।

দিদিকে দেখতে পেল সতীন। দিদি আর জামাইবাবু। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, মাত্র ক'দিন আগেই সে দিদিকে স্বপ্ন দেখেছে। তার স্বপ্নের টানে দিদি এসেছে—এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। প্রায় মাসখানেক দিদি আসে নি এ-বাড়িতে, কাজেই সে যে কোনো দিন আসতে পারত, তার আসার সময় হয়ে গিয়েছে। জামাইবাবুকে দেখেই বরং সতীন সামান্য অবাক হল। দিদি প্রায় এলেও জামাইবাবু আজকাল ঘন ঘন আসে না।

সতীন দেখল, দিদি ইশারায় তাকে ডাকছে।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলল সতীন।

কাছাকাছি এলে দিদি বলল, "তোর পায়ে কী হয়েছে রে ?"

সতীন বলল, "কিছু না ; হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম।"

আশুতোষ অর্থাৎ জামাইবাবু বললেন, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হোঁচট

খাচ্ছ নাকি হে ?"

"না, খেলছিলাম।"

"খেলার আর জায়গা পেলি না···" দিদি ধমকের গলায় যেন বলল, "রাস্তায় মানুষ খেলে ?"

সতীন কিছু বলল না। দিদির পাশে পাশে চলতে লাগল।

সামান্য এগিয়ে দিদি জিজ্ঞেস করল, "বাবা কেমন আছে রে ?"

"এখন ভালই মনে হয়।"

"খাওয়া-দাওয়া করতে পারছে ?"

"খায় তো—", সতীন ছোট করে বলল।

দিদি যেন সামান্য অবাক হয়ে মুখ দেখল সতীনের। তার এই সংক্ষিপ্ত, অনিশ্চিত জবাব থেকে মনে হল, সতীন ব্যাপারটার খোঁজখবর নেয় না।

আশুতোষ বললেন, "রথীন এখুনি ফিরবে না ?"

"আর একটু পরে।"

দিদি বড়দার ছোট, বছর দুয়েকের। কিন্তু বয়েসে জামাইবাবু বড়দার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়। সম্পর্কে ছোট হলেও জামাইবাবু বড়দাকে নাম ধরেই ডাকে, বড়দাও ডাকে আশু বলে। এক সময়ে দুজনের মধ্যে খুবই ভাব ছিল। সে গোড়ার দিকের কথা। তারপর আর তত গলায় গলায় ভাব নেই। তবু দুজনের মধ্যে সদ্ভাব রয়েছে খানিকটা এখনও। বড়দা যে কোনো কারণেই হোক দিদিকে আজও খাতির না করে পারে না। হয়ত ঠিক পরের বোন বলেই ভালবাসে, বা হতে পারে দিদির কটকটে কথা বলার জন্যে সমীহ করতে হয়। দিদির এখনও আধিপত্য আছে বাপের বাড়িতে, তার মতামত, পরামর্শ সরাসরি অবজ্ঞা করার সাহস কারও অন্তত এখন পর্যন্ত হয় নি। সেদিক থেকে দিদির ব্যক্তিত্ব আছে।

দিদিকে দেখতে ভালই লাগে। বড়দার মতন গড়ন খানিকটা। গোল মুখ, গায়ের রঙ ফরসা। দিদি এখন বয়েসে আরও মোটাসোটা গোলগাল হয়ে গেছে। তবে বউদির মতন নয়। বউদি দিন-দিন

হাতি হয়ে যাচ্ছে; আর দিদি মোটা হলেও তাকে একেবারে গিন্নী-বান্নীর মতন দেখায়।

বাড়ির দরজায় এসে দিদি বলল, "তুই এখন বেরোস না আবার। কাজ আছে।"

দিদি এলেই বাড়িতে সামান্য চাঞ্চল্য আসে। কাজল দিদির পায়ে পায়ে ঘোরে, বউদি সমীহ করার জন্যে ব্যস্ত হয়। বুলু-মণিরাও চেঁচামেচি জুড়ে দেয় বড় পিসীকে দেখে। আর বাবা ঘন ঘন ডেকে পাঠায় দিদিকে। আজ আবার জামাইবাবু সঙ্গে রয়েছে। কথায়-বার্তায় মানুষটা মজাদার ধরনের।

দিদি কোথা থেকে বাবার জন্যে দৈব ওষুধ এনেছে; অনেক কষ্ট করে হুজ্জত করে। প্রথমে বাবাকে তারপর বউদিকে সে বৃত্তান্ত শোনাতে লাগল।

জামাইবাবু কিছুক্ষণ শ্বশুরের কাছে বসে থেকে খবরাখবর নিলেন শরীরের, তারপর নীচে নেমে এসে মেজদার ঘরে বসলেন।

বড়দা এল। সামান্য পরে মেজদাও ফিরে এল।

দিদি বাবার কাছে অনেকক্ষণ বসে ছিল। কথাবার্তা একতরফাই বলে গেছে প্রায়। অসুখ-বিসুখ, সংসারের খুঁটিনাটি, নিজের দুই ছেলের পড়াশোনা পরীক্ষার খবর শুনিয়ে শেষে নীচে নেমে এল।

সতীনের এই সময়টা বাড়ি থাকার কথা নয়। দিদির কথায় থাকতে হল। ওরই মধ্যে এক সময় বউদির হুকুমে পাড়ার মিষ্টির দোকান থেকেও ঘুরে এল সে।

নিজের ঘরেই ছিল সতীন, কাজল এসে বলল, "দিদি তোমায় ডাকছে।"

মেজদার ঘরেই সকলে ছিল: দিদি, জামাইবাবু, বড়দা, মেজদা। বউদি মাঝে মাঝে ঘরে এসে দাঁড়াচ্ছিল, আবার চলে যাচ্ছিল রান্নাঘরে।

সতীন মেজদার ঘরে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল।

মেজদা দিদিকে বলছিল, "তুমি বলছ বল; কিন্তু এ-সব আমি

বিশ্বাস করি না।"

দিদি বলল, "তুই বিশ্বাস না করলেই বা, শ'য়ে শ'য়ে লোক বিশ্বাস করছে। একবার গিয়ে দেখে আয়—শনি-মঙ্গলবারে কত লোক গিয়ে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে। আমার বড় ভাশুরঝির ননদ একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছিল। কালীবাবার ওষুধ খেয়ে এখন সে একেবারে সুস্থ মানুষ। তোর জামাইবাবুকে জিজ্ঞেস কর্। এই পুজোর ছুটিতে সেই মেয়ে হরিদ্বার-টরিদ্বার ঘুরে এল জামাইয়ের সঙ্গে।" দিদি জামাইবাবুর দিকে তাকাল, যেন তার কথাটার সত্য-মিথ্যের সাক্ষী যে সশরীরে হাজির তা বুঝিয়ে দিল।

মহীন মাথা নাড়ল। জামাইবাবুর সাক্ষী সে চায় না। বলল, "তোমাদের কালীবাবা, তারা মা, অমুক স্বামী তমুক স্বামী এ-সব আমি বিশ্বাস করি না। তুমি যদি বল এটা একটা মনের সান্ত্বনা তোমাদের—আমি আপত্তি করব না। কিন্তু ক্যানসার রুগীর গলায় মাটি আর তেল মাখিয়ে রোগ সারানো যায়—এই গাঁজাখুরি ব্যাপার তুমি আমায় বিশ্বাস করতে বোলো না।"

রথীন মহীনের কথা শুনতে শুনতে কেমন বিরক্ত চোখে বলল, "তুমি বিশ্বাস করো না বুঝলাম। কথাটা হল, বাবার চিকিৎসা। সেটাই বড় কথা। হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেণ্ট যেমন চলছে চলুক, তার ওপর মায়া যা বলছে—ওই মাটি আর তেল সেটা বাবার গলার ওপর-ওপর মাখাতে ক্ষতি কিসের?"

মহীন বলল, "বললাম তো, তোমাদের মনের সান্ত্বনার জন্যে যা খুশি মাখাতে পার, তবে তাকে ট্রিটমেণ্ট বোলো না।"

রথীন গম্ভীর মুখে বলল, "তুমি যতটা তুচ্ছ করছ—অতটা তুচ্ছ করার ব্যাপার এটা নয়। আমিও শুনেছি দু-চারটে মিরাক্যাল ঘটেছে।"

মায়ালতা বলল, "কত বড় বড় রোগ সেরে গেছে দাদা, তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে। তিরিশ বছরের হাঁপানি সেরেছে কসবার এক ভদ্রলোকের, তোমার ভগ্নীপতির অফিসে কাজ করে একজন, তার

বাবার উদরী সেরেছে। কে যেন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল শুনলাম, বিয়ের পর পর, তার চোখ সেরে গেল। এত লোক তো আর চাল ভাজতে গিয়ে কালীবাবার কাছে রোজ রোজ বসে থাকে না— ?”

মহীন রাগ করল না, বলল, “তোমরা যখন ঠিকই করেছ দৈব করবে করো—আমায় জিজ্ঞেস করছ কেন ?”

“বা, তোমায় করব না ! বাবা তোমারও,” রথীন বলল।

মহীন হঠাৎ হাত তুলে সতীনকে দেখাল। বলল, “বাবা সতীনেরও, কাজলেরও। তা হলে ওদেরও বল।”

রথীন এরকম আশা করে নি। সতীনের দিকে তাকিয়ে দেখল এক পলক। চোখমুখ আরও গম্ভীর হয়ে গেল। যেন নিজেকে অপমানিত বোধ করল।

আশুতোষ বোধ হয় কিছু আঁচ করতে পারছিলেন। শ্বশুরবাড়ির সকলকেই তিনি ভাল করে বোঝেন। রথীন আর মহীনের সম্পর্কটা তাঁর অজানা নয়। কোনো রকম বিসদৃশ ঘটনা পাছে ঘটে যায় তাই অবস্থাটা সামলে নেবার জন্যে তিনি মজার গলায় বললেন, “ওগো মেজোবাবু, তুমি সব বোঝো, একটা জিনিস বোঝো না। কথায় বলে সাপের বিষ মাথায় উঠলে ওঝাকেও ভূতে পায়। ডাক্তার-বদ্যি হার মানলে মানুষ ভগবানকে ডাকে। ডাক্তার বেটারাও। কালী বাবার মাটি আর তেল কাজে লাগুক আর না লাগুক—কিছুই যখন করার নেই—তোমার দিদির এই আবদারটুকু মেনে নাও না বাপু।”

মহীন বলল, “কী আশ্চর্য, আমি কি না বলেছি ? আমি শুধু বলছিলাম এই সব গাঁজাখুরি আমি বিশ্বাস করি না।”

মায়ালতা মেজো ভাইকে ধমকের গলায় বলল, “তোকে করতে হবে না। আমরা করি।”

মহীন হেসে ফেলে বলল, “করো।”

মায়ালতা সতীনের দিকে তাকিয়ে কাছে আসতে বলল। তারপর রথীনের দিকে তাকাল। বলল, “শোন দাদা, কালীবাবার আশ্রমে আমি তিন-চারবার ধরনা দিয়ে তবে ওই ওষুধ এনেছি। এখন এক

হপ্তা চলবে। মানে এই হপ্তাটা। তার পর থেকে সতু যাবে। ওই সোনারপুরে সাতসকালে গিয়ে শনিবার শনিবার ওষুধ আনা তো আমার হবে না। আমি যদি আনি—তাও আবার এখানে পাঠিয়ে দিতে হবে। তার চেয়ে সতু শনিবার শনিবার যাবে। ওষুধ নিয়ে আসবে। আমি বলে এসেছি। সেই ভাল।"

মহীন কিছু বলল না, অন্যদিকে তাকিয়ে থাকল।

রথীন বলল, "সতুই যাবে। ওর আর কাজ কী?"

সতীনের কানে কথাটা ভাল লাগল না। বড়দার কথার মধ্যে কেমন যেন এক অবজ্ঞা। যেন বাড়িতে সে এমন একটা ফালতু লোক—যাকে দিয়ে সব কিছুই করানো যায়। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।

হঠাৎ সতীন মেজদার ওপর একটা আলাদা টান অনুভব করল। কেন করল সে বুঝল না। বোধ হয় এইজন্যে যে মেজদা এইসব গাঁজা-গপ্পোর ব্যাপারে অবিশ্বাসী, এবং অবিশ্বাসী বলে তেল আর মাটি আনতে সতীনকে সোনারপুরে পাঠাতে তার কোনো গরজ নেই।

দিদি সতীনের দিকে তাকাল। "তুই সোনারপুর চিনিস তো?"

মাথা নাড়ল সতীন, চেনে না।

দিদি কিছুটা অবাক হয়ে বলল, "হাজার জায়গায় ঘুরে বেড়াস, সোনারপুর চিনিস না? শিয়ালদা স্টেশন থেকে যাবি। হপ্তায় একদিন। খুব সকাল সকাল যাবি, নয়ত ভিড় হয়ে যাবে, চার-পাঁচ ঘণ্টা বসে থাকতে হবে আশ্রমে গিয়ে।"

সতীন কোনো কথা বলল না। দাদাদের সামনে কথা বলার সাহস তার হল না, দিদি একলা থাকলে বলতে পারত।

বোধ হয় আর কিছু বলার নেই সতীনকে, দিদি বা দাদা চুপ করে রয়েছে—সতীন ভাবল, তার কাজ ফুরিয়ে গেছে। ভেবে সে ঘর ছেড়ে চলে আসছিল, বড়দার গলা শুনে আবার দাঁড়াল।

রথীন বলল, "আমায় কে বলছিল, সিংহীবাগানে এক সাধু আসেন—পাঞ্জাবী সাধু। এই শীতের সময়টায় আসেন। তাঁর এক

শিষ্য আছে, আমাদের অফিসেই কাজ করে, তারই বাড়িতে। সাধুকে ধরতে পারলে নাকি কাজ হয়।"

মায়ালতা বলল, "সেই সাধুকে তুমি আর পাচ্ছ কোথায়? ওসব দরকার নেই। অনিশ্চয় ব্যাপার। পাঞ্জাবীটাঞ্জাবীতে দরকার নেই, আমাদের বাঙালীই ভাল। যদি কিছু হয় কালীবাবার ওষুধেই হবে। আমার বাপু বড় বিশ্বাস, ক'জনের বেলায় দেখলাম তো।"

মহীন হেসে উঠে বলল, "দিদি, তুমি কালীবাবার যা পাবলিসিটি করছ—তাতে কিছু ইনকাম হওয়া দরকার। রুগী পিছু দশ-বিশ টাকা নিতে পার।"

মায়ালতা বলল, "আমার ইনকামে দরকার নেই। তোদের দোষ কি জানিস—সব কিছুকেই ছ্যা-ছ্যা করিস। সাদামাটা জিনিস হলে বিশ্বাস করতে চাস না। তোরা ভাবিস, তোরাই সবজান্তা।"

"এই রে, তুমি চটে উঠছ", মহীন রগড় করে বলল, "তোমার রাগফাগ করে দরকার নেই। সোনারপুরের কালীবাবার জয় হোক।" বলে মহীন ফাজলামির ভঙ্গিতে দু হাত জড়ো করে উপরে তুলে কপালে ঠেকাল।

আশুতোষ হাসতে লাগলেন।

সতীন ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে থাকল।

সামান্য পরে আশুতোষ বললেন, "রথীন, তোমার বোন একটা কথা বলছিল। আমার আজকাল ঘন ঘন আসা হয় না এ-বাড়িতে। তোমরা সবাই আছ—ভাবছি কথাটা বলে নিই।"

রথীন তাকাল।

বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল সতীন। জামাইবাবুর গলা কানে যেতে সে দাঁড়িয়েই থাকল। বউদি রান্নাঘরে। বোধ হয় দিদি জামাইবাবু খাওয়া-দাওয়া সেরে যাবে বলে বউদি ব্যস্ত। কাজলও ওদিকে বউদির কাছে।

সামান্য চুপচাপ। তারপর আশুতোষ বললে, "আমি যা বলছি সেটা একেবারে সাংসারিক ব্যাপার। শুনতে তোমাদের ভাল লাগবে

না হয়ত, কিন্তু মানুষকে পাঁচরকম ভাবতেই হয়।" বলে আশুতোষ সামান্য চুপ করে তাঁর পোড়া চুরুটটা আবার ধরিয়ে নিলেন। বললেন, "শ্বশুরমশাইয়ের যা অসুখ তাতে আমরা কেউই নিশ্চিন্ত হতে পারি না। ওষুধবিষুধ, টোটকা—এতে কী হবে না-হবে সেটা ভুলে যাওয়া ভাল। যদি ভাল কিছু হয়—খুবই উত্তম, কিন্তু মন্দটাই মানুষ ভেবে নেয়। আমার মনে হয়, কর্তা বেঁচে থাকতে থাকতে তোমরা অন্ততঃ একটা কাজ সেরে রাখ। কাজলের বিয়েটা দিয়ে দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে কেউ জবাব দিল না। শেষে রথীন বলল, "বাড়িতে এরকম একটা টানা-হেঁচড়া চলছে আশু, এর মধ্যে বিয়ের কথা কে ভাববে ?"

মায়ালতা বলল, "বাবার কিন্তু বড় ইচ্ছে।"

"তোকে বলেছেন ?"

"প্রতিবারই বলে।"

রথীন অল্প চুপ করে থেকে বলল, "কই, আমায় তো তেমন করে কিছু বলেন না। এক-আধবার কথাটা তুলেছেন, তবে সেটা কথার কথা—।"

মায়ালতা বলল, "তোমায় আর কত বলবে বাবা, বলতে লজ্জা পায় হয়ত—ভাবে বাবার অসুখবিসুখ নিয়ে ঝঞ্ঝাটে রয়েছ, আবার বিয়ের কথা তুলে ব্যস্ত করবে··· !"

রথীন ঠাণ্ডা গলায় বলল, "বাবার ইচ্ছে হলেই কি বিয়ে হবে ? ছেলে কোথায় ? আমার হাতে কোনো ছেলে নেই। অফিসে ছেলে-ছোকরা যা দু-পাঁচটা দেখি—সব বাঁদর। দিন দিন সব বাঁদর উল্লুক হয়ে যাচ্ছে। ঘেন্না হয়। এই সব ছেলের সঙ্গে বোনের বিয়ে দেব —আমি ভাবতেই পারি না।"

মহীন হঠাৎ বলল, "দিন দিন তুমি যত বাঁদর হয়ে যেতে দেখছ ছেলেদের—এই রেটে যদি বাঁদর বাড়তে থাকে তাহলে তুমি তোমার মেয়ের বেলায় কী করবে ? মণির বিয়ের সময় তো বাঁদর ছাড়া কিছু থাকবে না আর !"

ভাইয়ের এই মারাত্মক টিপ্পনীতে রথীন হঠাৎ খেপে গেল। বলল, "আমার মেয়ের বেলায় আমি কী করব না-করব—সেটা আমার ব্যাপার, কাউকে তার জন্যে মাথা ঘামাতে হবে না।"

মহীন বলল, "মাথা ঘামাচ্ছি কোথায়! তুমি যা বলছ তার ভবিষ্যৎ একটা চেহারা বোঝাবার চেষ্টা করছি।"

আশুতোষ বাধা দিয়ে বললেন, "তোমরা আসল কথা ছেড়ে বাজে ব্যাপার নিয়ে চেঁচাতে লাগলে। কাজের কথাটা সেরে নাও, তারপর তর্ক করো।"

মায়ালতা বলল, "মহী, তুই বড় কথা বলিস। চুপ কর্ তো। তোর জামাইবাবু যা বলছে শোন্।"

আশুতোষ বললেন, "কাজলের বিয়ের কথাটা তোমরা ভাব।"

রথীন স্পষ্ট করেই বলল, "আমার ভাববার সময় নেই। তোমরা সংসারের যা কিছু আমার মাথায় চাপিয়ে দিতে চাও কেন? ছেলে দেখ, পছন্দ কর, টাকাপত্রের ব্যবস্থা কর—বিয়ে দাও; আমার কোনো আপত্তি নেই।"

"একটি ছেলে আমরা দেখেছি—," আশুতোষ বললেন, "ঠিক যে বিয়ের জন্যে দেখেছি তা নয়। ছেলেটিকে আমাদের ভালই লেগেছে। কথাবার্তা কিছু বলি নি; যদি তোমরা রাজী থাকো, কথা বলতে পারি। ছেলের বাবা নেই, মাও নেই। জ্যাঠামশাই তার গার্জেন।"

মহীন জিজ্ঞেস করল, "কী করে ছেলে?"

"এই বছরেই ডাক্তারী পাস করেছে, হাসপাতালে আছে এখন—মেডিকেল কলেজে।"

রথীন বলল, "ডাক্তার ছেলে? ও ছেলে ধরতে হলে এখন পঁচিশ-ত্রিশ হাজার বেরিয়ে যাবে।"

আশুতোষ বললেন, "আগে থেকেই ভয় পাচ্ছ কেন? টাকার কথা পরে। নাও তো লাগতে পারে।"

মাথা নেড়ে রথীন বলল, "তোমার কোনো জ্ঞান নেই, আশু। আমি বলছি, ডাক্তার ছেলে ধরতে হলে কম করেও পঁচিশ হাজার

ধরে রাখো।”

মায়ালতা হঠাৎ বলল, “বাবার কী একটা ছিল না—কাগজটাগজ—হাজার আট-দশ তাতে ছিল শুনেছি।”

রথীন যেন চমকে উঠল। তারপর বলল, “তুই কী শুনেছিস আমি জানি না। বাবার নামে একটা টাকা ছিল। সেটা এখনও আছে কিনা বলতে পারব না।” বলে রথীন উঠে পড়ল।

সতীনও আর দাঁড়াল না। তার ঘরের দিকে চলে গেল।

॥ বারো ॥

রথীন ঘুমোয় নি। তার জোড়াখাটের বিছানায় সে আর নন্দা শোয়। ছেলেমেয়ে যখন ছোট ছিল তখন এই বিছানাতেই কোনো রকমে চালিয়ে দিতে হত। তারপর একটা সরু গোছের তক্তপোশ জুটেছিল বিছানা চওড়া করার জন্যে। রথীন ব্যাপারটা পছন্দ করত না। তাদের ঘর লম্বাচওড়ায় এমন কিছু বড় নয়; আলমারি, দেরাজ, আয়না, খাট—আরও পাঁচরকম মিলিয়ে ঘরে পা ফেলার মতন বাড়তি জায়গা পাওয়া যেত না। রথীন বিরক্ত হত, খচখচ করত, নন্দার সঙ্গে মাঝে মাঝেই তার কথা কাটাকাটি চলত। নন্দা তার স্বামীকে বরাবরই সমীহ করে এসেছে। এক ধরনের আত্মসমর্পণ তার ছিল; স্বামীর ব্যক্তিত্ব ও মেজাজের কাছে বেচারী নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু এই বিছানা কিংবা শোওয়া-টোওয়া নিয়ে কথা উঠলে সে চটে যেত। ‘আমি কি বাপের বাড়ি থেকে ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম যে তুমি রোজ খচখচ করবে?’— নন্দা চটেমটে বলত। রথীন জবাবে বলত, ‘সঙ্গে আনো নি, কিন্তু ইয়েটা যে এনেছ তাতে পিলপিল করে ছানা-পোনা গজাতে পারে।’

স্বামী-স্ত্রীর এই ধরনের কথাবার্তার তেমন কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু বোঝা যেত, রথীন তার শোওয়া-বসায় আরাম চায়, আয়াস চায়। সে কোনো অংশীদার পছন্দ করে না। তাছাড়া ছেলেমেয়ে চিরকাল

ছোট থাকে না, অবুঝ অজ্ঞান বয়েসটা দেখতে দেখতে কেটে যায়। ছেলেমেয়েকে তখন গায়ের পাশে নিয়ে শোবার কোনো মানে হয় না। তাতে ভালর চেয়ে মন্দই হয় বেশী।

পাশের ছোট ঘরটা রথীন ছেলেমেয়ের নাম করে দখল করে নিল। কাজল চলে গেল নীচে। তখন থেকে মণিরা পাশের ঘরে শোয়, লেখাপড়া করে। অর্থাৎ ঘরটা তাদেরই হয়ে গেছে। রথীনের বিয়ের জোড়াখাট এখন শুধু তার আর নন্দার জন্যে।

নিত্যদিনের মতন ঘরসংসারের কাজ শেষ হবার পর নন্দা কলঘর ঘুরে একবার ছেলেমেয়ের ঘরে ঢুকেছিল, দরজা ভেজিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে এল। এসে দেখল রথীন ঘুমোয় নি।

রথীন ঘুমোয় নি দেখে নন্দা কেমন অস্বস্তি বোধ করল। সাধারণত রথীন ঘুমিয়ে পড়ে, কিংবা তন্দ্রার ঘোরে থাকে। যেদিন জেগে থাকে সেদিন নন্দার বুঝতে অসুবিধে হয় না স্বামী কেন জেগে আছে।

আজ স্বামীকে জেগে থাকতে দেখে নন্দা অস্বস্তি বোধ করল।

"ঘুমোও নি?" নন্দা ছোট করে বলল। বলে দরজা বন্ধ করল।

রথীন কোনো জবাব দিল না, স্ত্রীকে দেখল।

ঘরের জানলাগুলো দেখল নন্দা। শীত পড়ে গিয়েছে বেশ। পায়ের দিকের জানলার একটা পাট খোলা, পরদা রয়েছে।

শোবার আগে শাড়ি পাল্টানো নন্দার স্বভাব। নীচের জামাটাও সে খুলে রাখে শোবার আগে। শরীর, পিঠ, বুক এত ভারী হয়ে উঠছে দিনের পর দিন যে নীচের জামার শক্ত জাপটানো ভাবটা সে আর সহ্য করতে পারে না, বুক যেন টেনে ধরে, নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়। নীচের জামা খুলে শুধু ঢিলেঢালা ব্লাউজ পরে সে শোয়। সায়ার বাঁধন-টাঁধনও আলগা রাখে। ঢিলেঢালা হয়ে না শুলে তার ঘুমই আসে না।

নন্দা শাড়িটাড়ি পাল্টাতে লাগল।

রথীন কোনো কথা বলল না।

নন্দা একটু অবাক হল। এরকম হবার কথা নয়, রথীন যেদিন

জেগে থাকে সেদিন এই সময়টায় তার কিছু হাসিঠাট্টার কথা থাকে। মানে সেগুলো রথীনের প্রস্তাবনা, স্ত্রীকে শয্যায় গ্রহণ করার ভূমিকা।

নন্দা শোবার জন্যে তৈরী হল প্রায়। জল-মেশানো গ্লিসারিনের শিশিটা নিয়ে হাত-পায়ে মাখল। তার গায়ে মেদ কম নয়, তবু শীতের বাতাসে বড় চড়চড় করে চামড়া।

স্বামীর দিকে তাকিয়ে নন্দা হঠাৎ হাল্কা গলায় বলল, "আমার কিন্তু আজ শরীর খারাপ। সন্ধ্যে থেকে।"

রথীন উচ্চবাচ্য করল না। নন্দা আশা করেছিল, স্বামীর যা মেজাজ তাতে কিছু একটা বলবে। সামান্য অপেক্ষা করল নন্দা। তারপর বাতি নিবিয়ে বিছানায় এল।

"কী হয়েছে গো?" নন্দা জিজ্ঞেস করল বালিশে মাথা রেখে।

একটু চুপচাপ, তারপর রথীন বলল, "কী হয়েছে তুমি জান না? আমায় জিজ্ঞেস করছ?"

নন্দা বুঝতে পারল না। বলল, "কই, আমি তো কিছু জানি না।"

"তুমি একটা মুখ্যু। মেয়েছেলে এত মুখ্যু হয় জানতাম না। কেন, তোমার বড় ননদের মুখে শোন নি?"

"ওষুধের কথা?" নন্দা অবাক হচ্ছিল, মায়ালতার কাছে শুনেছে বইকি কালীবাবার ওষুধের কথা। কিন্তু তাতে কি?

রথীন রেগে উঠে বলল, "নিকুচি করেছে তোমার ওষুধ! তুমি সত্যিই একটা হোপলেস। সংসারের হেঁসেল ঠেলা ছাড়া কিছু বোঝ না। কেন যে ভগবান তোমায় আমার গলায় ঝুলিয়েছিলেন।"

নন্দা বুঝতে পারল না, সারাদিন কাজকর্মের পর রাত্রে স্বামীর পাশে শুতে এসে এই গালাগালটা তার প্রাপ্য হল কেন? বুঝতে না পেরে সেও বিরক্ত হল—চটে উঠল।

রাগের গলায় নন্দা বলল, "ভগবানের ঘাট হয়েছে; আমার মা-বাবারও। তারা তো বুঝতে পারে নি কোন্ মানুষের হাতে মেয়ে দিচ্ছে।"

"রাখ রাখ, ও আমি অনেক শুনেছি।" রথীন যেন ধমক দিয়েই স্ত্রীর অভিমান ভেঙে দিতে চাইল। মুহূর্ত কয় থেমে বলল, "তোমার ছোট ননদের বিয়ের কথা শুনলে ?"

নন্দা এতক্ষণে স্বামীর কথা ধরতে পারল। কিন্তু বিছানায় আসতে না আসতেই যে ধরনের ব্যবহার সে স্বামীর কাছে পেয়েছে তাতে সে ক্ষুব্ধ হয়ে ছিল। রথীনের কথার কোনো জবাব দিল না নন্দা। না দিয়ে গায়ের ঢাকা বুকের ওপর গলা পর্যন্ত তুলে দিল।

রথীন বলল, "বাবাকেও বোধ হয় নাচিয়ে গিয়েছে মায়া।" গলার স্বরে প্রচণ্ড বিরক্তি রথীনের, যেন এই বিয়ের কথাবার্তা তাকে খেপিয়ে তুলেছে ভীষণ ভাবে।

নন্দা স্বামীর এই চাঞ্চল্যের কোনো কারণ বুঝতে পারছিল না। বাড়িতে আইবুড়ো মেয়ে থাকলে আত্মীয়স্বজন বিয়ের কথা তুলেই থাকে। তাতে দোষ কোথায় ? রাগ করবারও বা কি আছে ?

কিছুই বুঝতে পারল না নন্দা। আজ এতকাল বিয়ের পরও তার মাঝে মাঝে মনে হয়, এমন একজন মানুষের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে যে-মানুষের মনের অনেকটাই তার অজানা থাকল। নন্দা নিজে খুব সাধারণ, বাঙালী বাড়ির বেশীর ভাগ বউ যেমন হয়। সংসার, স্বামী, ছেলেমেয়ে—এর বেশী সে বোঝে না। রথীন আরও অনেক কিছু বোঝে। কী বোঝে তা অবশ্য নন্দা বলতে পারবে না। তবে স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে করতে সে বুঝতে পেরেছে রথীনের চোখে কিছু যেন ছকা রয়েছে, সেই ছকের কাছাকাছি পৌঁছবার জন্যে মানুষটা ধীরেসুস্থে কাজ করে যাচ্ছে।

"কি, কথা বলছ না যে ?" রথীন বলল।

নন্দা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমার কথা বলার দরকার কী।"

"তোমার এইসব ন্যাকামি শুনলে গা জ্বলে যায়—" রথীন রুক্ষ তিক্ত গলায় বলল। "কথা বলার দরকার কী মানে ? তুমি কি রাস্তার লোক ?"

নন্দা রাগের গলায় বলল, "রাস্তার লোক ছাড়া আর কি। দয়া

করে ঘরে এনে তুলেছ, বিছানায় শুতে দিয়েছ—এই না যথেষ্ট!"

"তোমার ভ্যানভ্যান বাদ দেও। যা বলছি শোন," রথীন গলার চড়া ভাবটা একটু কমাবার চেষ্টা করল। "আশু আর মায়া আজ একটা ঝঞ্ঝাট লাগিয়ে গেল, বুঝতে পারছ না?"

"না।"

"তোমার মাথায় কিচ্ছু নেই।···আরে একেবারে সহজ ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না?"

ব্যাপারটা কত সহজ নন্দা কেমন করে বুঝবে, সে বেচারী ব্যাপারটাই বুঝল না তো সহজ আর কঠিন!

রথীন বলল, "একটু ঘিলু খরচ করে ব্যাপারটা বোঝ। প্রথম কথা হল, বাবা নিজেও বুঝতে পারছে যাবার দিন এগিয়ে এসেছে। এই অবস্থায় মনে মনে বাবা চাইবে তার ছোট মেয়ের বিয়েটা হয়ে যাক। হাজার হোক মেয়ের বিয়ে একটা দায়িত্ব। সকলেই চায় দায়িত্ব মিটেছে দেখে যেতে। বাবাও চাইবে। এদিকে আশু আর মায়া মিলে বাবার কানে কথাটা তুলতে গেল। তার ওপর আবার ডাক্তার ছেলে। লোকে আজকাল ভাল পাত্র বলতে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বোঝে, আমাদের মতন গভর্ণমেণ্টের চাকরি বোঝে না। কাজেই এখন থেকে বাবা হাঁ করে বসে থাকবে—কবে সেই ডাক্তার পাত্রটিকে আমরা ধরতে পারি!"

বাধা দিয়ে নন্দা বলল, "তোমার বেশী বেশী ভাবনা। ছেলের কথা উঠলেই তো আর বিয়ে হয় না।"

"হয় না জানি। কিন্তু হয়ে যেতেও পারে। আশুকে তুমি চেন না। সে বড় নাছোড়বান্দা। এসব ব্যাপারে তার বুদ্ধি খেলে। তার ওপর মায়া—সেও বসে থাকার মেয়ে নয়।"

নন্দা দু মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "ধরেই নিলাম ওই ডাক্তার ছেলের সঙ্গে বিয়ের ঠিক হল। তাতে তোমার সুবিধের চেয়ে অসুবিধে কোথায়? কাজলের বিয়ে তো তোমাদের দিতেই হত। বাবা থাকতে থাকতে যদি বিয়েটা হয়ে যায়—তোমরাই তো বেঁচে যাবে।"

রথীন কথা বলল না কিছুক্ষণ। পরে বলল, "আর কে বাঁচবে আমি জানি না, আমি ডুবে যাব।"

"কেন?"

"টাকা। বিয়ের ধাক্কা সামলাবার মতন বাড়তি টাকা আমার কই?"

"বাঃ, তুমি একলা সামলাবে নাকি, ঠাকুরপো রয়েছে না?"

"তোমার ঠাকুরপোটি কম চালাক নয়।···সে কথা থাক্‌। আসল ব্যাপারটা কি জান! বাবার কিছু টাকা এদিকে ওদিকে ছিল। তা হাজার আষ্টেক মতন। টাকাটা—মানে সেই টাকাটা আমি নিয়েছিলাম। বাবাকে বলেই। ধার হিসাবেই নিয়েছিলাম বলতে পার। এখন বিয়ে লাগলে টাকাটা বের করে দিতে হবে। তার ওপর নিজের গাঁট থেকেও হাজার পাঁচ অন্তত। তা হলে আমি দাঁড়াচ্ছি কোথায়?"

নন্দা টাকার কথা জানত না। অন্ধকারেই স্বামীর মুখ দেখার চেষ্টা করল।

"তুমি অত টাকা নিলে কেন?"

রথীন হঠাৎ আবার চটে উঠল, বলল, "আমার পিণ্ডি চটকাব বলে। সত্যি, তুমি একেবারে গর্দভ। তোমার বাবা তো আমায় সম্পত্তি দিয়ে যায় নি যে লেক টাউনের জমিটা আমি কিনে ফেলব। ভেবেচিন্তে জমির টাকাটা যোগাড় করে রাখতে হয়েছে। এই তো আসছে হপ্তায় গিয়ে আমায় বায়না দিতে হবে। এখন কি করব? আমার মাথায় বাজ পড়ে গেছে।"

নন্দা চুপ। লেক টাউনের জমি, বাড়ি, নিজেদের সংসার সব যেন ভেঙে পড়তে লাগল।

॥ তেরো

প্রথমবার সতীন অবাক হয়েছিল। দ্বিতীয়বার তার ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। আর এই তৃতীয়বার সে কালীবাবার এক চেলার কাছে পাঁচ

টাকার একটা নোট ফেলে দেবার সময় লক্ষ্য করল, একটি মেয়ে হাত কয়েক তফাতে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকে দেখছে। সতীন কিছু বুঝতে পারল না। এভাবে তাকে কেন দেখছে ?

কালীবাবার প্রতিপত্তি সতীন এই তিনবারেই বুঝে ফেলেছে। দিদি খুব একটা বাড়িয়ে বলে নি। প্রথমবার সতীন বেশ সকাল-সকালই এসে পড়েছিল। স্টেশনে নেমেই রিকশা ধরল—পথঘাট চেনে না, রিকশাই ভাল। মাইলখানেক এসে কালীবাবার আশ্রম। অ্যাসবেসটাসের ছাদ দেওয়া বাড়ি কালীবাবার, বাড়ির গায়ে কালীমন্দির, ভাঙা লোহালক্কড়ের টুকরো, মরচে ধরা পুরনো টিন আর রাঙচিতের বেড়া দেওয়া বড় উঠোন। পাশে একটা এঁদো পুকুর। বাড়ির সামনে ময়লা আর ঘেঁষ ফেলে খানিকটা জমি ভরাট করা হয়েছে।

বেশ সকাল সকাল এসেও সতীন অন্তত জনা-দশ-বারোকে দেখতে পেল। বেশীর ভাগই বয়স্ক লোক। মেয়েরাও রয়েছে, বুড়ীটুড়ি গোছের। ওষুধের সঙ্গে কালীবাবা একটা কাগজ দিয়ে দেন। কাগজের মাথায় রবার স্ট্যাম্পে কালীবাবার আশ্রমের নাম ঠিকানা, তলায় হাতে লেখা রোগীর নাম। নামের তলায় কিসের একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন। বোঝা যায় না।

সতীন কাগজ দিতেই কলাপাতায় মোড়া মাটি আর ছোট শিশিতে তেল পেয়ে গেল। ততক্ষণে রিকশায় চড়ে লোক আসছে, পায়ে হেঁটেও আসতে শুরু করেছে। কালীবাবাকে প্রথম দিন দেখতেই পেল না সতীন। ফেরার সময় একটা ছ্যাকড়া ধরনের মটর গাড়িকেও আশ্রমে আসতে দেখল সতীন।

দ্বিতীয়বার আসতে বেলা হয়ে গিয়েছিল সতীনের। স্টেশন থেকে হেঁটেই এসেছিল—রিকশাভাড়া বাঁচিয়ে ছিল। চড়া শীতের মধ্যে রোদে হাঁটতে হাঁটতে সে এই মফস্বলের রাস্তাঘাট গাছপালা পুকুর মানুষজন দেখতে দেখতেই এসেছিল। কিন্তু কালীবাবার আশ্রমে পৌঁছে দেখল—ভীষণ ভিড়। কিসের একটা ভাল তিথি ছিল সেদিন। কালীমন্দির খোলা, স্বয়ং কালীবাবা পুজোয় বসেছেন, লোকে দালানের মধ্যে

ভিড় করে দাঁড়িয়ে, মেয়েরা অনেকেই সামনের দিকে বসে পড়েছে মাটিতে। সতীন একবার কালীবাবার চেহারাটা দেখে নিল। মাথায় জটা, মুখে দাড়ি, ফরসা ছিপছিপে চেহারা, পরনে গরদ ধরনের কাপড়, গায়ে লাল উড়নী, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, লম্বা পইতে ঝুলছে বুকে। লোকটাকে দেখে সতীনের মনে হল, তান্ত্রিক-টান্ত্রিক হতে পারে।

ওষুধ পেতে সেদিন সতীনকে কম করেও ঘণ্টা আড়াই বসে থাকতে হয়েছিল। চটে গিয়েছিল সতীন। কলকাতায় ফিরতে তার দুপুর হয়ে যাবে। সারা সকালটা তো গেলই, এরপর দুপুরটাও যাবে, স্নান নেই খাওয়া নেই। এ এক আচ্ছা ফ্যাসাদ জুটিয়ে দিল দিদি। এইভাবে প্রতি হপ্তায় আসো আর যাও, কোথাকার কোন্ পুকুরের মাটি আর খানিকটা রেড়ির তেল বয়ে নিয়ে যাও, বিজনেসটা ভালই জমিয়েছে কালীবাবা। শালা, এই রকম একটা ব্যবসা লাগাতে পারলেও সতীন বর্তে যেত।

তৃতীয়বার সতীন ওষুধ নেবার সময় যে মেয়েটিকে দেখল, ভাবল মাথায় ছিটটিট আ.ছ কিনা—সেই মেয়েটিকেই আবার স্টেশনে দেখতে পাবে সতীন ভাবে নি।

স্টেশনে এসে চা খেয়ে সতীন সিগারেট ফুঁকছে, শেয়ালদার গাড়ির তখনও খানিকটা দেরি, হঠাৎ মেয়েটিকে নজরে পড়ল।

প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াতেই মেয়েটির সঙ্গে চোখাচুখি। বার কয়েক চোখাচুখি হবার পর মেয়েটি আচমকা যেন হাসি-হাসি মুখ করল।

সতীন রীতিমত বোকার মতন তাকিয়ে থাকল। চোখ নামাল আবার তাকাল। মেয়েটি তাকে দেখছে। মুখ ফিরিয়ে নিল সতীন। কৌতূহলবশে আবার যখন মুখ ফেরাল তখন দেখল, মেয়েটি চোখের ইশারায় সামান্য মাথা হেলিয়ে তাকে ডাকছে।

যাব না যাব না করেও শেষ পর্যন্ত সতীন এগিয়ে গেল।

কাছে এসে দাঁড়াবার সামান্য পরে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, "চিনতে পারছ ?"

সতীন চিনতে পারল না। অচেনা মেয়ে, যদিও বয়েসে সামান্য

বড়ই হবে, তবু তাকে 'তুমি' করে কথা বলছে দেখে সতীন অবাক হচ্ছিল।

মাথা নাড়ল সতীন, চিনতে পারছে না।

মেয়েটি কেমন করে যেন লক্ষ্য করল সতীনকে, বলল, "পারছ না? তুমি দিলীপের বন্ধু না?"

সতীন আবার চোখে চোখে তাকাল। ছু মুহূর্ত, যেন সামলে নিল নিজেকে। কোন্ দিলীপ? দিলীপ দত্ত, না দিলীপ চক্রবর্তী?

"আমি দিলীপের দিদি, কৃষ্ণা।" বলে গায়ের চাদরটা আরও ঘন করে গায়ে জড়িয়ে নিল মেয়েটি। "আমি তোমাকে আমাদের বাড়িতে দেখেছি, অনেকবার দেখেছি। রাজবল্লভ পাড়ায়।"

সতীন সঙ্গে সঙ্গে দিলীপকে মনে করতে পারল, দিলীপ চক্রবর্তী, বন্ধুরা বলত—দিলু। দিলীপ আর সতীন স্কুলে পড়েছে, শেষের ছু ক্লাস। কলেজে দিলীপ অনার্স নিয়ে পড়তে শুরু করেছিল বাংলায়। লেখা-পড়ায় মন্দ ছিল না দিলু। কলেজে পড়ার সময়ও মাঝে মাঝেই তারা হইহুল্লোড় করে বেড়িয়েছে, কখনো-সখনো দিলুর বাড়ি গিয়েছে। বন্ধুত্বটা একটু একটু করে ফিকে হয়ে এলেও কদাচিৎ দেখা হয়ে গেলে ছুজনে গল্প করত, চা খেত একসঙ্গে বসে। শেষে আর যোগাযোগ থাকে নি। তবু সতীন শুনেছিল, দিলুর মাথার গোলমাল হয়েছে।

সতীন এতক্ষণে যেন নিজেকে মোটামুটি স্বাভাবিক বোধ করতে পারল। বলল, "দিলু কেমন আছে?"

কৃষ্ণা একটু চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "মারা গেছে।"

"মারা গেছে—!" সতীন প্রায় চমকে উঠে কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকাল।

কৃষ্ণা প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে তাকিয়ে আছে। ওদিক দিয়েই গাড়ি আসবে শেয়ালদার। প্ল্যাটফর্মে লোকের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। সতীনের গায়ের কাছে জন-ছুই ফেরিঅলা।

সতীন কেমন যেন অপরাধী বোধ করল নিজেকে। মনে হল, দিলু মারা গেছে এ খবর তার জানা উচিত ছিল। কিন্তু কেমন করে সে

জানবে ? শেষের দিকে দেখা হত না, দুজনের আলাদা দুই কলেজ, মাঝের যারা বন্ধুটন্ধু ছিল তারাও একে একে বেপাত্তা হয়ে গেল। কোনো খোঁজখবর আর রাখা হল না। সত্যি এই কলকাতা এক আজব জায়গা, বিশ-পঁচিশ-ত্রিশটা পয়সা খরচ করলে মানুষ এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত চলে যেতে পারে, কিন্তু এ-পাড়া ও-পাড়ার বন্ধুও কে যে কবে কোথায় চলে যাচ্ছে—তার খোঁজখবর করা হয় না।

সতীন অপরাধীর মতন নিচু গলায় বলল, "হঠাৎ মারা গেল! কী হয়েছিল ?"

কৃষ্ণা প্রথমে তাকাল না, পরে তার আশপাশ দেখল। ভিড় তার পছন্দ হল না। ইশারায় সতীনকে ডেকে নিয়ে সামান্য ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। বলল, "ওর তো মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। হাস-পাতালে রাখবার চেষ্টা করেছিলাম, থাকতে চাইত না। বার-দুই রাখলাম। আবার নিয়ে এলাম। মার জন্যে রাখা যেত না।" বলতে বলতে একটু থামল কৃষ্ণা, যেন ভাইয়ের স্মৃতি তাকে হঠাৎ চুপ করিয়ে দিল। সামান্য পরে বলল, "বাড়িতেই থাকত, মাঝে মাঝে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াত। একদিন কোথায় যাচ্ছিল জানি না, বাস চাপা পড়ে মারা গেল।"

সতীন জিবের শব্দ করে উঠল, চোখমুখ বিকৃত হয়ে উঠল তার, যেন এই দুঃসংবাদ তাকে ভীষণ ভাবে শিহরিত করল।

কৃষ্ণা বলল, "রাস্তাঘাটে পাগল ঘুরে বেড়ালে বাসঅলা আর কী করবে!"

সতীন কথা বলতে পারল না। হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক, উদাস হয়ে গেল। দিলীপ যে আস্তে আস্তে পাগল হয়ে যাচ্ছে এটা বোঝা যেত। তার চোখ বড় বেশী ঝকঝক করত, কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল চোখের জমি, মাথার চুলে তেল-জল পড়ত না, হাতে বড় বড় নখ রাখত। একদিন বলেছিল, সে সারা কলকাতা ঘুরে দেখেছে সাতশো আটা-নব্বইটা গলি আছে, সত্তর হাজার লোক ফুটপাথে শুয়ে থাকে।

নিঃশ্বাস ফেলল সতীন বড় করে।

কৃষ্ণা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "তুমি ওই আশ্রমে কার ওষুধ নিতে এসেছিলে ?"

"বাবার।"

"কী হয়েছে ?"

"কেউ ঠিক বলতে পারছে না। সন্দেহ করছে ক্যানসার।"

"ক্যানসার ? কোথায় ?"

"গলায়-টলায়।"

কৃষ্ণা তাকিয়ে তাকিয়ে সতীনকে দেখতে লাগল। পরে শুধালো, "এই ওষুধে কিছু হয় ?"

মাথা নাড়ল সতীন। "কে জানে। আমার দিদির বিশ্বাস, হয়। দিদিই এই ঝামেলা বাধিয়েছে। বাবার শরীর গত হপ্তায় খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল।"

"অন্য কোন চিকিৎসা করাও না ?"

"আগে করানো হয়েছে। এখন বাবা একজন বড় হোমিওপ্যাথের ওষুধ খায়।"

আর কথা বলা গেল না। ট্রেন এসে পড়েছে।

কৃষ্ণাই যেন সতীনকে টেনে নিয়ে গাড়িতে উঠল। জায়গা পেল না সতীন। কৃষ্ণা কোনো রকমে বসতে পারল।

শিয়ালদা পর্যন্ত আর কোনো কথা হল না। মাঝে মাঝে দু'জনের মধ্যে শুধু চোখাচুখি হচ্ছিল।

শিয়ালদা সাউথে নেমে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে আসতে আসতে কৃষ্ণা বলল, "তুমি সোজা বাড়ি যাবে ?"

"হ্যাঁ।" সতীন বলল।

"খুব তাড়া ?" বলেই কৃষ্ণা ঘাড় ফেরাল। পেছন থেকে কে যেন তার গায়ে এসে পড়েছিল, গ্রাহ্য করল না, পাশ কাটিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে লোকটা চলে গেল। বিরক্ত বোধ করেছিল কৃষ্ণা, শব্দও করল বিরক্তির।

"এই ভিড় দেখলেই আমার মাথা কেমন করে," কৃষ্ণা বলল, বলেই

যেন ক্রমশ ভিড় থেকে সরে যাবার চেষ্টা করতে লাগল।

ভিড় যথেষ্ট। হনহন করে লোক ছুটছে। পেছন থেকে যেন তাড়া করেছে কেউ। একটি বউ বোধ হয় হাসপাতালে যাবে, এক দিকের চোখ-কপাল জুড়ে ব্যাণ্ডেজ, ধীরে ধীরে হাঁটছে, পাশে এক ভদ্রলোক।

প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে কৃষ্ণা বলল, "এখানে কোথাও একটু বসি। জলতেষ্টা পাচ্ছে।"

সতীন কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকাল। সে স্পষ্ট করে কিছু বুঝল না, কিন্তু কৃষ্ণার চোখমুখ দেখে মনে হল, কোনো রকম অস্বস্তি কিংবা অসুস্থতা বোধ করছে কৃষ্ণা।

"বসবেন ?"

"বড্ড মাথা ঘুরছে।"

কী বলবে সতীন বুঝতে পারল না, সামান্য যেন ঘাবড়ে গেল।

কৃষ্ণা নিজেই বলল, "আমার এ-রকম হয়, মাথা ঘুরে যায়, ভীষণ টনটন করে, তাকাতেও আর ইচ্ছে করে না। বমি-বমিও লাগে। ওষুধ আছে সঙ্গে, খেয়ে নোব।"

সতীন বলল, "চায়ের স্টলে চলুন। জল পাবেন।"

"চলো।"

কৃষ্ণা শিয়ালদা স্টেশন ভালই চেনে। সতীনকে ডেকে নিয়ে মেইন প্ল্যাটফর্মে এল, তারপর সোজা রিফ্রেশমেণ্ট রুমে।

বসল দুজনে। বেশীর ভাগ টেবিলই খালি। এক দিকে দুই ভদ্রলোক খাচ্ছিলেন। অন্য দিকে স্বামী-স্ত্রী বসে বসে কথা বলছে। টেবিলের পাশে সামান্য ক'টা জিনিস নামানো।

জল এসেছিল।

হাতব্যাগ খুলে কৃষ্ণা কিসের একটা ওষুধ বের করল। ছোট্ট ট্যাবলেট। খেয়ে ফেলল। জলের গ্লাস নামিয়ে রেখে মুখ-মাথা নীচু করে বসে থাকল সামান্য। চোখ ঢাকল হাতের পাতায়।

সতীন কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল। আচমকা তার খেয়াল হল,

দিলীপেরও মাথা ধরার বাতিক ছিল। কথায় কথায় পাশের দোকান থেকে মাথা ধরার ট্যাবলেট কিনে খেয়ে নিত। কৃষ্ণারও কি তাই! দিলীপ পাগল হয়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণাও কি পাগলটাগল হয়ে যাবে? যাঃ বাবা!

সামান্য পরে চোখের ওপর থেকে হাত সরাল কৃষ্ণা। মুখ তুলল। সতীন লক্ষ্য করে দেখল, কৃষ্ণার মুখ শুকনো দেখাচ্ছে। চোখের তলায় কালচে ভাব। ঘরের ছায়া-জড়ানো আলোয় সেই কালচে ভাব আরও কালো দেখাচ্ছিল, গভীর দেখাচ্ছিল। কোঁকড়ানো রুক্ষ চুল কৃষ্ণার, কপালের এক পাশে সামান্য দাগ।

চা আসার পর সতীন সামান্য সঙ্কোচ বোধ করে শেষ পর্যন্ত বলল, "কমেছে?"

"কমে যাবে," কৃষ্ণা বলল, "নাও, চা খাও।"

চা খেতে খেতে কৃষ্ণা সামান্য সুস্থ হয়ে উঠল। বলল, "এই রোগটা আমার পুরনো। ডাক্তাররা বলে মাইগ্রেন। এক এক সময় হয়, দু-তিনদিন একেবারে বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়।"

সতীন চায়ের ঢোঁক গিলে বলল, "আপনি এর জন্যে ওষুধ নিতে গিয়েছিলেন?"

"আমার জন্যে? না।"

সতীন তাকিয়ে থাকল। জানতে চাইছিল, তবে কার জন্যে ওষুধ?

কৃষ্ণা আরও দু-চুমুক চা খেল। তারপর সরাসরি তাকিয়ে বলল, "আমি তোমাদের এসব বিশ্বাস করি না। কোথাকার হলুদ পোড়া, মাটির গুঁড়ো, শেকড়ের কুচি—এতে যদি অসুখ সারত তবে লোকে আর রোগভোগে মরত না।"

"তাহলে আপনি ওখানে—?"

"মার জন্যে। মাও তো পাগল। বদ্ধ। খোকন—মানে দিলীপ মারা যাবার পর আরও পাগলামি বেড়েছে। সামলানোই যায় না। আমাদের এক মামা মা'র মাথায় এই দৈব ওষুধ ঢুকিয়েছে।"

"আপনি আগে আর আসেন নি? এই প্রথম?"

"আগে একবার এসেছিলাম।"

"আপনাকে দেখি নি। আমি এই নিয়ে তিনবার এলাম।"

কৃষ্ণা গলার কাছে হাত দিল। কেন দিল বোঝা গেল না। তার গলার ধরনটা সামান্য লম্বা। মোটামুটি সুগড়ন। বলল, "তুমি কোথায় চাকরি করছ?"

"চাকরি?" সতীন চোখে চোখে তাকাল কৃষ্ণার। খুব সরল প্রশ্ন। নিতান্তই যেন কথার কথা হিসেবে জানতে চাওয়া। সতীন ইতস্তত করে বলল, "চাকরি করি না।"

"ও! ব্যবসা করছ? আমি ভেবেছিলুম চাকরি।"

সতীনের রাগ হল না, ক্ষোভও নয়। বরং হাসি পেল। মাথা নেড়ে বলল, "না, ব্যবসাও করি না।"

কৃষ্ণাই যেন অবাক হল এবার। "ব্যবসা চাকরি কিছুই করো না?"

"না।"

একটু থেমে কৃষ্ণা হাসির মুখ করল। "বড়লোক বুঝি? অনেক টাকা-পয়সা আছে? কোথায় থাকো?"

"আমহার্স্ট স্ট্রীটের দিকে—", সতীন বাড়ির ঠিকানা, গলির নাম বলল। তারপর বিষণ্ণ করে হাসল, "আমরা মোটেই বড়লোক নই। দাদারা সকলেই চাকরি করে। নিজেদের একটা ছোট বাড়ি আছে, পুরনো।"

চা শেষ হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণার। সতীনকে খানিকটা কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল। ঠিক এতটা কৌতূহল নিয়ে আগেও যেন দেখে নি ওকে।

"চাকরি করো না কেন?" কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করল, খানিকটা যেন হালকা করেই।

সতীন ঠোঁটে হাসির ভাব করল। "পাই না।"

"পাও না! দাদারা তো চাকরি করেন, তাঁরা পারেন না?"

"না।...বড়দা সরকারী চাকরি করে, মেজদা কলেজে পড়ায়।

আমার পক্ষে সরকারী চাকরি হবার কোনো চান্স নেই। পরীক্ষাটরীক্ষা দিতে হয়, পাবলিক সার্ভিস কমিসন। দিই নি। পারব না। আমার দ্বারা হবে না।"

এমন অকপট আত্মপরিচয় যেন কৃষ্ণা শোনে নি আগে। হেসে ফেলল।

চায়ের দাম মেটাবার জন্যে ব্যাগ খুলল কৃষ্ণা। সতীন সলজ্জ ভাবে তাকাল। যেন দামটা সে নিজেই দিতে চায়। বলতে পারল না।

"তুমি চুপচাপ বসে আছ তাহলে ?"

মাথা হেলাল সতীন।

"কী চাকরি করতে পার ?" কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করল।

সতীন বুঝতে পারল না। দিলীপের দিদি কি তার সঙ্গে তামাশা করছে ? এমন ভাবে কথা বলছে যেন সতীন কোন্ ধরনের চাকরি চায় বললেই যেন উনি তা দিয়ে দেবেন !

"চল উঠি।" কৃষ্ণা বলল।

উঠে পড়ল দুজনে।

বাইরে এসে সতীন জিজ্ঞেস করল, "আপনার মাথা ঘোরা কমেছে ?"

"অনেকটা।"

রোদে এসে কৃষ্ণা একবার চারপাশে তাকাল। "তোমার নামটা যেন কী ?"

"সতীন।"

"আমায় একটা ট্যাক্সি ধরে দাও।"

"ট্যাক্সি ?"

"ওই দেখো—ফাঁকা, ওইটে ধরতে পার ?"

সতীন ট্যাক্সি ধরতে ছুটল। ছুটতে ছুটতে ভাবল, দিলীপের দিদির কি অনেক পয়সা ? তারা যখন দিলীপের বাড়ি যেত, দেখেছে —পুরনো বড় বাড়ি, সেকেলে। টাকাপয়সা কত আছে বোঝা যেত না। মনে হত সমৃদ্ধ। কেননা বাড়ির পুরনো চেহারাতেও আভিজাত্যের

একটা লক্ষণ ছিল। একরাশ পায়রা, বড় বড় ঘর, কিছু ঝাপসা লম্বাচওড়া ছবি, ফাঁকা ফাঁকা ভাব ছাড়া আর বিশেষ কিছু চোখে পড়ত না। সতীনরা শুনেছিল, দিলীপের দাদু কিংবা ঠাকুরদা কে যেন সেকালের নামজাদা লোক ছিল।

ট্যাক্সিটা সত্যিই পেয়ে গেল সতীন।

কৃষ্ণাকে ট্যাক্সিতে উঠিয়ে সতীন নীচে দাঁড়িয়ে থাকল।

"ও কি, তুমি এসো!" কৃষ্ণা ডাকল।

"আমি?"

"তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাব।"

ক'মুহূর্ত বোবার মতন দাঁড়িয়ে থেকে সতীন উঠল।

ট্যাক্সি চলতে শুরু করলে সতীন জানলার বাইরে তাকিয়ে দুজন ভিখিরী ধরনের লোককে দেখল।

কৃষ্ণাও প্রথমে কোনো কথা বলল না। সতীনও চুপচাপ। ঘুরপথে ট্যাক্সি শিয়ালদা কোর্টের কাছাকাছি এসে সার্কুলার রোড ধরল।

সতীনের কেমন যেন অন্য রকম লাগছিল। আজ পর্যন্ত সে অনাত্মীয়া কোনো মেয়ের পাশে ট্যাক্সিতে বসে নি। পাশাপাশি এইভাবে বসে থাকার কুণ্ঠা তাকে আড়ষ্ট করলেও, সতীনের এক এক সময় মনে হচ্ছিল সে যথেষ্ট সাবালক হয়ে গেছে।

কৃষ্ণা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোন্ ধরনের চাকরি চাও?"

রাস্তার দিকেই বরাবর তাকিয়ে ছিল সতীন, আচম্‌কা প্রশ্নে মুখ ঘুরিয়ে কৃষ্ণার দিকে তাকাল।

তাকিয়ে আছে কৃষ্ণা, সোজাসুজি; মুখে মোটেই হাসি-ঠাট্টার ভাব নেই; সত্যি-সত্যিই যেন সে জানতে চাইছে সতীন কোন্ ধরনের চাকরি চায়।

অবাক হলেও এই মুহূর্তে সতীন কথাটার গুরুত্ব দিল। বলল, "যে কোন একটা চাকরি হলেই হয়! কেরানীর।"

"কী পাস করেছ?"

"বি-কম।"

"আচ্ছা।"

কৃষ্ণা চোখ ফিরিয়ে নিল। রাস্তার দিকে তাকাল।

সতীন এই মেয়েটির—দিলীপের দিদির রহস্য বুঝতে পারছিল না। আশ্চর্য মেয়ে! তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, দিলীপের দিদি কোন চাকরি দিতে পারে। যারা পারে বলে মনে হয় তাদের অনেক ভাবেই ধরবার চেষ্টা করেছে সতীন। কিছু হয় নি। হবেও না। আর এই দিলীপের দিদি, নিজেও হয়তো যে চাকরি করে না সে তাকে চাকরি দেবে? মজা করছে নাকি সতীনকে নিয়ে? কেন, মজা করবে কেন? সতীন মজার পাত্র নয়। যেচে আলাপ করে এই মজা করার কারণ কি?

"সতীন", কৃষ্ণা আবার মুখ ফেরাল, তাকাল, "তুমি একদিন আমাদের বাড়িতে এস। কী, আসতে পারবে না?"

কিছু না ভেবেই মাথা হেলাল সতীন, "পারব।"

"বাড়িটা মনে আছে?"

"আছে, খুঁজে নেব।"

"কবে আসবে? আসছে হপ্তায় পারবে?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে বৃহস্পতি কিংবা শুক্রবার দিন এস। সন্ধ্যেবেলায়। সকালের দিকটায় প্রায়ই বেরিয়ে যাই।"

সতীন মাথা নাড়ল। তার মাথা নাড়ার ভঙ্গি কোনো কিছু স্পষ্ট করে বোঝায় না, যেন অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নেড়ে যাওয়া।

ট্যাক্সি রাজাবাজারের কাছাকাছি আসতেই সতীন বলল, "আমি এখানে নেমে পড়ি। বাঁ দিক দিয়ে চলে যাব।"

"কেন, এখানে নামবে কেন? তোমার বাড়ির কাছে নামিয়ে দিয়ে যাই।"

"কাছেই তো। আমি হেঁটে চলে যাব।"

"কি দরকার! ট্যাক্সিঅলাকে বল আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরতে। তোমায় নামিয়ে বিবেকানন্দ রোড ধরে আমি চলে যাব।"

সতীন ট্যাক্সিঅলাকে বাঁ-হাতি রাস্তা ধরতে বলল।

সামান্য চুপচাপ। দু-একটা সাধারণ কথা। তারপর ট্যাক্সি সতীনদের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেল।

"আমি এখানে নামব।"

"আচ্ছা।"

ট্যাক্সি বাঁধতে বলল সতীন।

রাস্তায় নেমে সতীন কিছু বলার আগেই কৃষ্ণা বলল, "বৃহস্পতি—না না, বৃহস্পতি নয়, শুক্রবার দিন আসছ। বাড়িতে নিচে যাকে দেখবে—বলে দিও আমার কাছে এসেছ। কোনো ভাবনা নেই।··· তুমি কি আমায় ফোন করতে পারবে? দরকার নেই। সে পরে হবে। আচ্ছা···।"

ট্যাক্সিটা চলে গেল।

সতীন কিছুক্ষণ হাঁ করে ট্যাক্সিটাকে দেখল। তারপর কেমন যেন বোকার মতন তাদের বাড়ির গলির দিকে এগুতে লাগল।

ব্যাপারটা কী যে ঘটে গেল সতীন নিজেও বুঝতে পারল না। বাবার ওষুধ আনতে কালীবাবার আশ্রমে গিয়ে দিলীপের দিদির সঙ্গে দেখা হবে, কে ভেবেছিল? আরও আশ্চর্যের কথা, দিলীপের দিদিকে সে আগে দেখলেও তার কিন্তু বিন্দুমাত্র মনে ছিল না ওঁকে। উনি নিজেই চিনলেন। কেমন করে চিনলেন? কেনই বা চিনলেন? দিলীপের গাড়ি চাপা পড়ে মারা যাবার কথা শোনাতে? যদি তাই হবে—তবে কেনই বা আলাপ করলেন, ভাব করলেন, চা খাইয়ে ট্যাক্সি করে পৌঁছে দিয়ে গেলেন? সতীন কোনো কেনরই সদুত্তর পাচ্ছিল না। সে এটাও বুঝতে পারছিল না—দিলীপের দিদি চাকরির কথাই বা তুলতে গেলেন কেন? উনি কি চাকরি দেবার ক্ষমতা রাখেন? সেটা কেমন করে সম্ভব? অথচ ওঁর কথা থেকে, ভাবভঙ্গি থেকে মনে হল, যেন সতীনকে একটা চাকরি উনি দিতেই পারেন।

সত্যি কী? সতীনের বিশ্বাস হল না। আবার পুরোপুরি অবিশ্বাস করবে সে রকম নিশ্চয়ও হতে পারল না। কিছু বলা যায় না, পাগলের

কাণ্ডও হতে পারে। দিলীপের দিদি হয়তো পাগলামি করে গেল।

বাড়িতে ঢোকার সময় সতীনের আর একটা ব্যাপারে খটকা লাগল। আচ্ছা দিলীপের দিদির তো বিয়ে হয় নি! কেন হয় নি? নাকি বিয়ে হয়েছিল—বিধবা হয়ে গেছে? চেহারায় কোথাও সধবা অথবা বিধবার ছাপ নেই। তাহলে? বিয়ে হয়তো হয় নি। এতটা বয়েস—তা অন্তত আঠাশ-ত্রিশ—এত বয়েসেও বিয়ে হবে না কেন? দেখতে তো খারাপ নয়! রঙ সামান্য ময়লা হলেও গড়ন ভাল, টানও আছে, ছিমছাম চেহারা, অনাড়ষ্ট। তবে? কে জানে, পাগলটাগল বলেই হয়তো বিয়ে হয় নি!

সতীন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত একটা পাগল মেয়ের পাল্লায় পড়েছিল নাকি সে?

॥ চোদ্দ ॥

মহীন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, হাতে আর সময় নেই। একটা ক্লাস শেষ করে সে বেরুল, এর পর টানা দুটো ঘণ্টাই তার অফ্। একেবারে শেষের দিকে সোয়া তিনটে নাগাদ তার শেষ ক্লাস। ক্লাসটা মহীন নিতে পারবে না আগেই জানিয়ে রেখেছে।

একটু তাড়াতাড়ি মহীন নিজেদের ঘরের কাছে গেল। ব্যাগট্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়বে।

ঘরে বেশী কেউ ছিল না। সন্তোষ পা তুলে একটা বই পড়ছে। কেমিস্ট্রির রমানাথ আর বটানির অলক কোনো রসচর্চায় ব্যস্ত।

মহীন ঘরে ঢুকেই তার ব্যাগট্যাগ বার করছে দেখে রমানাথ বলল, "কী ব্যাপার? আপনার হয়ে গেল?"

মহীন বলল, "না, আমায় একবার হাওড়া যেতে হবে।"

"হাওড়া? সেখানে কী মশাই?"

"স্টেশনে যাব।"

"বলেন কী! এদিকে আজ যে আমরা টিকিট কেটে বসে আছি।"

"টিকিট?"

রমানাথ মাথা নেড়ে হতাশার একটা ভঙ্গি করল। "আপনাকে নিয়ে পারা গেল না। ফিলিম ফেস্টিভ্যালের বই মশাই, দারুণ…, মারোয়াড়ীরা দেড়শো দুশো রেটে টিকিট কেটেছে।"

মহীন হাসল। "আমায় স্টেশনে যেতেই হবে। টেলিগ্রাম পেয়েছি।"

"কাটানো যায় না?"

"না।"

"কে আসছেন?"

"এক মহিলা। একা।"

রমানাথ বাঁকা চোখ করে দেখল মহীনকে। বলল, "অবশ্য এটা সুখবর। কোনো মহিলাকে স্টেশনে আনতে যাওয়া বেশ থ্রিলিং। আপনি তো আবার ওই লাইনের লোক নন।"

মহীন কিছু বলল না। ব্যাগ হাতে করে বেরিয়ে পড়ল।

আজ সকালেই মহীন টেলিগ্রামটা বাড়িতে পেয়েছে। টেলিগ্রামের একটা নাটকীয়তা আছে; বিশেষ করে মহীনদের মতন বাড়িতে। কলকাতার বাইরে তাদের কেউ নেই, বাড়ির কেউ কোথাও কদাচিৎ বাইরে গেছে। কাজেই আপদে-বিপদেই হোক কিংবা সুখে-স্বচ্ছন্দেই হোক তাদের বাড়িতে টেলিগ্রাম প্রায় আসেই নি। মহীন যে-সময় বাইরে ছিল—সে-সময় সেও কখনও টেলিগ্রাম করে নি। কেননা টেলিগ্রাম পৌঁছতে যে সময় লাগত তার অনেক আগেই মহীন কলকাতায় পৌঁছে যেতে পারত।

টেলিগ্রাম আসার ফলে বাড়িতে সকলেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। বউদি জিজ্ঞেস করেছিল, 'কার টেলিগ্রাম?' মহীন বলেছিল, 'আমার এক বন্ধুর।' বউদি আরও কিছু জানতে চাইছিল—মহীন এড়িয়ে গিয়েছে দায়সারা জবাব দিয়ে।

মহীন সুলেখার এই টেলিগ্রাম কোনো দিনই প্রত্যাশা করে নি। কেন সুলেখা কলকাতা আসছে, কোন্ দরকারে, কোথায় উঠবে—কিছু জানায় নি। শুধু হাওড়া স্টেশনে যেতে লিখেছে।

টেলিগ্রাম পাবার পর মহীন অনেক রকম ভেবেছে। কী হতে পারে সুলেখার ? কেন সে আসছে ? আবার কোনো বেয়াড়া অসুখবিসুখ করল নাকি ? অসুখে অসুখে সুলেখা তো প্রায় মৃত !

মহীনের অন্য রকম মনে হচ্ছিল মাঝে মাঝে। কৃষ্ণপদবাবুর সঙ্গে কিছু হল না তো ? সুলেখার শেষ চিঠি পড়ে মহীনের এ-রকম একটা সন্দেহ হয়েছে। কৃষ্ণপদবাবু কিংবা সুলেখা কেউই কারও মুখাপেক্ষী নয়, জীবনে একে অন্যজনের প্রয়োজনও অনুভব করে না। অদ্ভুত এই সম্বন্ধ স্বামী-স্ত্রীর। এ সম্বন্ধ থাকা না-থাকা একই।

সুলেখাকে অসহিষ্ণু বলা যায় না। আবার হিন্দু অবলা মেয়েদের মতন সহিষ্ণু বলাও চলে না। তার শিক্ষা আছে, ব্যক্তিত্ব আছে। ধর্মের দিক থেকেও সুলেখা হিন্দু সমাজের সংস্কার থেকে মুক্ত। স্বামী তার কাছে দেবতা নয়, স্বর্গের পথ নয়। কাজেই স্বামীকে ত্যাগ করতে—আইনসঙ্গত ভাবেও সুলেখার বিবেকে লাগার কারণ নেই ; ইচ্ছে করলে অনেক আগেই সুলেখা স্বামী ত্যাগ করতে পারত। কেন করে নি !

মানুষ বড় বিচিত্র। কিছু বোঝা যায় না। মহীনও বুঝতে পারে নি সুলেখা কেমন করে কৃষ্ণপদর সঙ্গে তার সামাজিক সম্পর্কটা বাঁচিয়ে রেখেছিল !

কলেজের গেটের সামনে সান্যালদার সঙ্গে দেখা।

"কোথায় ?" সান্যালদা জিজ্ঞেস করলেন।

"একবার হাওড়া স্টেশন যাব," মহীন বলল। "আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ?"

"ইউনিভার্সিটি।"

"মিটিং ছিল ?"

"না। প্রিন্সিপাল কতকগুলো কাজে পাঠিয়েছিলেন।"

মহীন চলে যেতে গিয়েও দাঁড়াল। "আপনার শরীরটা শুকনো শুকনো লাগছে !"

সান্যালদা পকেট থেকে পাট-করা রুমাল বার করে চোখের চশমা খুললেন। চশমা খুললে সান্যালদাকে অন্ধের মতন দেখায়। মাথায় পাতলা চুল। রুক্ষ।

"নাক নিয়ে বড় ভুগছি," সান্যালদা বললেন, "সাইনাস। মাঝে মাঝেই রক্ত পড়ে।"

"ডাক্তার কী বলছে?"

"ডাক্তার ওষুধ দেয়। খাই।···তুমি যাও—তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

মহীন একটু হেসে ব্যস্তভাবে এগিয়ে গেল। কয়েক পা এগিয়েই আবার দাঁড়াল। ঘুরে তাকাল। "সান্যালদা?"

সান্যালদা সবে পা বাড়িয়েছিলেন, দাঁড়িয়ে পড়লেন।

মহীন এগিয়ে এল। ইতস্তত করে বলল, "সান্যালদা একটা কথা—"

সান্যালদা তাকিয়ে থাকলেন।

মহীন বলল, "আমি একটু অসুবিধেয় পড়েছি। এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না—কিন্তু আমার এক বন্ধু—মানে বান্ধবীকে যদি কোথাও কয়েক দিনের জন্যে রাখতে হয়—কোথায় রাখব বলতে পারেন?"

সান্যালদা ভাল করে মহীনের চোখ-মুখ দেখলেন। "তোমার বান্ধবী?"

মহীন সঙ্কুচিত হয়ে বলল, "হ্যাঁ; মানে আগের কলেজে আমরা সহকর্মী ছিলাম। ভদ্রমহিলা বিবাহিতা। কিন্তু ভীষণ সিক্।"

একটু ভেবে সান্যালদা বললেন, "তোমাদের বাড়িতে রাখতে পারবে না?"

"আমি পারি। কিন্তু—" মহীন কুণ্ঠিত হল। "আমাদের বাড়িতে জায়গা নেই। তাছাড়া উনি কৃশ্চান। বাড়ির লোক কেমন ভাবে নেবে। কোনো হোটেল-টোটেলে রাখা যায়। কিন্তু মহিলা এতই অসুস্থ···।"

আরও একটু ভেবে সান্যালদা বললেন, "কোথাও যদি না পার—

আমার বাড়িতে রাখতে পার। আমার কোনো রকমে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।”

মহীন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

সান্যালদা আর দাঁড়ালেন না।

প্ল্যাটফর্মে ঢোকার মুখেই গাড়ি পৌঁছে গেল। মহীন ঘড়ি দেখল না; তার সামান্য দেরি হয়ে গিয়েছিল, ভেবেছিল সুলেখা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকবে। একেবারে গাড়ি পৌঁছনোর মুখে মুখে পৌঁছে দুশ্চিন্তা কাটল। গাড়িটা নিশ্চয়ই মিনিট দশেক দেরি করেছে।

লোকাল প্যাসেঞ্জার। এই সময়ে তেমন ভিড় নেই। তবু প্রথম দিকটায় যেমন হয়, হুড়মুড় করে লোক নামল, নেমেই ছুটতে লাগল হনহন করে।

মহীন সুলেখাকে খুঁজতে খুঁজতে সামান্য এগিয়ে যেতেই তাকে দেখতে পেল।

মহীন তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

সুলেখা প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়িয়েছে। একটা কুলি তার সুটকেস নামিয়ে পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল।

কাছে এসে মহীন হাত তুলল। সুলেখা তাকে দেখছিল।

“ছুটতে ছুটতে আসছি—” মহীন বলল, “হাওড়া ব্রিজে ট্রামের তার ছিঁড়ে সব লাইন মেরে দাঁড়িয়ে আছে।”

সুলেখা কিছু বলল না। তার রুগ্ন চোখে হাসি ফুটল।

মহীন সুলেখাকে ভাল করে দেখে নিল। কোনো মানুষকে চট করে দেখলে তার ষোল আনা বোঝা যায় না। যতটুকু বোঝা যায় ওপর ওপর নজর থেকে—মহীন ততটুকু বুঝল। সুলেখার শরীর স্বাস্থ্য মোটামুটি সেইরকম রয়েছে, রোগা চেহারা, পিঠকুঁজো ভাব, পাতলা চামড়ার সামান্য খসখসে রুক্ষতা। মহীনের মনে হল না, সুলেখার ভয়ংকর কিছু ঘটেছে।

প্রথমটায় লক্ষ করে নি মহীন, পরে সুলেখা যখন কুলিকে মাটি

থেকে একটা হালকা হোল্ডঅল তুলে নিতে বলেছে, মহীন বুঝতে পারল, একেবারে ঝাড়া হাত-পা হয়ে সুলেখা আসে নি।

"আজ সকালেই টেলিগ্রাম পেয়েছি—" মহীন বলল। তার বলার ভঙ্গি থেকে মনে হল, হঠাৎ টেলিগ্রাম কেন—সে জানতে চাইছে।

সুলেখা পা বাড়াবার জন্যে তৈরী। কুলিটাও এগুতে লাগল।

"আজ সকালে?" সুলেখা বলল, "কাল বিকেলে টেলিগ্রাম করেছি, রাত্রেই পাওয়া উচিত ছিল।"

"কী ব্যাপার?" মহীন জিজ্ঞেস করল।

সুলেখা কোনো জবাব দিল না। দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

প্ল্যাটফর্মের ভিড় প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। একদল বরযাত্রী ধরনের লোক তখনও হইহই করছে। ময়লা ঝাঁট দিচ্ছিল জমাদার। ধুলো উড়ছে।

সুলেখা নাকে রুমাল চাপা দিল।

"শরীর কেমন?" মহীন জিজ্ঞেস করল।

"সেই রকমই।"

"জ্বর হয়েছিল না?"

"হয়েছিল। বুকের জন্য···।"

মহীন চুপ করে থাকল। সুলেখার মূল রোগটা সে স্পষ্ট করে জানে না। শুনেছে মেরুদণ্ডের রোগ, কী রোগ তা সে জানতে চায় নি। যক্ষার ধাক্কাও সামলেছে বেচারী। আরও নানারকমব্যাধি তার বহু-কালের।

"টেলিগ্রাম পেয়ে আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।" মহীন বলল।

সুলেখা দ্রুত হাঁটতে পারে না। ধীরেসুস্থে হাঁটছিল। তার হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে কোনো খুঁত নেই। বরং অমন রোগা চেহারা সত্ত্বেও হাঁটার সময় তার কোমর আর পেছন বিসদৃশ দেখায় না। হাঁটতে হাঁটতে সুলেখা বলল, "টেলিগ্রামটা করে আমারও মনে হল, তুমি ঘাবড়ে যেতে পার।"

মহীনের কানে 'তুমি' সম্বোধনটা বাজল। এটা নতুন কিছু নয়।

সুলেখা তাকে তুমিই বলে। কবে থেকে বলতে শুরু করেছিল তা নিয়ে মহীন আর মাথা ঘামায় না। কলেজে সকলের সামনে অবশ্য 'আপনি'ই বলত তারা। আড়ালে 'তুমি'। সুলেখাই 'তুমি' শুরু করেছিল। মহীনও না করে পারে নি। অনেকদিন পরে সুলেখার এই 'তুমি' মহীনের কানে যেন কোথাও নতুন করে বাজল।

"না করেও উপায় ছিল না", সুলেখা বলল, "চিঠি লেখার সময় পেলাম না।"

"আমার ভয় হল, অসুখবিসুখ করল বুঝি হঠাৎ!"

"অসুখ নয়।" সুলেখা জবাব দিল।

প্ল্যাটফর্মের বাইরে এল ওরা। কুলিটা কয়েক পা এগিয়ে। মহীন এক দিকে স্বস্তি পেয়েছে, অন্য দিকে আরেক অস্বস্তি অনুভব করছিল। সুলেখাকে নিয়ে কোথায় ওঠা যায় এই চিন্তা করতে করতেই সে এসেছে। তাদের কলেজের কাছে মির্জাপুরের দিকে পুরনো একটা হোটেল আছে, বড় হোটেল, ভালও। সেই হোটেলে সুলেখাকে তোলা যেতে পারে। সান্যালদার বাড়িতে সুলেখাকে তোলা উচিত হবে না। তখন ঝোঁকের মাথায় হুট করে সান্যালদাকে কথাটা বলেই মহীন ভুল করেছে। ভদ্র সহজ মানুষ সান্যালদা, তবু তাঁরও তো কৌতূহল রয়েছে। সান্যালদার স্ত্রীই বা কি মনে করবেন!

মহীন আপাতত এই সমস্যায় বিব্রত বোধ করছিল। সুলেখাকে তো বলা যাবে না, তাদের বাড়িতে সুলেখাকে সে তুলতে পারছে না! তোলা সম্ভব নয়।

ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের দিকে এগুতে এগুতে মহীন বলল, "টেলিগ্রাম পেয়ে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না বলে কোন ব্যবস্থাও করতে পারছিলাম না।"

"কিসের ব্যবস্থা?"

"থাকাটাকার—" আড়ষ্ট ভাবে বলল মহীন।

সুলেখা ঘাড় ফিরিয়ে মহীনকে দেখল।—"থাকার জায়গা আমার রয়েছে।"

মহীন সুলেখার চোখে চোখে তাকাল। "কোথায়? কোনও আত্মীয়— ?"

"না, আত্মীয় নয়", সুলেখা বলল, "এণ্টালী বাজারের দিকে আমাদের একটা হোস্টেল আছে। কৃশ্চান মেয়েদের।"

মহীনের এতক্ষণের দুর্ভাবনা যেন সুলেখার একটি মাত্র কথায় কেটে গেল। স্বস্তি অনুভব করল। সামান্য ব্যাপারেই মানুষ কেমন ঘাবড়ে যায়! সকাল থেকেই মহীন এই দুশ্চিন্তায় যেন মরে যাচ্ছিল—কোথায় তুলবে সুলেখাকে? অথচ কত সহজে ব্যাপারটা মিটে গেল। মহীন কেন একবার ভাবে নি—সুলেখা নিজের থাকার ব্যবস্থা নিজেই করতে পারে!

"কেমন হোস্টেল?" মহীন কোনো কিছু না ভেবেই বলল।

"খারাপ নয়। ছোট। আমার জানাশোনা আছে। কলকাতায় এলে ওখানেই উঠি।"

মহীন আর কোনো কথা বলল না।

ট্যাক্সিতে বসে মহীন ড্রাইভারকে বলল, "মৌলালি।"

ট্যাক্সি চলতে শুরু করল। সুলেখা আরও আরাম করে বসল, পিঠ হেলিয়ে। তার পরনের শাড়িটা তাঁতের। গায়ে কার্ডিগান, কালচে রঙের, কোলের ওপর গরম চাদর, তার হাতে ব্যাগ।

প্রথম দিকে দুজনেই চুপচাপ। মহীন একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল।

সুলেখাই কথা বলল, "অনেক দিন পরে কলকাতায় এলাম।" বলে জানলা দিয়ে বাইরে কলকাতা দেখতে লাগল।

"কবে এসেছিলে?"

"বছর দেড় হবে; হাসপাতালে ছিলাম।"

মহীন সিগারেটের ধোঁয়া গিলে বসে থাকল একটু। পরে বলল, "হঠাৎ কলকাতায়?"

সুলেখা কোনো জবাব দিল না।

ট্যাক্সি হাওড়া ব্রিজের ওপর উঠল। সারি বেঁধে অনেক ট্রাম

দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়িটাড়ির জট বেঁধে উঠেছে খানিকটা। গঙ্গার ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল।

সুলেখাই আচমকা জিজ্ঞেস করল, "তোমার কেমন কাটছে কলকাতায়?"

"ভালই। কলেজ করছি, আর ওই একটা পার্ট-টাইম—রাত্রে।"

"বাড়ির খবর কেমন? তোমার বাবা?"

"বাবার ব্যাপারটা এখন ভাগ্যের হাতে। ,ভাল থাকেন মাঝে মাঝে, আবার খারাপও হয়ে যায়।"

সুলেখা মহীনের মুখের দিকে তাকাল, "তুমি চিঠিতে লিখেছিলে ক্যানসার, তাই কী?"

"হ্যাঁ।"

"ভীষণ রোগ।" সুলেখা যেন দুঃখের সঙ্গে বলল।

ভিড়ের মধ্যে দিয়েই ট্যাক্সিটা চালাকি করতে করতে ব্রিজের বাকিটুকু পার করে ফেলল।

মহীন সুলেখার দিকে তাকিয়ে আবার বলল, "হঠাৎ কলকাতায় চলে এলে কেন?"

সুলেখা মহীনের চোখ দেখল। হাসির মুখ করল, "কী মনে হচ্ছে তোমার?"

মহীন কেমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। "ধরতে পারছি না। প্রথমে টেলিগ্রাম পেয়ে ভেবেছিলাম, সিরিআস কিছু। অসুখবিসুখ মনে হয়েছিল।"

"আর কিছু মনে হয় নি?"

মহীন দু'পলক সুলেখার চোখের দিকে তাকিয়ে পরে চোখ সরিয়ে নিল। সতর্ক হয়ে বলল, "না, আর কি মনে হবে?"

সুলেখা বিশ্বাস করল না। বলল, "উঁহু।"

"মানে?"

"থাক্। পরে বলব।...আমি কলকাতায় একটা চাকরির ব্যাপারে এসেছি।"

"চাকরি!" মহীন অবাক।

সুলেখা কলকাতা চেনে। ট্যাক্সি হ্যারিসন রোড ধরে ছুটছে। শীতের রোদ মরে এল। শেষ দুপুরটায় কলকাতাকেও কেমন মনমরা দেখাচ্ছে।

"এখানে একটা মেয়ে কলেজে ডেকে পাঠিয়েছে", সুলেখা বলল, "সিনিআর লেকচারার··· ।"

"ইণ্টারভিউ দিতে এসেছ?"

"হ্যাঁ।"

মহীন একটু চুপ করে থাকল। "মথুরামোহন ছেড়ে দিচ্ছ তা হলে?"

"এটা পেলে তবে না!"

ভাবল মহীন। "কলকাতায় তোমার ভাল লাগবে? তা ছাড়া মথুরামোহনে তোমার সিনিআরিটি ছিল।"

সুলেখা কথার জবাব দিল না; বাইরের দিকে চোখ রেখে মানুষজন দোকানপশার দেখতে লাগল।

ট্যাক্সিটা হ্যারিসন রোড ধরে সেণ্ট্রাল অ্যাভিনু পর্যন্ত চলে এল। এসে ডানদিকে মোড় নিল।

"কবে ইণ্টারভিউ?" মহীন জিজ্ঞেস করল।

"কাল।"

"দুপুরে?"

"দশটায় সময় দিয়েছে।"

মহীন অন্যমনস্ক হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল। কিছু ভাবছিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। সুলেখা পিঠ সোজা করল। তাকাল একবার মহীনের দিকে। আবার চোখ সরিয়ে নিল। রাস্তায় ধুলো উড়ছে দমকা বাতাসে। সাজিয়েগুজিয়ে কার যেন মৃতদেহ চলেছে, ছোটখাটো ভিড়।

মহীন সুলেখার দিকে তাকিয়ে বলল, "কৃষ্ণপদবাবুর খবর কী?"

সুলেখা শুনল ; কোনো জবাব দিল না।

মহীন সন্দেহ করছিল। সুলেখার মুখ দেখে এখন অন্তত কিছু বোঝার উপায় নেই, তবু মহীনের খটকা লাগছিল। চুপ করে থেকে মহীন আবার বলল, "কলকাতায় চাকরি পেলে কৃষ্ণপদবাবু কী করবেন ?"

সুলেখা এবার মহীনের দিকে সরাসরি তাকাল, "কিছু করবে না।"

ইতস্তত করে মহীন বলল, "একটা কথা বলি, কিছু মনে করো না।"

"বল।"

"কলকাতায় চাকরি করতে আসার জন্যে তুমি এত ব্যস্ত কেন ?"

সুলেখা চোখ সরাল না। গম্ভীরও হল না। বরং হালকা গলায় বলল, "বাঃ, তোমাদের কলকাতার কলেজে চাকরি পেলে কে মফস্বলে পড়ে থাকতে চায় ? তুমি কেন কলকাতায় চলে এলে ?"

"আমার কথা আলাদা। কলকাতায় আমার বাড়ি। তা ছাড়া আমি পুরুষমানুষ, আমার একটা কেরিআর রয়েছে। তুমি কলকাতার লোক নও। তোমার শরীর-স্বাস্থ্যও এই শহরে টিকবে না। এই কলকাতার হাল তুমি দেখেছ ? লক্ষ লক্ষ লোক, ঘিঞ্জি, নোংরা, নিঃশ্বাস নেবার মতন পরিষ্কার বাতাসও তুমি পাবে না। বাইরে তুমি ফাঁকায় ছিলে—তোমার ওখানকার জলহাওয়া খুব ভাল ছিল।"

"শুধু জলহাওয়ায় মানুষ বাঁচে ?" সুলেখা বাধা দিয়ে বলল।

মহীন কেমন থতমত খেয়ে গেল। বলল, "তোমার কথা বুঝলাম না।"

"বলছি শুধু জল-হাওয়ায় মানুষ বাঁচে ?"

না বোঝার কিছু নয়, মহীন বুঝেছিল, বুঝেও এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। বলল, "তা বলছি না। তবে তোমার শরীরের জন্যে আগের-টাই ভাল ছিল।"

"আর মনের জন্যে ?" সুলেখা ছোট করে বলল। এবার তার গলার স্বরে চাপা ক্ষোভ।

মহীন কিছু বলতে পারল না। মুখ গম্ভীর হয়ে এল, খানিকটা বিষণ্ণ।

সুলেখা বলল, "কলকাতায় আমার চাকরি নাও হতে পারে। আমি ঠিক করে এসেছি, এখানে যদি চাকরি নাই হয়—তবু আমি আরও দু-চার জায়গায় চেষ্টা করে যাব। আমার চেনা-জানা কেউ কেউ আছে। কলকাতাতেই আমি চলে আসব। আর আমি পারছি না।"

মহীন চুপ করেই থাকল। বলার মতন কোনো কথাই মুখে আসছিল না।

সুলেখা বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল। ট্যাক্সিটা বউবাজার ছাড়িয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ থেকে ড্রাইভারের কী খেয়াল হয়েছে, ধীরেসুস্থে গাড়ি চালাচ্ছিল। যেন আরাম করে গাড়ি চালাচ্ছে।

"আমি তোমার চেয়ে বয়েসে ছোট নয়," সুলেখা বলল আস্তে আস্তে, "হয়ত এক-আধ বছরের বড়ও হতে পারি। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বুদ্ধিতে অনেক আগে আগে বেড়ে ওঠে।…তুমি কী ভাবছ মহীন আমি জানি। আমি তোমায় পুরোপুরি হয়তো চিনি নি, খানিকটা চিনেছি। তোমার চিঠি পড়ে আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি আমার সঙ্গে যতটা ভদ্রতা কর ততটা জড়াতে চাও না।"

মহীন প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। একবার ড্রাইভারের পিঠের দিকে তাকিয়েই সুলেখার দিকে চোখ ফেরাল, "ভদ্রতা? কী বলছ?"

"তোমার ভয় হচ্ছে, আমি যদি কলকাতায় চলে আসি তোমায় অসুবিধেয় পড়তে হবে।"

"আমার অসুবিধে কিসের?"

"আমি তোমায় জ্বালাব।"

"দূর—!" মহীন হাসবার চেষ্টা করল।

"দূর নয়, যা বললাম তাই।"

"আমি এত সহজে জ্বলি না," মহীন এমন ভাবে বলল যেন কোনো কিছুই সে গ্রাহ্য করে না, "তুমি আমার বন্ধু—বান্ধবী, যা খুশি বলতে

পার। আমি তোমার ভালটাই চাই।”

“ভাল চাও মানে তুমি চাও যেখানে ছিলাম সেখানে থাকি, আর কৃষ্ণপদর কাছেই জীবনটা কাটাই।”

“তোমার এই শরীর-স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা বাদ দিতে পার না?”

“অনায়াসে পারি। শুধু শরীর বাঁচাতেই মানুষ বাঁচবে কেন? আমার মনের অবস্থাটা তুমি বুঝতে পারছ?”

মহীন মুখ নীচু করে থাকল।

ট্যাক্সি গণেশ অ্যাভিনুতে এসে বাঁদিকে মোড় নিল। সোজা ওয়েলিংটনের পাশ দিয়ে ধর্মতলা ধরবে।

“কৃষ্ণপদবাবুর সঙ্গে তোমার কিছু হয়েছে?” মহীন নীচু গলায় বলল।

সুলেখা চুপ করে থেকে পরে জবাব দিল, “যা হবার তাই হয়েছে। হয়েই আসছে। আজকাল বাড়িতেও ফেরে না বেশীর ভাগ দিন।”

মহীন বুঝতে পারল, সম্পর্ক বা সম্বন্ধ যেখানে ভেঙেই গিয়েছে সেখানে কোনো কিছুই আর জিইয়ে রাখা যায় না। কোনো তরফের যদি কিছুটা আগ্রহ থাকত—তবু না হয় চেষ্টার পথ থাকত। এখানে তা নেই।

কৃষ্ণপদবাবুর জীবনে রাজনীতি একটা বিকৃতির মতন তাঁকে গ্রাস করে ফেলেছে। ছোটখাটো নেতা থেকে এখন তাঁর মাঝারি নেতা হবার সাধ। কিংবা সঙ্কল্প। সেই সাধ মানুষটাকে ক্রমশই নোংরা ব্যাপারে, প্যাঁচালো ঝঞ্ঝাটের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছে। স্ত্রী কিংবা সংসার তাঁর কাছে আকর্ষণহীন, অর্থহীন। সংসারে বোঝাপড়ার আগ্রহ তাঁর থাকার কথা নয়। সুলেখাও স্বামীকে সম্পূর্ণ নিস্পৃহতার সঙ্গে গ্রহণ করতে শিখেছে। এখন আর কৃষ্ণপদতে তার কিছু আসে-যায় না।

তবু মহীনের মনে হল, সে চলে আসার পর জল আরও কোথাও গড়িয়ে গিয়েছে। নয়তো সুলেখা কলকাতায় চলে আসতে চাইবে কেন?

মহীন শুধলো, “রিসেন্টলি কিছু হয়েছে?”

সুলেখা ঠোঁট চেপে বলল, "হয়েছে।"

"ঝগড়া?"

"না।"

"তবে?"

সুলেখা চোখের ইশারায় কিছু যেন নিষেধ করল। বলল, "পরে বলব।"

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের গা দিয়ে ট্যাক্সি ঘুরে গেল।

সুলেখা বলল, "তোমার অন্য কোন কাজ নেই তো?"

"না। কলেজ ছুটি নিয়ে এসেছি।"

"তা হলে তোমায় খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে হোস্টেলে। আমি জিনিসপত্র রেখে কাপড় বদলে তোমার সঙ্গে বেরুব।"

"কোথায়?"

সুলেখা কোন জবাব দিল না।

আর একটু পরে ট্যাক্সিঅলা বলল, "মৌলালির কোথায় যাবেন?"

সুলেখা বলল, 'কনভেণ্ট রোড।'

মহীন কেমন বিমর্ষ হয়ে বাড়ি ফিরল।

আলো নেই বাড়িতে, সারা পাড়াই অন্ধকার। সন্ধ্যের মুখে মুখে আলো গিয়েছে।

আজকাল কলকাতায় থাকা মানেই দু-চারটে হ্যারিকেন, কুপি, মোমবাতি হাতের কাছে রাখা। কেউ জানে না কখন আলো যাবে।

কাজল একটা ছোট লণ্ঠন এনে দিল। বলল, "বাবার শরীর বিকেল থেকে খুব খারাপ হয়েছে।"

বাবার শরীরের ভাল-মন্দ শুনতে শুনতে সবাই এখন অভ্যস্ত। কিছু শোনামাত্র চমকে ওঠার কারণ থাকে না। মহীন বলল, "আবার কী হল?"

"বিকেল থেকেই দমবন্ধ দমবন্ধ লাগছিল। তারপর সন্ধ্যেবেলায়

গলা দিয়ে আর কিছু গলছে না।”

“ডাক্তার এসেছিল ?”

“না।”

“কেন ?”

“আগের ডাক্তার একটা ওষুধ দিয়েছিল, আজ সেটাই খাওয়ানো হয়েছে। কাল ডাক্তার দেখানো হবে।”

মহীন আর কিছু বলল না।

কাজল চলে যাবার পর মহীন জামাটামা খুলে বসল একটু। বাবাকে নিয়ে তার বিরাট কোন দুশ্চিন্তা নেই। দুঃখ অবশ্যই আছে। মানুষের জীবনের একটা শেষ আছে। যদি স্বাভাবিক ভাবে সেই পরিণতি আসে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। ভাগ্যকেও নয়। বাবা বুড়ো মানুষ। জীবনকে ফুরিয়ে এনেছেন, চার-ছ'মাস আগে-পরে তাঁকে যেতে হবে। কিন্তু মানুষটা যাবার আগে এই যে কষ্ট ও যন্ত্রণা পাচ্ছেন, দুদিন ভাল থাকেন তো আবার খারাপ হয়, মহীনের এটা পছন্দ নয়। যে যাই বলুক ব্যাধির একটা কষ্ট আছে, যে ভোগে সে-ই বোঝে, অন্যকে তা বোঝানো যায় না। মহীনের সন্দেহ, বাবার ভাল থাকার অর্থ স্বাভাবিক থাকা নয়, চূড়ান্ত কোনো যন্ত্রণার পরিবর্তে কম যন্ত্রণা পাওয়া। বাবার এই যন্ত্রণার ভাগ নিশ্চয় মহীন নিতে পারে না। কিন্তু তার দুঃখ হয় এই ভেবে যে, অন্য কোনো কম যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিতে বাবা কেন জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাতে পারলেন না!

মহীন উঠল। বাবাকে দেখতে গেল।

সিঁড়ির মুখে রথীনের সঙ্গে দেখা। মহীন বলল, “তোমাদের হোমিও-প্যাথি, তেল-মাটি এসব ছেড়ে দাও। মানুষটাকে অকারণ ভোগাচ্ছ কেন ? তার চেয়ে হাসপাতালে দাও—তবু একটা ট্রিটমেন্ট হবে।”

রথীন নামছিল। ছোট ভাইয়ের কথায় তার মাথায় দপ করে রাগ চড়ে উঠল। বলল, “বাবা তোমারও। হাসপাতালে দিতে হয় তুমি দাও—তুমি দিতে পার না ?”

মহীন বুঝতেই পারে নি, সে ঝট করে এমন একটা কথা বলে

ফেলেছে যা আর ফেরাবার উপায় নেই। মহীন বলল, "তুমিই তো সব ব্যবস্থা করছ।"

"বাবাকে আমি কিনে নিই নি। তোমরাও করতে পার।"

মহীন আর কথা বাড়াল না। পাশ কাটিয়ে ওপরে চলে গেল। মণিরা তাদের ঘরে। পড়াশোনা নিশ্চয় করছে না। অথচ চুপচাপ।

বাবাকে দেখে মহীন ফিরে এল। বোধ হয় ঘুমের ওষুধ খেয়েছেন। জেগে আছেন অথচ চোখের পাতা বোজা। নড়াচড়াও করছেন না। এক দিকে জানলার কাছে মোমবাতি জ্বলছে। অকারণে কথা বলল না মহীন, কোনো রকম ব্যাঘাত ঘটাল না। সামান্য দাঁড়িয়ে ফিরে এল।

নিজের ঘরে এসে এবার মহীন আর দাঁড়াল না। তোয়ালে-টোয়ালে নিয়ে বাথরুমে চলে গেল লণ্ঠনটা হাতে ঝুলিয়ে।

আবার যখন ঘরে ফিরল মহীন তখনও বাতি জ্বলছে না। বিরক্ত বোধ করল। আজ সারারাতই হয়ত বাতি জ্বলবে না। ধরে নেওয়া যাক—মাঝরাতে জ্বলল, তাতে কার কি আসে যায়?

মুখটুখ মুছে, চুল আঁচড়ে মহীন সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। এখন ক'টা রাত? আট—সাড়ে আট হবে। খাওয়া-দাওয়ার দেরি রয়েছে। এই টিমটিমে বাতিতে কিছু করার উপায়ও নেই। মহীনের মনে পড়ল, সে যখন সুলেখাদের দিকে কলেজে পড়াতে গেল তখন তার সন্ধ্যের সময় থেকে ভীষণ খারাপ লাগত। মফস্বল জায়গা। কলেজে আলো-পাখা থাকলেও মহীনের ভাড়াবাড়িতে আলো ছিল না। কম বাড়িতেই আলো ছিল। কলকাতায় জন্মকর্ম, মফস্বলে এই অন্ধকার দেখলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যেত। বন্ধুরা কত কি বলত, আকাশ বাতাস শালবন মহুয়া ফুলের গন্ধ, বলত চাঁদ দেখতে, তারা দেখতে, জোনাকি দেখতে। মহীনের চোখ অন্ধ নয়, নাকও আছে। দেখেছে সবই, কখনও কখনও ভালও লেগেছে—কিন্তু যে অভ্যাসে আবহাওয়ায় সে মানুষ—সেটা ঘোচাবে কেমন করে!

সুলেখা বলত, "তুমি ষোল আনা শহুরে বাবু।"

"শহরে জন্ম—কী করব!"

"ভূতের ভয় করে নাকি ?"

"সাপের করে।"

"সাপ তোমায় কামড়াবে না—"

কেন যে কামড়াবে না তা অবশ্য সুলেখা বলত না।

সুলেখার কথাই আবার মনে পড়ল। মনে পড়ল বলা ভুল, মনের মধ্যেই সারাক্ষণ রয়েছে, বাড়িতে এসে বাবার ব্যাপারে খানিকটা ছেঁড়া-খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল।

আজ সুলেখার হোস্টেলে নীচে ভিজিটার্স রুমে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আবার সুলেখা এল। সুলেখাকে নিয়ে ট্রামে, রিকশায় খানিকটা ঘুরতে হল। কাজ ছিল সুলেখার। চা খেল দুজনে। বসল খানিক। তারপর সুলেখাকে পৌঁছে দিয়ে মহীন ফিরেছে।

সুলেখার কথাবার্তা থেকে মহীন স্পষ্টই বুঝতে পারছে, জীবনের একটা পর্ব বরাবরের মতন শেষ করে কলকাতায় চলে আসছে সুলেখা। আসবেই। এই চাকরিটা না হলে না হোক, অন্য চাকরি পাবে।

সোজা কথাটা এই—সুলেখা আর কৃষ্ণপদবাবুর সঙ্গে মিথ্যে, অকারণ, অনর্থক সম্পর্কটা রাখবে না। ডিভোর্স নেবে সুলেখা। কৃষ্ণপদ তাতে আপত্তি করে নি। সুলেখা তার কাছে প্রয়োজনীয় নয়, বরং কৃষ্ণপদ হালে এমন সঙ্গিনী পেয়েছে যে কাজ দেবে।

মহীন জিজ্ঞেস করেছিল, "তুমি কি একেবারে ডিসিসান নিয়ে নিয়েছ ?"

"নিশ্চয়।"

"কলকাতায় থাকতে পারবে বলছ ?"

"লক্ষ লক্ষ লোক রয়েছে।"

"তোমার শরীর ?"

"ওই এক কথা বার বার বলো না। শরীরের কথা শুনলে আমার রাগ হয়।"

"এখানে তোমার কিন্তু কেউ নেই।"

"কেন, তুমি আছ।"

মহীন চুপ করে গিয়েছিল। কী বলবে? সুলেখা তার ভরসা করে কলকাতায় আসছে। কিন্তু কেন? মহীন কী ভরসা করার মতন পাত্র?

সুলেখাকে কিছু না বললেও মহীন বুঝতে পারছিল, ব্যাপারটা ভাল হচ্ছে না। প্রথমতঃ সুলেখা তার কাছে বান্ধবীর অতিরিক্ত কিছু নয়। সহানুভূতি কিংবা করুণা প্রেম নয়। মহীন কোনোদিনই ওই মহিলাকে প্রেমিকা হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে না। করার কোনো কারণ নেই। দ্বিতীয়তঃ মহীন মনে করে না যে সে কোনো মহিলার ভরসাস্থল হবে। কেন হবে? নিজের জীবনের দশ আনা মহীনের এখনও অজানা। সে জানে না কোথাকার জল কোথায় গড়াবে। নিজেকেই যে-মানুষ এখনো পর্যন্ত কোথাও বসাতে পারল না—কলেজের একটা চাকরি খুঁটি করে রেখেছে—সে কেমন করে অন্য এক মহিলার জীবনের ভরসা হতে পারে!

আসলে সুলেখা এটা বুঝতেই পারছে না—মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে মহীন নানা দিক দিয়ে বাঁধা। তার নিজের জীবন আছে, উচ্চাশা আছে, সংসার রয়েছে, ভবিষ্যৎ জীবনের কিছু কিছু স্বাভাবিক স্বপ্নও আছে। এ সমস্ত বর্জন করে মহীন কোন্ আকর্ষণে সুলেখার জন্যে জীবন নষ্ট করবে?

অবশ্য সুলেখা হয়ত বলবে, ভরসা মানে আমি কি তোমায় বলছি আমায় বিয়ে কর! আমি বলছি, কলকাতায় তুমি আমার সহায়-সম্বল হয়ে থাক।

মহীন এদিক দিয়েও ভেবে দেখেছে। বোধ হয় এটাও হয় না। আজ বাদে কাল কি পরশু মহীন বিয়ে করবে। তখন? মহীনের বউ কি চাইবে মহীন সুলেখার সহায়-সম্বল হোক! তাছাড়া বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন রয়েছে। তারা ছ্যা-ছ্যা করবে। কলেজে যা ছেলেটেলে আজকাল—কোন্ দিন না একটা পোস্টার মেরে বসে থাকে দেওয়ালে!

আসলে মহীন বুঝতে পারছে, সুলেখার জন্যে প্রেম অথবা সব

কিছু অগ্রাহ্য করার জেদ তার নেই। যদি থাকত, আজ সুলেখাকে নিয়ে কোথায় ওঠাবে—এই দুশ্চিন্তা তার হত না। যাকে বাড়িতে আনার সাহস হল না, যার ধর্ম ও সামাজিক জীবন নিয়ে কে কি বলবে —কার কি মনে হবে ভেবে মহীন উৎকণ্ঠ হয়েছিল—তাকে ভরসা দেবার কথা দিতে পারে না।

মহীনের দুঃখই হচ্ছিল। সুলেখার জন্যে এবং নিজের জন্যেও।

হঠাৎ তার মনে হল, দাদা এবং দিদিকে সে কোথাকার তেল বা মাটি নিয়ে বাবার গলায় লাগাতে বারণ করেছিল। বলেছিল, এসব তুকতাক্, জলপোড়া, দৈবওষুধ—মানে যত রকমের সংস্কার আছে তা থেকে দূরে থাকতে। এমন কি একটু আগেও দাদাকে মহীন হোমিওপ্যাথি আর তেল-মাটি নিয়ে বসে থাকার জন্যে খোঁচা মেরে এল। কিন্তু ব্যাপারটা তার নিজের বেলায় অন্য কী দাঁড়াচ্ছে! মহীন নিজেও তো সেই সংস্কার নিয়ে বসে আছে। তেলপোড়ায় অবিশ্বাস দেখানো যায়, মহীন দেখাতে পেরেছে। অথচ তার সাহস নেই, বাড়ির লোক যে সমস্ত সংস্কার, ধারণা নিয়ে রয়েছে তাকে উপেক্ষা করে সুলেখাকে একটা দিনের জন্যেও এ-বাড়িতে এনে রাখা।

মহীন বিরক্ত বোধ করল। হতাশ বোধ করল। যে মেয়েকে সে সৌজন্যবশেও স্বেচ্ছায় দু-একদিনের জন্যেও নিজের বাড়িতে এনে রাখতে পারে না—সে আজীবন কেমন করে তার সহায়-সম্বল হতে পারে!

মাথা নেড়ে অন্ধকারে মহীন নিজেকেই গালাগাল দিল।

॥ পনেরো ॥

নীচে সিঁড়ির মুখে সতীন দাঁড়িয়ে থাকল। এই বাড়িটায় ঢুকলেই তার বড় অস্বস্তি লাগে। নীচেটা ফাঁকা, মানুষজন বড় একটা চোখেই পড়ে না; ঢাকা দালান, ডান বাঁ দু দিকেই গোটা কয়েক ঘর, এক-আধটার দরজা যদি বা খোলা থাকে অন্যগুলো সব বন্ধ। সদর বলতে বাড়িতে

ঢোকার মুখে একটা লোহার ফটক। ফটকের এক পাশে এক বুড়ো দরোয়ান তার ঘরে থাকে কি থাকে না, সামনের ফাঁকা জমিতে কয়েকটা সাবুগাছ আর জবাফুলের ঝাড়।

প্রথম দিন সতীন নীচে বাড়ির সরকার গোছের একজনকে পেয়ে গিয়েছিল। নিজের পরিচয় দেবার পর এবং দিলীপের দিদি তাকে দেখা করতে বলেছে বলার পরও সতীনের মনে হয় নি—লোকটি তাকে ভেতরে ঢুকতে দেবে। অথচ মজার কথা, চিমড়ে চেহারার সেই বুড়ো আফিং খাওয়া ঝিমোনো চোখে সতীনের দিকে তাকিয়ে দোতলার সিঁড়ি দেখিয়ে দিল। সতীনের তবু সাহস হচ্ছিল না। এই বাড়ির পুরনো চেহারার মধ্যে যেন তার পক্ষে নিষিদ্ধ কোন বস্তু ছিল, সেটা কী সে বুঝতে পারছিল না। দ্বিধা, দুর্বলতার পর কোনো রকমে ভয় ও সঙ্কোচের সঙ্গে দোতলায় উঠে চোরের মতন সামান্যক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সহসা দিলীপের দিদি কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কৃষ্ণা দোতলার মাঝবরাবর ঘর থেকে বেরিয়ে কোথাও যাচ্ছিল, সতীনের দিকে চোখ পড়তেই এগিয়ে এল। যদি না এভাবে দেখা হয়ে যেত, সতীন হয়ত ফিরেই আসত—কেননা ওই নির্জন গা-ছমছমে বাড়ির কোথায় কৃষ্ণা আছে তা খুঁজে বার করা তার পক্ষে সম্ভব হত না।

সতীন সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে থেকে উঁচু মুখে তাকাল। কাউকে দেখতে পেল না। আস্তে আস্তে সিঁড়ি উঠতে লাগল। সিঁড়ির মাঝবরাবর একটা টিমটিমে বাতি জ্বলছে। কোথাও কারোর পায়ের শব্দ নেই, গলার আওয়াজ নেই। মনেই হয় না এ-বাড়িতে কেউ থাকে।

রেলিংয়ে হাত দিয়ে দিয়ে সতীন উঠছিল। এত চওড়া সিঁড়ি সত্ত্বেও ওঠার সময় যেন একটু কষ্ট হয়, হয়ত খাড়াই বেশী। পুরনো সেকেলে বাড়ি বলে দোতলা উঠতেই সিঁড়ি ভাঙতে হয় অনেকগুলো। সতীনদের বাড়িতে চার-পাঁচটা লাফেই দোতলায় উঠে যেতে পারে সে; এখানে পারে না।

দোতলায় উঠে সতীন দাঁড়াল একটু, যদি সেদিনের মতন কৃষ্ণাকে দেখতে পেয়ে যায় হঠাৎ। না, কোথাও কেউ নেই। টানা বারান্দা

ফাঁকা পড়ে আছে। বারান্দার ওপাশে ইংরেজী এল অক্ষরের মতন আর-এক প্রস্থ টানা বারান্দা। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার বাড়িটা এত বড় হলেও, মেঝের বাহার, থামের বাহার, কাচের হরেক রকম সাজসজ্জা থাকলেও এখানে আলোটালো যেন জ্বলেই না, নিতান্ত দায়সারা দু-একটা বাতি জ্বলে—এই যা।

সতীন সামান্য এগিয়ে গেল। গতবার যে-ঘরে বসেছিল সেই ঘরের সামনে দাঁড়াল। পরদা নেই। বাতি জ্বলছে।

মুখ বাড়িয়ে সতীন কৃষ্ণাকে দেখতে পেল। বড় চওড়া সোফার ওপর ছাদমুখো হয়ে শুয়ে সিগারেট খাচ্ছে। কয়েকটা কুশন তার চারপাশে ছড়ানো। মাথার তলাতেও কুশন রয়েছে।

সতীন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মেয়েদের সিগারেট খেতে সে দেখে নি। চৌরঙ্গী পাড়ায় সিনেমা দেখতে গেলে দু-একজন অ্যাংলো মেয়েকে সিগারেট টানতে দেখা যায় বটে, কিন্তু কোনো বাঙালী মেয়েকে নির্বিকার সিগারেট টানতে এই প্রথম দেখল সতীন।

এসব ক্ষেত্রে ঘরে ঢোকা উচিত নয়। সতীনের সেই রকম মনে হল। হয়ত কৃষ্ণা রেগে যাবে। কারও চোখে পড়ার জন্যে নিশ্চয় ও সিগারেট খাচ্ছে না, গতবার সতীন প্রায় ঘণ্টাখানেক ছিল—কৃষ্ণা তো সিগারেট খায় নি।

সতীন দরজার বাইরেই দাঁড়িয়েই থাকল। কৌতূহলের চেয়েও সঙ্কোচই যেন বেশী হচ্ছিল সতীনের। কৃষ্ণার সিগারেট খাওয়া শেষ হলে সতীন তাকে ডাকবে।

অথচ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাও ভাল দেখায় না। ঘরে একজন রয়েছে, অথচ বাইরে চোরের মতন দাঁড়িয়ে থাকা খারাপ দেখায়। কেউ যদি কোনো দিক থেকে বেরিয়ে আসে, সতীনকে দেখে, কী মনে করবে?

সামান্য দাঁড়িয়ে সতীন আবার একবার মুখ বাড়াল।

ঠিক তখন ঘরের মধ্যে ফোন বেজে উঠতে কৃষ্ণা যেন বিছানা থেকে বিরক্তির সঙ্গে উঠে পড়ল। বাঁ হাতে সিগারেট।

ফোন ধরল কৃষ্ণা। "হ্যালো! কে?"

ফোনটা মুখের কাছে ধরে থাকতে থাকতে কৃষ্ণা এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। মুখ উঁচু করল। তারপর বলল, "না, একেবারেই নয়।"

"......"

"তার আমি কি করব! প্রেমাংশুকে বাঁচাতে হয় তোমরা বাঁচাও। টাকা জলে ফেলার জন্যে আমি বসে নেই। না, আমি এক পয়সাও দেব না। ওকে বলে দিও।"

"......"

"না—না।" কৃষ্ণা মাথা নাড়তে লাগল, "আমি পারব না। দেব না।...আমি ছেড়ে দিচ্ছি।" বলতে বলতে ফোন রেখে দিয়ে কৃষ্ণা তাকাল।

সতীন নিজেই লজ্জিত হল, যেন কৃষ্ণাকে এভাবে দেখে ফেলা তারই অন্যায় হয়েছে। মুখ নাচু করে কয়েক পা এগিয়ে সে দাঁড়াল।

"কখন এলে?"

"এই... !"

"বসো।" কৃষ্ণা আর বড় সোফাটায় গেল না। টেলিফোনের কাছাকাছি সোফাটায় ঝপ করে বসে পড়ল। বসে পা দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিল।

সতীন বসতে গিয়েও বসছিল না। দাঁড়িয়েই থাকল।

কৃষ্ণা আবার বসতে বলল সতীনকে। মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত কৃষ্ণার। সতীন সেদিন স্টেশনে তেমনি লক্ষ না করলেও পরে লক্ষ করেছে। মাঝখানে চেরা সিঁথি। বেশবাস তেমন কিছু নয়, হালকা রঙের শাড়ি, জামা। গায়ের চাদরটা বড় সোফায় পড়ে আছে।

সতীন তফাতে বসল।

কৃষ্ণা এবার সিগারেটটা ঠোঁটে রেখে আলগা হাতে টেলিফোন ধরল। ধরে আবার রেখে দিল। "তোমার বাবা কেমন আছেন, সতীন?"

"ভাল নয়।"

"আরও খারাপ হয়েছে ?"

"হ্যাঁ। গলা একেবারেই বসে গেছে।"

"সেদিন বলছিলে হাসপাতালে দেবার কথা হচ্ছে।"

সতীন চোখ তুলে কৃষ্ণার দিকে তাকাল। ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়েছে কৃষ্ণা, মুখের কাছাকাছি ধোঁয়ার রেশটুকু মিলিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। সতীন বলল, "কথা হয়েছিল। বাবা যেতে চাইল না। ডাক্তাররাও বলছে, দিয়ে লাভ নেই এখন। বাড়িতে সবাই হাসপাতালে পাঠাতে রাজী নয়।"

কৃষ্ণা কেমন কোমল চোখে অথচ অন্যমনস্ক ভাবে সতীনের দিকে তাকিয়ে থাকল। কথা বলল না।

সতীন চোখ সরাল। কৃষ্ণার পায়ের চটিজোড়া ওপাশে পড়ে আছে। খোলা পায়ের নখগুলো দেখা যাচ্ছিল। বুড়ো আঙুলটা—দু-পায়েরই ঘন রঙ করা, নাকি আঙুলের নখের রঙটাই ওই রকম কৃষ্ণার ?

কৃষ্ণা বলল, "তোমার বড় মন খারাপ হয়ে গেছে, না ?"

সতীন বুঝতে পারল, কৃষ্ণা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। আজকাল সকলেই তাদের সান্ত্বনা দেয়। এমন কি বাড়িতে তারা নিজেরাই যেন পরস্পরকে বোঝাবার চেষ্টা করছে, বাবা যেরকম কষ্ট সয়ে বেঁচে আছেন অত কষ্ট সহ্য করার চেয়ে যা হবার হয়ে যাওয়াই ভাল।

চুপ করে থাকল সতীন।

কৃষ্ণা এবার হাতের সিগারেট নিবিয়ে দিল। ছাইদানে সিগারেটের টুকরোটা রগড়ে ফেলে দিয়ে কৃষ্ণা বলল, "তোমার জন্যে একটা খবর আছে।"

মুখ তুলে আবার তাকাল সতীন।

"বলছি। তার আগে বল, কিছু খাবে ?"

মাথা নাড়ল সতীন। না।

কৃষ্ণা বলল, "বাড়িতে তোমাদের সবাই ব্যস্ত, অসুখের বাড়ি, খাওয়া-দাওয়া ঠিক মতন করছ না। কিছু একটু খাও, শুধু শুধু চা

খেতে নেই।" বলে কৃষ্ণা উঠল, বিছানা থেকে চাদরটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়াল, তারপর চলে গেল।

সতীন বসে থাকল। বিছানার দিকে তাকাল। কুশনের ওপর সিগারেটের প্যাকেট, ছোট লাইটার পড়ে আছে। রুমাল। দুটো রঙচঙে কাগজ।

এই নিয়ে কৃষ্ণাকে সে তিন দিন দেখল, স্টেশনে একবার আর বাড়িতে দুবার। সত্যি বলতে কি, কৃষ্ণা যে কেমন মেয়ে সতীন একেবারেই বুঝতে পারছে না। মনে হয় কৃষ্ণা একেবারে সরাসরি ধরনের, লুকোচুরি করার মতন নয়, যা বলার সোজাসুজি বলে দেয়, কখনও কখনও তার কথাবার্তা রুক্ষ, কখনও বা অবজ্ঞার মতন শোনায়। বাড়িতে বোধ হয় কৃষ্ণাই সব, তার কথায় কর্তৃত্ব রয়েছে। বেপরোয়া বলেই মনে হয়। সতীন মনে করে, দিলীপের মতন দিলীপের দিদির মাথাতেও পাগলামি রয়েছে।

সতীন সামান্য দূর থেকে আবার সিগারেটের প্যাকেটের দিকে তাকাল।

কৃষ্ণা ফিরে এল। হাত দিয়ে মুখের চুল সরাতে সরাতে বলল, "আজ শীতটা কমে গেছে, না?"

সতীন তাকাল। শীত কমা-বাড়া সে বুঝতে পারছে না।

বসল কৃষ্ণা। তার পুরনো জায়গাতেই।

"তুমি কখনও ভুবনেশ্বর গিয়েছ?"

"না।" সতীন মাথা নাড়ল। বুঝতে পারল না, হঠাৎ ভুবনেশ্বর যাবার কথা কেন উঠছে।

"মাকে একবার ভুবনেশ্বর পাঠাব।"

"কেন?"

"এমনি। ভুবনেশ্বরে আমাদের এক আত্মীয় থাকে। মার বাপের বাড়ির লোক। এক-আধ মাস থেকে আসুক। মনটন যদি একটু ভাল হয়—!"

"কেমন আছেন উনি?"

কৃষ্ণা ডান হাতটা ওপরে তুলে উল্‌টে দিল, "পাগল মানুষ আর কেমন থাকবে। আমাদের বাড়িটা পাগলের, বুঝলে সতীন? আমার বাবা ছিল ধর্ম-পাগল, এগারো-বারোটা ইংরিজী বাংলা বই লিখে নিজের পয়সায় ছেপে লোককে বিলিয়েছে। ইংল্যাণ্ড আমেরিকায় পাঠিয়েছে। বাবা ভাবত, বড় বড় পণ্ডিতরা বাবার বই পড়ে বাহবা দেবে। কেউ পাতা উল্‌টেও দেখে নি।" কৃষ্ণা নিজেই হেসে উঠল। আবার বলল, "ঠাকুরদাও ওই রকম ছিল, চারবার বিয়ে করেছিল। একটা করে বউ আসে আর বছর দুয়েক পরে পট করে মরে যায়। ষোলো বছর থেকে বত্রিশ বছর পর্যন্ত চারবার বিয়ে···কী ভাগ্যবান লোক!" কৃষ্ণা জোরে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে জল এসে গেল চোখে।

সতীন ভাবল জিজ্ঞেস করে, আপনিও পাগল নাকি?

কৃষ্ণা নিজেই বলল, "আমিও পাগল। বুঝলে। তবে আমি সেয়ানা।···একটু আগে শুনলে না—একজনকে দাবড়াচ্ছিলাম। টাকা টাকা করে মাথা খেয়ে ফেলল। আমার এক বন্ধু, দূরসম্পর্কে আত্মীয়ের মতন হয়, ওষুধের একটা ছোট কোম্পানি খুলেছে। আমায় ধরেছিল, হাজার পাঁচ টাকাও দিয়েছিলাম। সেই কোম্পানি ডুবছে। বার বার টাকা টাকা করে মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। বয়ে গেছে আমার টাকা দিতে। টাকা খোলামকুচি কিনা!"

সতীন বোকার মতন তাকিয়ে থাকল। পাঁচ-সাত হাজার টাকা বিলিয়ে দেওয়া এদের কাছে কিছুই নয়? কত বড়লোক এরা? কত টাকা আছে কৃষ্ণাদের? এত টাকা যাদের তাদের বাড়ির ছেলে দিলীপ কেন কলকাতায় কত গলি আছে, কত লোক রাস্তায় শুয়ে শুয়ে রাত কাটায়—এসব হিসেব করত? খেপামি!

"আমাদের এমন হয়েছে, জানো সতীন, যেখানে যত লতায়-পাতায় আত্মীয় আছে—সকলেই কোনো-না-কোনো ছুতোয় টাকা চাইবে। মেয়ের বিয়ে, অমুকের অসুখ, তমুক একটা ব্যবসা করতে নেমেছে, দায়-অদায়··। টাকার সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক নেই।"

সতীন ফট করে বলল, "আপনাদের অনেক টাকা!"

"অনেক নয়, কিছু। সুদ, কোম্পানির কাগজ, দেগঙ্গায় মস্ত বাগান ছিল—জমি করে বেচে দেওয়া হয়েছে—এই রকম সাত-সতেরো। মানুষ বলতে তো আমরা দুজন—মা আর আমি। ক'টা ঝি-চাকর।"

কৃষ্ণার ঝি ট্রে করে চা নিয়ে এল। চায়ের সঙ্গে মিষ্টি।

সতীনকে মিষ্টির প্লেট এগিয়ে দিল কৃষ্ণা। ঝি চলে গেছে।

কৃষ্ণা নিজের চা নিল। বলল, "আমার ঠাকুরদা বিয়ে-পাগলা বুড়ো হলে কি হবে, ঝানু ব্যবসাদার ছিল। জাহাজে মাল তোলা-নামানো থেকে শুরু করে নানারকমের কনট্রাক্ট ছিল। টাকা করে গিয়েছিল ঠাকুরদা। বাবা ডাক্তারী পাস করেছিল, কিন্তু ডাক্তারী করার চেয়ে ধর্মবাতিক নিয়েই বেশী ব্যস্ত ছিল। সেই সব যা থাকার থেকে গেছে।"

সতীন খাচ্ছিল আস্তে আস্তে। আজ বিকেলে চা ছাড়া কিছু খাওয়া হয় নি। খিদে পেয়েছিল।

কৃষ্ণাকে বার বার চোখ তুলে দেখতে দেখতে সতীন বলল, "আমার একটা খবর আছে বলছিলেন?"

কৃষ্ণার খেয়াল হল। বলল, "ওই দেখো, সেটাই তো বলি নি।" বলে কৃষ্ণা চায়ে লম্বা করে চুমুক দিল। তাকাল সতীনের দিকে। "তুমি বাইরে যেতে পারবে?"

"বাইরে?"

"শিলিগুড়ি?"

সতীন চুপ করে থাকল। কলকাতার ছেলে, বাইরে কখনও যায় নি। শিলিগুড়ির নাম শুনেছে এইমাত্র। জায়গাটা যে কোথায় তা যেন মাথায় ঢুকছিল না।

"যদি শিলিগুড়ি যেতে চাও—এখুনি তোমার চাকরি হয়ে যাবে।"

মিষ্টিটা গলা থেকে নামিয়ে ফেলল সতীন। হাতের সামনে দিয়ে কাটা ঘুড়ির মতন একটা চাকরি চলে যাচ্ছে। হাত বাড়ালেই ধরা যায়। তবু সতীন হাত বাড়াতে পারল না। বলল, "বাবার এই অবস্থা— !"

"জানি গো জানি, আমি সেটা জানি—," কৃষ্ণা একেবারে মেয়েলী

ঢঙে বলল, যেন কত আদর করে। "আমি বলেছি, এখন ও পারবে না। তুমি যাবেই বা কেন? থাকতে পারবে না একলা একলা। মন বসবে না!"

চাকরিটা চলে যাচ্ছে দেখে সতীন ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হয়ে উঠছিল। জল খেল।

"আর-একটা আছে।" কৃষ্ণা বলল।

সাগ্রহে সতীন তাকাল।

"হিসেবপত্র লেখার কাজ। পারবে?"

"কোথায়?"

"এই কলকাতায়।"

সতীনের বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। "পারব।"

কৃষ্ণা বলব কি বলব না চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, "মাইনে বেশী নয়।" বলে আড়চোখে অন্য পাশে তাকাল। "আড়াইশো তিনশো বড় জোর।"

আড়াইশো তিনশো! সতীন জলটা শেষ করে ফেলল। আর হঠাৎ অনুভব করল তার বেশ আরাম লাগছে। তৃষ্ণা মিটে যাবার পর যেমন লাগে। কৃষ্ণার চোখের দিকে তাকাল। পাতার পালক বড় বড় দেখাচ্ছে, চোখ মাঝারি, মণি ঘন কালো। নাক টিকোলো।

কৃষ্ণা সতীনের চোখে চোখে তাকিয়ে হাসল। "মাইনে কম?"

সতীন মাথা নাড়ল। চাকরিটাই তার কাছে প্রথম, মাইনেটা তারপর। আড়াইশো তিনশো কম কিসে? অনেক। ভাবাই যায় না।

"চা খাও।" কৃষ্ণা চায়ের দিকে ইশারা করল।

হাত বাড়াল সতীন। চায়ের কাপ তুলে নিল। সত্যিই কি তার চাকরি হচ্ছে? বিশ্বাস করেও যেন ধোঁকা লাগে। পরীক্ষায় যতবার নিজের পাস করার খবর দেখেছে, ততবার তার বিশ্বাস করেও কিছুক্ষণ ধোঁকা লেগে থাকত। সত্যি তো, সত্যি তো করে কিছুক্ষণ যেন দম বন্ধ করে ভাবত। তারপর হঠাৎ বিশ্বাসটা তার বোধের মধ্যে জায়গা করে নিত। চাকরির ব্যাপারটা তার চেয়েও বেশী। সত্যি কি সতীনের

চাকরি হচ্ছে। যদি হয়, তাড়াতাড়ি হয়ে যাক না কেন। কাল কিংবা পরশু থেকে—। বাবা বেঁচে থাকতে থাকতে। বাবা অন্তত দেখে যাক—সতীন একটা চাকরি পেয়েছে। বাবা বেচারী খুব খুশী হবে।

বাবার জন্যে সতীনের ভীষণ মন খারাপ হয়ে কেমন কান্না পেতে লাগল।

মুখ নীচু করে সতীন চা খেতে লাগল। তার মুখ দেখে কৃষ্ণা যেন না তাকে বোকা, দুর্বল, ছেলেমানুষ মনে করে।

কৃষ্ণা চায়ের কাপ রেখে দিল। "তুমি রাজী?"

সতীন কৃতজ্ঞ কুকুরের মতন মুখ তুলল। চোখ ছলছল করছে সামান্য। মাথা নাড়ল।

কৃষ্ণা ঝুঁকে পড়ে টেলিফোনটা তুলে কোলের ওপর রাখল। বাঁ হাতের কাপটা দিয়ে চুল সরাল চোখের ওপর থেকে। ডায়াল করতে লাগল।

এন্‌গেজড্‌।

ফোন রাখল কৃষ্ণা। সতীনের দিকে তাকাল। "মাইনে কম বলে আমি তেমন গা করি নি। দেখি, কথা বলি।"

মানে? সতীন ভয় পেয়ে গেল। কথা বলি নি মানে? মাথাটাথা খারাপ নাকি? যার চাকরিই নেই, পুরোপুরি বেকার, তার পক্ষে আড়াইশো তিনশো কম নাকি? বড়লোকরা এই রকমই হয়। কৃষ্ণা কি চাকরিটা কাঁচিয়ে দিয়েছে?

আবার ফোন করল কৃষ্ণা। লাইন পেল না।

সতীনের বুক কাঁপছিল। টেলিফোনের ওপর তার রাগ হচ্ছিল প্রচণ্ড। শালা, কলকাতার ফোনগুলোকে গঙ্গায় ফেলে দেয় না কেন লোকে! যত সব হোপলেস ব্যাপার!

"আজকাল ফোন পাওয়া ভগবান পাওয়ার চেয়েও কঠিন!" কৃষ্ণা বিরক্ত। পা দোলাতে লাগল।

"এন্‌গেজড্‌?"

"হ্যাঁ।"

"লোকে কতক্ষণ কথা বলে যে—!" সতীনও বিরক্ত।

"একজনের বাড়িতে ফোন করছি।"

সতীন আর চা খেতে পারছিল না।

কৃষ্ণা কোলে ফোন নিয়ে বসে থাকতে থাকতে বলল, "ওখান থেকে আমার সিগারেটের প্যাকেটটা এনে দাও তো!"

চায়ের কাপ রেখে সতীন উঠল। বড় সোফা থেকে সিগারেটের প্যাকেট লাইটার এনে দিল। সিগারেটের প্যাকেটটা চেনা। কৃষ্ণা এত কড়া সিগারেট খায় কেন? উচিত নয়।

ততক্ষণে আবার ফোন করল কৃষ্ণা। লাইন পেয়েছে।

সতীন কান পেতে শুনতে লাগল।

"সন্ধ্যা! আমি কৃষ্ণা। পরিতোষ আছে? দাও···।"

"......"

"এক রকম। মা কাল থেকে ঠাকুরপুজো নিয়ে পড়েছে।···না, না, না!···ওই চলছে। পরিতোষকে দাও।"

সতীনের সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। কৃষ্ণার মুখ যেন সিনেমার ছবির মতন ক্রমশই বড় হয়ে উঠছে তার চোখে।

"পরিতোষ, আমি কৃষ্ণা।"

"......"

"শোন, সেই যে চাকরিটার কথা বলেছিলাম। অ্যাকাউণ্টস্··· হ্যাঁ—হ্যাঁ—।"

সতীন বুঝতে পারল তার হাত কাঁপছে।

"শোন, তুমি কার সঙ্গে কথা বলেছ না বলেছ যায় আসে না। আমার একজন আছে। ওই মাইনেতেই রাজী···! কি বলছ?"

"......"

"আমি কিছু শুনতে চাই না। আমি যাকে পাঠাচ্ছি তাকেই দেবে।···রেখে দাও তোমার হিমাংশু, আমার—আমাদের টাকা তোমার কোম্পানীতে অনেক বেশী আছে।"

"......"

"বলেছি তো। আমার লোক তোমাদের নিতে হবে। না নিলে..."

ওপাশ থেকে কী কথা হল সতীন শুনতে পেল না।

কৃষ্ণা হঠাৎ প্রচণ্ড রেগে গেল। চোখ মুখ কেমন বিশ্রী হয়ে উঠল। গলার স্বর ঝাঁজালো। চিৎকার করে ফোনে বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা। বুঝেছি। তোমাদের চালাকি বুঝেছি। আমার সঙ্গে তোমরা শয়তানি করছ। দত্তর নিকুচি করেছে। ছোটলোক, ইতর। তোমরা তার কথায় চলছ জানতাম না। ঠিক আছে, এর পরিণাম তোমরা বুঝবে।" ফোনের রিসিভারটা ফেলে দিয়ে কৃষ্ণা রুক্ষ গলায় বলল, "ওই চাকরি তোমার হবে না।"

সতীন চুপ করে দাঁড়িয়ে।

"ওদের দত্ত মানে একটা পাজি বদমাশ জোচ্চোর, এই ফার্মে সর্বেসর্বা হয়ে বসে আছে। আমাদের টাকা হাতে-পায়ে ধরে চেয়ে নিয়েছিল। আজ ওরা চোখ রাঙাচ্ছে।...ঠিক আছে। কোর্ট কাছারি উকিল আমাদেরও আছে। আমি ওদের দেখে নেব।"

কৃষ্ণা দু হাতে কপাল ধরল। ছট্‌ফট করছিল।

সতীনের মনে হল, তার পায়ের তলা আবার ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে।

॥ ষোলো ॥

ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়েছিল। নন্দা ওদের গলা শুনল। ঘুমোয় নি এখনও।

ঘরে এসে নন্দা দেখল, স্বামী ছোট টেবিলের কাছে কাগজপত্র নিয়ে বসে। গায়ের শাল মাটিতে লুটোচ্ছে। টেবিল-বাতিটা জ্বলছে শুধু।

ঘরে পা দিয়ে একটু দাঁড়াল নন্দা। রথীনের পিঠ দেখা যাচ্ছে। যেটুকু আলো সবই ওই কোণটায়, ঘরের বাদবাকি অন্ধকার মতন।

স্বামীর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে নন্দার হঠাৎ মনে পড়ল, আজ

অফিস যাবার সময় মানুষটার সঙ্গে অকারণে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। অফিস থেকে ফিরেও রথীন বাড়িতে ছিল না, বাইরে গিয়েছিল কিসের দরকারী কাজে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবার ফিরে এসেছে।

রথীনের পিঠের কাছে এসে দাঁড়াল নন্দা। টেবিলের ওপর কাগজপত্র ছড়ানো, কলমটা খোলাই পড়ে আছে। ছাইদানের ওপর সিগারেট জ্বলছে। রথীনের বাঁ হাতটা গালের তলায়।

স্বামীকে ডাকতে গিয়ে নন্দার মনে হল, রথীন যেন বিস্তর হিসেব-পত্তরের মধ্যে ডুবে আছে। এত হিসেব কিসের? অফিসের কাজ করছে নাকি? যে যাই বলুক, নন্দা বিয়ের পর থেকেই দেখে আসছে, এই মানুষটা খুবই পরিশ্রমী। বিয়ের বছর দুই পর পরই রথীন কিসের একটা পরীক্ষাও দিয়েছিল অফিসের। রোজ সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরে এসে স্কুল-কলেজের ছেলের মতন খাতাপত্র সামনে নিয়ে বসত। এই ঘরেই। তখন শাশুড়ী বেঁচে, শ্বশুর বাড়ির কর্তা, নন্দাকে শাশুড়ীর কাছাকাছি থাকতে হত, তাঁর হাতের কাজকর্ম গুছিয়ে দিতে হত, এখনকার মতন নিজের মরজিতে যখন-তখন স্বামীর কাছে এসে দাঁড়ানোও যেত না। তবু যখন সুযোগ জুটেছে নন্দা নিজের ঘরে এসেছে, সঙ্গে খুনসুটি করবার চেষ্টা করেছে, জ্বালাতন করে পালিয়ে গেছে নীচে। বেশ লাগত। রথীন কোনো কালেই ওপর ওপর বউ-বাঁধা নয়, তখন সে বিরক্ত হত, কিন্তু তার সাধ্য ছিল না যুবতী বউয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি মেজাজ করে। রথীন জানত, তাতে তারই লোকসান। সন্ধ্যের পরই রাত। বিছানার শান্তি সে নষ্ট করতে রাজী নয়। অথচ নন্দা স্বভাবে বরাবরই নরম। তখন আরও নরম ছিল। স্বামীকে রীতিমত ভয়-ভক্তি করত। ঝগড়াঝাঁটি তার আসত না। তবু রথীন, সব জেনেশুনেও স্ত্রীকে যেন খানিকটা সমীহ করত। এখন নন্দাকে মোটেই গ্রাহ্য করে না রথীন।

নন্দার একবার ইচ্ছে হল, স্বামীকে আজ একটু জ্বালাতন করে। সাহস হল না। বরং তার দুঃখ হল। দুঃখ হল এই ভেবে যে, বয়েস হয়ে গিয়েছে নন্দার, শরীর বড় ভারী হয়ে গিয়েছে, যেন জীবনের সেই

পর্ব—যখন সমস্ত কিছু মানায়—মূল্য পাওয়া যায় নিজের—নন্দা সেই পর্ব হারিয়ে ফেলেছে।

নিঃশ্বাস ফেলল না নন্দা। একটু দাঁড়িয়ে থেকে মৃদু গলায় বলল, "খাবার দেব?"

রথীন প্রথমটায় সাড়াশব্দ করল না।

নন্দা আবার বলল, "রাত হয়ে গিয়েছে। খাবার বাড়ব?"

রথীন ভাল করে ঘাড় ঘোরাল না। "কটা বাজল?"

"সাড়ে নটা বাজে। শীতের রাত।"

"ওদের হয়ে গেছে?"

"ঠাকুরপো এখনও ফেরে নি। সতীনরা বসেছে।"

"তোমার ঠাকুরপো কি এটাকে হোটেল-বাড়ি মনে করে? যখন খুশি ফিরবে, আর তোমায় হেঁসেল আগলে বসে থাকতে হবে!"

নন্দা একটু চুপ করে থেকে বলল, "আজ ওর কোথায় যাবার কথা আছে। উত্তরপাড়ায়।"

গাল থেকে হাত নামাল রথীন। "বাবা কি ঘুমোচ্ছে?"

"না।"

"ওষুধ খেয়েও নয়?"

"না।"

রথীন চুপ করে থেকে আচমকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "দিন হয়ে এসেছে। এই যন্ত্রণা সহ্য করে আর কি লাভ! যা হবার তাড়াতাড়ি হয়ে যাক।"

নন্দা নীরব। নীচু হয়ে শালটা গুটিয়ে রথীনের গায়ে রাখল।

"বাড়িতে বসেও অফিসের কাজ করছ?" নন্দা বলল।

"অফিসের কাজ? না।"

"কী করছ তা হলে?"

প্রথমটায় কোনো জবাব দিল না রথীন; পরে বলল, "মুখুজ্যে আমায় একটা এস্টিমেণ্ট দিয়েছে। তার বাড়ির খরচপত্তর। দেখছিলাম। একটা হিসেব করছিলাম। বাড়ি করার খরচপত্র আজকাল বেদম

বেড়ে গিয়েছে।”

নন্দা অবাক হল। রথীন যে এতটা এগিয়ে গিয়েছে সে জানে না। রথীন আজকাল স্ত্রীকে কিছু বলে না ; লুকিয়ে রাখে। কেন? এই গোপনতার কী অর্থ? বাড়ি তো রথীনের একলার নয়, নন্দারও। কেন সে তলায় তলায় এগুবার চেষ্টা করছে?

ক্ষুব্ধ হয়ে নন্দা বলল, “তুমি এরই মধ্যে বাড়ির হিসেবপত্র পর্যন্ত করতে শুরু করেছ? বাঃ!”

রথীন ধমকে উঠল, “আস্তে। হাউমাউ করে কথা বলার অভ্যেস ছাড় তো! গলায় সানাই বাজানো দেখলে মাথা গরম হয়ে যায়।”

নন্দার মাথায় ঝপ করে যেন আগুন জ্বলে উঠল। বলল, “সানাই বাজানো গলাকে বিয়ে করলে কেন? আমার বাপ-মা তোমার হাতে-পায়ে ধরে আনতে গিয়েছিল?”

“সে আমার কপাল!...যাক গে, ওসব মান-অভিমান রাখ। কচি বয়সে মান চলে, এখন তোমার মান করার বয়েস নেই। বি প্র্যাকটিক্যাল।...জমি রেজিস্ট্রির দিন ঠিক হয়ে গিয়েছে। আসছে মাসের সাত তারিখে। উকিলকে দিয়ে সার্চটার্চ শেষ করেছি। জমিটা রেজিস্ট্রি করেই ভাবছি একটা লোন্ অ্যাপ্লিকেসান করব।”

নন্দার মাথা আরও গরম হয়ে উঠেছিল। রুক্ষভাবে বলল, “তোমার লজ্জা করে না! তোমার বাবা আজ যাই কাল যাই হয়ে বিছানায় পড়ে আর তুমি তোমার জমিবাড়ি নিয়ে মশগুল হয়ে আছ?”

রথীন এবার স্ত্রীর দিকে ঘাড় ঘোরাল। তারপর খপ্ করে শাড়িটা ধরে ফেলে সামনের দিকে টানল। নন্দাকে বাধ্য হয়েই টেবিলের পাশে রথীনের চেয়ারের গায়ে গায়ে ঘেঁষে দাঁড়াতে হল।

রথীন বলল, “মার চেয়ে মাসির দরদ বেশী দেখছি!...তুমি মুখ্যু মেয়েমানুষ, খাচ্ছদাচ্ছ, শুয়ে শুয়ে গতর ফোলাচ্ছ। কী বোঝ তুমি সংসারের! বড় বড় কথা বললেই হয় না, বুঝেছ! আমার বাবার কী হবে আমি তোমার চেয়ে ভাল বুঝি। এটাও বুঝি বাবা গত হবার পর যদি আমি না দেখাতে পারি, ধারধোর করে আমি নিজের বাড়ি তৈরির

চেষ্টা করছি—তাহলে তোমার দুই দেওর এই বাড়িটা বেচার জন্যে চাড় দেখাবে না। আমার কোনো মারপ্যাঁচ নেই। স্পষ্ট কথা। কাউকে আমি ঠকাচ্ছি না—আমি চাইছি এ বাড়ি বেচে দাও, যে যার অংশের টাকা নাও, নিজের নিজের ব্যবস্থা করো। কথাটা কানে খারাপ লাগবে শুনতে। কিন্তু এই হয়, হাজারে হাজারে এই রকম হচ্ছে। বুঝলে ?"

নন্দা কোনো কথা বলল না। সবই হয়ত সত্য। কিন্তু অত কথা ভাববার মতন মন এখন নয় নন্দার।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ নন্দা অনুভব করল, রথীনের একটা হাত নন্দার কোমরের ভাঁজে শক্ত হয়ে বসে যাচ্ছে।

সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করল নন্দা।

রথীন হেসে বলল, "গায়ে চর্বি জমানো আর মাথায় বুদ্ধি শানানো এক জিনিস নয় গো! তুমি যা পার সেটাই করে যাও, এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে এস না।" বলে রথীন স্ত্রীর কোমর ছেড়ে দিল। কাগজ গুছোতে গুছোতে বলল, "বাড়িটা যদি দাঁড় করাতে পারি—তুমি ভেবো না—সেটা আমি মাথায় নিয়ে স্বর্গে যাব। তোমাদেরই থাকবে।"

নন্দা চুপ করে দাঁড়িয়ে কথাটা শুনল।

নন্দা নীচে নেমে এল। রান্নাঘরে। স্বামীর ওপর সে ভয়ংকর বিরক্ত হয়েছে। তারও বেশী; রাগে তার গা জ্বলে যাচ্ছিল। মাথা গরম হয়ে উঠেছে। কথা বলার ছিরি দেখেছ মানুষটার, যেন বস্তি পাড়ার লোক। একে আবার সভ্য, ভদ্র বলে! বাপ-মা যখন বিয়ে দিয়েছিল নন্দার তখন শুনত—ভদ্রঘরের সভ্য-ভব্য ছেলে। নিকুচি করেছে তোমাদের সভ্যতায়। ভদ্রলোকের জামাকাপড় পরলেই মানুষ ভদ্র হয় না। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতেই যে শেখে নি সে আবার সভ্য!

রাগের মাথায় নন্দা রান্নাঘরের চারদিকে তাকিয়ে বাসনপত্র, রান্না, ঝুলপড়া দেওয়াল, টিমটিমে বাতিটা অন্যমনস্ক হয়ে দেখল। খুশী হবার কথা নয়। নন্দা খুশীও হল না। তার মনে হল, বিয়ের পর সে যা

পেয়েছে যা এই নোংরা একটা রান্নাঘর, আর দুটো বাচ্চা। এ বাড়িতে পা দেবার সময় শাশুড়ী তাকে আদর করে দুধের থালায় আলতা-পরা পা ডুবিয়ে 'এসো মা' বলে টেনে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু যাবার সময় এই রান্নাঘরটাই দিয়ে গেছেন। আর ওই স্বামী—যে লোকটা ফুলশয্যার দিন কত গদগদ বাক্য শোনাল, সে শুধু কাজের মধ্যে বউকে বার দুই আঁতুড়ে পাঠিয়েছে। বউয়ের ওপর কত যে ভালবাসা তার তা দেখা হয়ে গেছে।

বউয়ের শরীর নিয়ে রথীন আজকাল প্রায়ই খোঁটা দেয়। গায়ে চর্বির পাহাড় জমাচ্ছ, হাতের কি গুলি—মেয়েমানুষ না পুরুষমানুষ, একটা পেছন করেছ যেন পাহাড়পর্বত, বুকটুক তো ফুটবল—এসব কথা নিত্যই রথীনের মুখে। আজ যেমন বলল। কথা হল, শরীরটা কি নন্দা করেছে? খাওয়াও না—বউকে মাস-বাঁজা করে রাখার জন্যে ট্যাবলেট খাওয়াও, শরীর মোটা হবে না তো কি ছিপছিপে হবে? নন্দা তার ন'বউদিকেও দেখেছে, মাস হিসেবে ট্যাবলেট খেতে খেতে কেমন মোটা-মোটা ধাত পাচ্ছে। তা ছাড়া দুটো বাচ্চার মা হয়ে যাবার পর এই বয়সে মেয়েরা এমনিতেই গায়ে-গতরে খানিকটা ফোলে। এতে যদি অপরাধ হয়ে গিয়ে থাকে—ঠিক আছে নন্দা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেবে। একবেলা খাবে। ঘি দুধ মাছ মাংস স্পর্শ করবে না। আর তোমার ওই বড়ি খাওয়াও বন্ধ। দেখি তখন তোমার কি হয়! তুমি চর্বি নিয়ে খোঁটা দাও, আমিও হাড়গিলে হয়ে তোমায় দেখব।

"বউদি—!"

কাজল রান্নাঘরে এসে দাঁড়াল।

তাকাল নন্দা। প্রথমেই তার চোখ গেল কাজলের ছিপছিপে চেহারার ওপর। আচম্‌কা নন্দার মনে হল, ওই বয়েসটা সে আর কি ফিরে পায় না!

"একটু চুনহলুদ গরম করব।" কাজল বলল।

"চুনহলুদ!"

"দাদা কোথায় হোঁচট খেয়েছে। পায়ে চটি ছিল। বুড়ো আঙুলে লেগেছে। ফুলে গেছে।"

"তোমাদের দাদাদের ওই রকমই কীর্তি।"

"আগুন আছে তো উনুনে?"

"আছে একটু। তাড়াতাড়ি করে নাও। খাবার গরম করে খেতে দিতে হবে।"

কাজল বাটি যোগাড় করে চুনহলুদ খুঁজতে লাগল। একবার ভাঁড়ারঘরে গেল। ফিরে এল আবার।

নন্দা দাঁড়িয়েই থাকল। মহীন ফিরেছে। গলার শব্দ পাওয়া গেল।

কাজল উনুনে বাটি রেখে চুনহলুদ গরম করছে, নন্দা আর দাঁড়াল না—মহীনের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

মহীন আজ ধুতি পরে বেরিয়েছিল। গায়ে মোটা খদ্দরের জামার ওপর ভেস্ট, গায়ে শাল।

নন্দা বলল, "আজ কি তোমার যাদবপুর ছিল?"

"না। কেন?"

"জিজ্ঞেস করলাম। তোমরা সবাই শীতের দিনে এত রাত করে খেতে বসলে আমার কাজ সারতে কতক্ষণ লাগে বলতে পার।"

"ও। তোমার কর্তা খেয়েছে?"

"না।"

"তাকে আগে খাওয়াও, তারপর আমাদের কথা—।"

"খুব ঠুকে ঠুকে কথা বলতে শিখেছ—।"

"ঠুকলাম কোথায়? তোমার কর্তা বাড়িতে বসে রয়েছে, তাকেই খাওয়াতে পারলে না—আমার দেরি দেখছ।"

"তোমরা বড় আশ্চর্য মানুষ। কারও সঙ্গে কথা বলা যায় না।" নন্দা রাগ করে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছিল।

মহীন যেন অপ্রস্তুত বোধ করে ডাকল, "বউদি। এই বউদি?"

নন্দা দাঁড়াল।

মহীন বলল, "তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? ঠাট্টা করলাম।"

নন্দা কোনো কথা বলল না। চুপ করে বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে থাকল।

"বাবার খবর কি?"

"একই রকম।"

"আজ আমায় এক জায়গায় যেতে হয়েছিল। নয়ত তাড়াতাড়ি ফিরতাম।"

নন্দা চুপ করেই থাকল।

গায়ের শাল আগেই খুলে রেখেছিল মহীন। গরম ভেস্টটা খুলল।

"তোমার ও-রকম মুখ কেন?" মহীন ঠাট্টা করে বলল।

নন্দা জবাব দিল না।

"কি, কথা বলছ না?" মহীন বলল।

"আমার মুখ এই রকম।"

"এটা ঠিক বললে না। এ-রকম হাঁড়ি মুখ তোমার নয়।"

"হ্যাঁ, আমার মুখ এই রকম। তোমাদের যদি এত অপছন্দ ছিল একটা বাটি মুখকে বউদি করে আনলেই পারতে।"

মহীন কেমন থমকে গেল। দেখল নন্দাকে। তারপর হেসে ফেলে বলল, "তুমি আজ চটে রয়েছ। কর্তার সঙ্গে লড়াই হয়েছে নাকি?"

কর্তাকেই জিজ্ঞেস করো।"

"আহা, তুমিই বলো না।"

"আমি কেন বলব? তোমাদের বাড়িতে এসে এখন মুখ, গতর, চর্বি, হাঁড়ি—কত কি শুনছি।"

মহীন হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, "ঈশ্বরের কৃপায় তোমার চর্বি আরও বাড়ুক—তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমায় কেন অপরাধী করছ?"

"তুমি কি ছেড়ে কথা বল?"

"আমি তোমায় ঠাট্টা করি। ওটা তো করাই যায়। কিন্তু…"

"না ঠাকুরপো, এ আমার আর ভাল লাগে না। তোমরা যে তোমাদের বাড়ির যুগ্যি বউ আনো নি—এ আমি বেশ বুঝতে পারি।"

মহীন মাথা নেড়ে বলল, "ছেলেমানুষি করো না। তোমার বয়েস অনেক হয়েছে।…যাক গে, শোন একটা কথা বলি। আজ একটা ছেলেকে দেখে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। খুকির সঙ্গে দারুণ মানাবে। ভাল ছেলে, ভদ্র পরিবার…"

নন্দা দেওরকে বাধা দিয়ে আচম্‌কা বলল, "বাইরে থেকে ছেলে দেখে আর ভাল ছেলে, ভদ্র পরিবার বলো না। ভদ্র পরিবার আমি অনেক দেখেছি।…বোনের বিয়ে দিচ্ছ তোমরা, তোমরা দেখগে যাও, আমায় কিছু জিজ্ঞেস করো না।"

বলতে বলতে নন্দা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

রান্নাঘরে কাজল ছিল না। চুনহলুদ গরম করে চলে গেছে। নন্দা দাঁড়াল। সামান্য অন্যমনস্ক। তারপর হঠাৎ তার দু চোখে জল এসে গেল।

চোখে জল নিয়েই নন্দা রাত্রের খাবার গোছাতে বসল—স্বামী, দেওর আর ননদের।

॥ সতেরো ॥

সতীন সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়ি ঢুকতেই কাজল খবরটা দিল। বিশ্বাস করল না সতীন। বলল, "ভাগ!"

কাজল বলল, "বা রে, আমি বানিয়ে বলছি?"

"কেমন দেখতে বল্‌ তো?"

কৃষ্ণার চেহারার বর্ণনা দিল কাজল।

বেশ অবাক হল সতীন। সে ভাবতেই পারে না, কৃষ্ণা নিজে

বাড়ি বয়ে তাকে খুঁজতে আসবে। কেমন করে খুঁজে পেল? অবশ্য খুজে পাওয়া কঠিন কিছু নয়; প্রথম দিন শিয়ালদা স্টেশন থেকে ট্যাক্সি করে ফেরার সময় তাকে পাড়ায় নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণা। আজ হয়ত লোকজনকে জিজ্ঞেস করেছে। যে কোনো দোকানে সতীনের নাম বললেই বাড়িটা চিনিয়ে দেবে।

"বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল?" সতীন জিজ্ঞেস করল, একটু কেমন ভয়ে ভয়েই।

"না," কাজল বলল, "বাইরে থেকেই চলে গেছে।"

কৃষ্ণাকে কাজল ছাড়া অন্য কেউ দেখেছে কিনা বাড়ির সতীনের সেটাই জিজ্ঞাস্য ছিল। কেউ দেখে নি। সতীন স্বস্তি বোধ করল।

কাজল শাড়ির পায়ের দিক গুছিয়ে আঁচল ঠিক করে নিল। কার্ডিগ্যান নেবে, না, শাল ঠিক করছিল। বই খাতা সাজানো। কলেজ যাচ্ছে।

সতীন কাজলের তাড়া দেখল। আবার বলল, "কী বলে গেছে?"

"বললাম তো, খুব দরকার, তোমায় আজই দেখা করতে বলেছে।" শালটাই শেষ পর্যন্ত নিল কাজল। বই খাতা ওঠাল।

সতীন বোনকে একটু নজর করে দেখল। "কি ব্যাপার রে! এত ড্রেস মেরে যাচ্ছিস?"

"ড্রেস? কোথায় ড্রেস?"

"তোকে কেমন তড়বড়ে দেখাচ্ছে! আজ কি সেই আর্টিস্টটার সঙ্গে কিছু আছে নাকি?"

"যাঃ!" কাজল লজ্জা পেয়ে বলল।

সতীন হেসে বলল, "শোন্ খুকি, আমার ফোরকাস্ট শুনে যা। আর্টিস্ট বেটাকে বলবি—যা করতে হয় তাড়াতাড়ি। দেরি করলেই সব গেল! বুক চাপড়াতে হবে।"

কাজল যেতে যেতে বলল, "আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। দুপুরেই।"

কাজল চলে যাবার পর সতীন গিয়ে বিছানায় বসল। পায়ের চোটটা দেখল একবার। চুনহলুদের দাগ। ব্যথাটা মরে নি। কমেছে। বিকেলে একটা মালিশ দেবে বলেছে উমা। রাত্রে লাগাতে হবে।

জানলার কাছে বসে সতীন আধ-খাওয়া সিগারেট ধরাল। বউদি আসবে না। এ ঘরে মহারাণীর পা পড়ে না। দাদা—মানে বড়দা অফিসে। মেজদা নিশ্চয়ই স্নান-খাওয়া করছে। তারও বেরিয়ে যাবার সময় হয়েছে। বাড়িতে এখন বাবা, বউদি আর সতীন। আর কমলাদি। মেজদা তো এখুনি চলে যাবে।

সতীন বুঝতে পারছিল না, কৃষ্ণা কেন তাকে বাড়ি বয়ে খুঁজতে এসেছিল। কেন? চাকরির জন্যে? একটা জিনিস সতীন স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে। কৃষ্ণা বড় জেদী। অহঙ্কারী। সেদিন তার কথা যারা রাখে নি—সেই পরিতোষ-টরিতোষদের ও ছেড়ে দেবে না। নিশ্চয় কিছু করবে। কৃষ্ণা তো শাসিয়েই রেখেছে। তা ছাড়াও একটা জিনিস সতীন অনুমান করতে পারে। কৃষ্ণাদের টাকাপয়সা যথেষ্ট। সেটা ব্যাঙ্কে-ট্যাঙ্কে আছে বোধ হয়, কিংবা অন্য নানা রকম সম্পত্তিতে আটকে রেখেছে। কুবেরের ধন বোধ হয় কৃষ্ণাদের। ছোটখাটো ব্যবসায় তাদের অংশ থাকলেও থাকতে পারে। কে এসব দেখাশোনা করে, কেই বা লাভ-লোকসানের হিসেব দেখে সতীন জানে না। তবে ইচ্ছে করলে কৃষ্ণা তাদের শরিকানার জোর দেখিয়ে কোথাও না কোথাও সতীনের একটা সামান্য চাকরি জুটিয়ে দিলেও দিতে পারে। সেটা একেবারে অসম্ভব নয়। সেদিনের পর থেকে কৃষ্ণার মনে লেগেছে।

কিন্তু কৃষ্ণার বড় দোষ হল, সে পাগল। অন্ততঃ মাথায় ছিট আছে। হুট করে কী করে বসবে বোঝা মুশকিল। হয়ত আজ একটা কিছু জুটিয়ে দিল; কালই আবার বলবে—'ও তুমি পারবে না। ছেড়ে দাও।' এ-সব লোকের কথায় নির্ভর করা যায় না। সতীনকে নিয়ে ছেলেখেলা করা উচিত নয় কৃষ্ণার।

তবু, কৃষ্ণা ভাল। ভাল মানে সাদামাটা মনের। নয়ত নিজেই সতীনের খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়ে!

জরুরী দরকারটা কী সতীন যদিও সঠিক জানে না—তবু মনে হচ্ছে চাকরির ব্যাপার। কৃষ্ণা বোধ হয় কিছু যোগাড় করেছে।

কিন্তু দুপুরে সতীন যেতে পারে না। দুপুরে বাড়ি ফাঁকা ফেলে রেখে যাওয়া উচিত নয়। বাবার কখন কি হয়! বিকেলে গিয়ে কৃষ্ণাকে যদি না পায়! সেই সন্ধ্যোবেলাতেই যেতে হবে। খোঁড়া পা নিয়েই।

নাকি সতীন একটা ফোন করবে? দুপুরবেলায় একটা ফোন করে দেখবে নাকি? পপুলার থেকে ফোন করা যায়। ফোন নম্বরটা অবশ্য মনে নেই।

সন্ধ্যেবেলাতেই যাওয়া ভাল। কী আর আছে! চলে যাবে সতীন। না গেলে খারাপ দেখাবে। দায় তার, কৃষ্ণার নয়। কৃষ্ণা নিজে খবর দিতে এসেছিল, আর সতীন যেতে পারবে না?

সতীন দাড়ি কামাতে বসল। দিন দুই অন্তর অন্তর সে দাড়ি কামায়। ব্লেডের যা দাম—রোজ দাড়ি কামালে খরচা বেড়ে যাবে। চাকরিবাকরি জুটলে তখন রোজ দাড়ি কামানো চলবে। সতীনের ছোটখাটো কয়েকটা শখ আছে, যেমন গায়ে সাবান মাখতে তার ভাল লাগে, ভাল লাগে মাথার চুলে একটু কিছু মাখতে। এই রকম আর কি! এই সব শখ সতীন এখন মেটায় না। তার আর কাজলের জন্যে মাসে দুটো সাবান বরাদ্দ। কাজল মেয়ে, তার পক্ষে সাবানটা আরও প্রয়োজনীয় ভেবে সতীন নিতান্ত স্নানের সময় হাত মুখ ধোয়া ছাড়া সাবান ব্যবহারই করে না। মাথাটাও দিন দিন রুক্ষ হয়ে উঠেছে। গন্ধ লাগে। কাজলের শ্যাম্পু থেকে কত আর ভাগ বসাবে!

গালে সাবান মাখা শেষ করেছে সতীন হঠাৎ বাড়ির কাছে ট্যাক্সির হর্ন বাজতে লাগল। প্রথমটায় গা করে নি। বার বার হর্ন বাজছে দেখে সতীন সাবানমাখা মুখ নিয়েই সদরে এল। সদরে ট্যাক্সি। জগন্ময়।

"আরে জগা ?"

"কি রে, তোর কোন পাত্তা নেই ?"

"তুই কোত্থেকে ?"

"প্যাসেঞ্জার' নিয়ে এসেছিলাম। তোদের পাড়ায়। ফিরে যাচ্ছি।"

"আমি দাড়ি কামাতে বসেছিলুম," বলতে বলতে সতীন হাত দিয়ে গালের সাবান মুছে ট্যাক্সির পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

"তুই আর গেলি না ?" জগন্ময় বলল।

"যাব, সময় পাচ্ছি না।"

"সময় পাচ্ছিস না ! তোর বাবা কেমন আছেন ?"

"ভাল নয়। খুব খারাপ। লাস্ট ডেজ্... !"

জগন্ময় একটু চুপ করে থাকল। "কোথায় রেখেছিস ?"

"বাড়িতেই আছে।"

"আচ্ছা !"

"মনমেজাজ ভাল নেই, ভাই।"

"তোর কিছু হল ?"

"চাকরি ? না।"

"আমার লাইনে চলে আয় শালা—! তোকে আমি ট্রেনিং দিয়ে দেব।"

"তাই যাব।"

"ভদ্দরলোক টদ্দরলোক হওয়া ছাড়্। ভদ্দরলোক হলে পেটে ভাত জুটবে না। কামাই না করলে তোর ইজ্জত থাকবে না।...চা খাবি ?"

"এখন ?"

"তোদের পাড়ায় চায়ের দোকান বন্ধ নাকি রে ?"

"আমি তো দাড়ি কামিয়ে চান করতে যাচ্ছিলাম। তুই চা খাবি তো বাড়িতে আয়।" সতীন কুণ্ঠার সঙ্গে বলল। বুঝতে পারল না কে তাকে চা করে দেবে। কাজল থাকলে দিত। কমলাদি

যদি দেয়। অথচ বন্ধুকে না ডাকলেও তো সম্মান থাকছে না।

জগন্ময় বলল, "বাড়িতে হুজ্জতি করার কি আছে রে! তুই আয়। চা খেয়ে চলে আসবি।"

সতীন যেন বাধ্য হয়েই জামাটা গায়ে গলাতে বাড়ির ভেতরে ঢুকল।

সতীন বাইরে আসতেই দেখল, মেজদা গলি ছেড়ে রাস্তায়।

জগন্ময় গাড়ি ব্যাক করে রাস্তায় এল।

"সতু, ও ভদ্রলোক কে রে?"

"কোন্ ভদ্রলোক?"

"ধুতি পাঞ্জাবি পরে বেরুল তোদের বাড়ি থেকে?"

"আমার মেজদা। কলেজে পড়ায়।"

"তোর বড়দাদাকে আমি দেখেছি। সেই ট্যাক্সিতে। তোর বাবার সঙ্গে।"

"হ্যাঁ। এ মেজদা।···আগে বাইরের কলেজে পড়াত। এখন কলকাতায়।"

জগন্ময় আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিল। চায়ের দোকানের মুখে এসে বলল, "বিয়ে করেছে তোর মেজদা?"

"না। কেন?"

কি বলবে বুঝতে না পেরে জগন্ময় বলল, "সেদিন হাওড়া স্টেশন থেকে তোর মেজদাকে আমি কনভেণ্ট রোডে নিয়ে গিয়েছি। সঙ্গে একটা মেয়েছেলে ছিল। বয়েস-হওয়া মেয়েছেলে। আমার ভাই বাতচিত কানে আসছিল। সি ইজ্ ক্রশ্চান!" জগন্ময় আর ভেঙে বলল না, "ক্রশ্চান হোস্টেলে উঠল— মেয়েদের।"

সতীন বুঝতে পারল। সুলেখা নামের সেই মহিলা নিশ্চয়।

জগন্ময়ের দিকে তাকিয়ে সতীন অপ্রস্তুতের গলায় বলল, "মেজদার সঙ্গে কলেজে পড়াত। বাইরে।"

"বাতচিতে তাই মালুম হল।"

সতীনের ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করে, আর কী বুঝলি? প্রেমট্রেম মনে হল? ও অন্য লোকের বউ রে!

গাড়ি থামিয়ে জগন্ময় নামল।

সতীনও নামল। তার ভাল লাগছিল না। মেজদা লুকিয়ে লুকিয়ে কী করছে? মেয়েটাকে কলকাতায় টেনে আনল নাকি? তার কাছে আসা-যাওয়া করে? কী করছে মেয়েটার সঙ্গে?

অন্যমনস্ক, বিমূঢ় ভাবে সতীন জগন্ময়ের সঙ্গে চায়ের দোকানে ঢুকল।

॥ আঠারো ॥

কাজল বাচ্চুকে দেখতে পেয়ে গেল। ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউসের তলায় বাচ্চু বা উজ্জ্বল দাঁড়িয়েছিল। অপেক্ষা করছিল কাজলের!

বাচ্চু যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে তাতে চোখে না পড়ে যায় না। ঘন বেগুনী রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবি; বুকের কাছটায় ফিতে বাঁধা, বোতাম নেই। রীতিমত আলখাল্লার মতন ঝুল। পরনে খদ্দরের পাজামা। কাঁধে এক লম্বা ঝোলা। মাথার চুল ঘাড়ে নেমেছে। মাঝখানে সিঁথি। আজকাল আবার দাড়িগোঁফ রাখার শখ হয়েছে বাচ্চুর।

কাজলের খানিকটা লজ্জাই করছিল। বাচ্চুর সঙ্গে সে এভাবে একা একা বেশী দেখাসাক্ষাৎ করে নি। আগে আর বার দুই মাত্র। আজ এসেছে বাচ্চুর কথায়। মানসীও জানে না। জানে না যে, বাচ্চু চিঠি লিখে কাজলকে আসতে বলেছে। কলেজে পা দিয়েই কাজল পালিয়ে এসেছে বাচ্চুর সঙ্গে দেখা করতে।

কাছাকাছি এসে কাজল মুখটা গম্ভীর করল। বাচ্চুর কোনো বুদ্ধিসুদ্ধি নেই নাকি! এভাবে কেউ চিঠি লেখে বাড়িতে? যদি কারও হাতে পড়ত!

বাচ্চু ডাকল, "হ্যাই··· !"

কাজল কাছে এসে দাঁড়াল।

বাচ্চু বলল, "আধ ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি। ট্রাম দেখছি। পা ব্যথা হয়ে গেল।"

কাজল কোনো জবাব দিল না, বাচ্চুর সাজপোশাক আড়চোখে দেখতে লাগল।

"কলেজ থেকে ক্লাস করে এলে?" বাচ্চু জিজ্ঞেস করল।

"না।"

"মান্নু এসেছে?"

"দেখলাম।"

"কিছু বলল না?"

"আসবার সময় দেখতে পায় নি।"

"...তা হলে! কোথায় বসবে? কফি হাউস?"

"না না," মাথা নাড়ল কাজল। ভিড়ের মধ্যে সে যেতে চায় না। কোথা থেকে কে দেখে ফেলবে। দাদার বন্ধুদের আনাগোনা আছে কফি হাউসে।

বাচ্চু বলল, "তা হলে ধর্মতলায় চল।"

"দেরি হয়ে যাবে," কাজল বলল, "আমায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে আজ।"

"কেন? তোমার বাবা কী..." কথাটা বাচ্চু শেষ করল না।

"ভাল নয়। খুব খারাপ।"

বাচ্চু বলল, "ঠিক আছে; চল মার্কেটের ভেতর বসন্ত কেবিনে যাই। এখন দুপুরবেলা। একেবারে ভিড় হবে না।"

দুজনে বসন্ত কেবিনে এল। ভিড় নেই। চায়ের দোকানের ছেলেরা বোধ হয় বাচ্চুর চেনা। চেনা মুখে হাসল।

টেবিলের দুদিকে বসল দুজনে, আড়ালে।

কাঁধের ঝোলা নামিয়ে রেখে বাচ্চু বলল, "কী খাবে?"

"কিছু না।"

"সে কী!"

"ভাত খেয়েছি খানিক আগে—।"

"ও হজম হয়ে গেছে। কিছু খাও।"

কাজল মাথা নাড়তে লাগল

বাচ্চু শুনল না। চা ওমলেট আনতে বলল।

একটা চারমিনার ধরিয়ে বাচ্চু দেশলাই নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, "কেমন ধোঁকা দিলাম, বল!"

তাকাল কাজল। বলল, "ধোঁকা?"

"চিঠির খামে কার হাতের লেখা ছিল? মানুর।"

তা অবশ্য ঠিক। কাজল যে চিঠিটা পেয়েছিল তার খামের ওপর মানসীর হাতে লেখা ঠিকানা ছিল; ভেতরে বাচ্চুর চিঠি। মানসীর চিঠি ভেবেই খাম খুলেছিল কাজল। বাচ্চুর চিঠি দেখে অবাক হয়েছিল।

কাজল বলল, "মানসী জানে?"

"না। সে অনেক কায়দা করে লিখিয়ে নিয়েছি সাদা খামে। স্ট্যাম্প পরে মেরেছি। মানুকে বলেছিলাম, আমাদের এক বন্ধু একজিবিশান করছে, কিছু চিঠি এদিক ওদিক পাঠিয়ে দেব। কাজলের ঠিকানা লিখে দে।" বলে বাচ্চু হাসল। ছেলেমানুষি হাসি।

কাজলেরও হাসি পাচ্ছিল। ছেলে খুব চালাক।

সিগারেটে জোরে টান দিয়ে বাচ্চু বলল, "আমার তো হয়ে গেল।"

তাকাল কাজল। কী হয়ে গেল জানতে চাইছে।

বাচ্চু কাজলের চোখে চোখ রেখে বলল, "কলেজ ফিনিশ। এবার একটা ধান্ধায় লাগতে হবে। একটা চাকরি নেব না ফ্রি লান্স করব তাই ভাবছি।"

কাজলের হঠাৎ দাদার কথা মনে পড়ল। দাদাও চাকরি চাকরি করে মরছে। বাচ্চুও তাই। লেখাপড়া শেখা, ছবি আঁকা শেখা—সবই চাকরির জন্যে। মেয়েদের যেমন—যাই শেখো, যতই পড়ো, শেষবেশ বিয়ে করেই সংসার আগলানো, ছেলেদেরও সেই রকম—যাই

করো শেষ পর্যন্ত চাকরি, না হয় অর্থ রোজগার।

"চাকরি পেয়েছ ?" কাজল জিজ্ঞেস করল।

"কোথায় পাব! চাকরি কি রাস্তায় গড়াগড়ি দিচ্ছে!" বলতে বলতে বাচ্চু তার ঝোলার মধ্যে থেকে একটা খসখসে জ্যাকেট বের করে গায়ে চাপাল। দোকানের মধ্যে শীত করছে। বলল, "আমার এক মেসোমশাই আছে। পাবলিসিটিতে। ভাবছি ধরব। হাত আছে মেসোমশাইয়ের। ধরলে লেগে যেতে পারে।"

কাজল ভাবল, তাদের এক মেসোমশাই থাকলে বেশ হত; দাদারও লেগে যেতে পারত।

সামান্য চুপচাপ থেকে বাচ্চু আবার বলল, "তোমার বাবার কি খুব সিরিআস অবস্থা ?"

মাথা হেলাল কাজল।

"মানু তাই বলছিল," বাচ্চু বলল। "ক্যানসার রোগটাই বাজে।... আমার তো প্রায়ই মনে হয় পেটে এক বেটা ক্যানসারের বাচ্চা লুকিয়ে আছে।" বলে হাসল।

কাজল কিছু বলল না। বাবার জন্যে তারা সকলেই মনে মনে তৈরি। তাদের দুঃখকষ্ট যতই হোক বাবার কষ্ট আর সহ্য করা যায় না।

বাইরে গলি মতন পথটায় রোদ রয়েছে। মার্কেটের মধ্যে এখন কেমন থিতোনো অবস্থা। হই-হট্টগোল নেই। যেন শীতের দুপুর আলস্য পোয়াচ্ছে।

ওমলেট এল।

বাচ্চু হাত বাড়িয়ে গোলমরিচ আর নুনের পাত্র নিল। ছিটোতে লাগল।

কাজল হঠাৎ বলল, "বাড়িতে চিঠিফিঠি লিখো না এখন।"

তাকাল বাচ্চু। "কেন ?"

"বলছি।"

"তোমার বাড়িতে চিঠি পড়ে ?"

"পড়ে না। তবে পড়তে পারে। দাদার হাতে পড়লে…"

"সতীনদা ?"

সতীনদা! কাজল অবাক হল প্রথমে; তারপর কেমন কৌতুক বোধ করল। দাদা কবে বাচ্চুর কাছে সতীনদা হয়ে উঠল? এত খাতির! অবশ্য দাদা বাচ্চুর চেয়ে সামান্য বড় হতে পারে বয়েসে, দু-এক বছর।

কাজল খুব হাল্কা ভাবে ওমলেট খেতে খেতে বলল, "দাদা খুব চালাক।"

"চালাক ?"

"ঠাট্টা করে।"

"এই কথা! করুক।"

"বা রে, করুক!"

বাচ্চু ওমলেট খেতে খেতে হাসল। "করলে ক্ষতি কি! তুমি চুপ করে থাকবে।"

কাজলের কেমন লজ্জা লাগল। মুখ নীচু করে চামচ দিয়ে ডিমের টুকরো কাটতে কাটতে কিছু বলবে ভাবল, অথচ বলল না। দাদা এই সব আর্টিস্টটার্টিস্ট পছন্দ করে না। বলেছিল, ধ্যুৎ, ছবি এঁকে পেট ভরবে নাকি! দাদার কোন্ কবিবন্ধু—এককালে কবিতা লিখত, এখন মশামারা ধূপ বেচে বেড়ায়। কথাটা ভাবলেই হাসি পায়, দুঃখও হয়। এদিকে কাজল বাড়িতে শুনেছে—মেজদা কোথায় নাকি একটা ভাল ছেলে দেখে এসেছে। এসব কথা একেবারে হালফিলের। বাবার অসুখের বাড়াবাড়ির জন্যে কোনো কথা হচ্ছে না। দিদি আজ বাড়িতে আসবে। হয়ত থাকবে দু-চার-দিন। বাবার জন্যেই আসবে। তখন হয়ত কথা হবে।

কিন্তু, কাজলের হঠাৎ খেয়াল হল, এ সব কথা সে ভাবছে কেন! বাচ্চুকে সামনে বসিয়ে এত কথা ভাবার কোন দরকার নেই।

ওমলেট মুখে দিয়ে কাজল দেখল চা এসে গেছে।

বাচ্চু বলল, "তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াই মুশকিল। সারাদিন

বাড়িতে বসে থাক। বাইরে বেরোও না কেন?"

কাজল কি বলবে! বাইরে বেরুনোর স্বভাব তাদের বাড়ির মেয়েদের নেই।

"দু-একদিন বেরুতে পার।" বাচ্চু বলল।

"এই তো বেরিয়েছি।"

"বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া—" বাচ্চু হাসল। "তুমি একেবারে সেকেলে।"

"কি জানি!"

"এবার একটু একেলে হও।"

"কেন?"

"বাঃ! হও। একালের মেয়ে একালের মতন হবে না!"

"হলে কী হবে?"

চা মুখে দিয়ে ঢোঁক গিলল বাচ্চু। "অন্ততঃ আমার উপকার হবে।"

"উপকার!"

"ভাল লাগবে আমার," বাচ্চু বেশ উজ্জ্বল মুখে বলল।

কাজল তাকাল। মুখ নামিয়ে নিল। বাচ্চুর ভাল লাগবে! কাজল সামান্য যেন অস্বস্তি বোধ করল। চোখের পাতা ফেলল বার কয়েক। তার পর হঠাৎ কেমন খুশি হয়ে উঠল। কেন যেন বুকের মধ্যে সির সির করে উঠল।

মুখ আরও নামিয়ে কাজল চা খেতে লাগল।

॥ উনিশ ॥

যা ঘটার সেই সকালেই ঘটে গেছে, একেবারে ভোরের দিকে, তখনও বোধ হয় তেমন করে ফরসাও হয় নি, কাক-টাকও ডাকছিল না। এখন রাত। দশটা না এগারোটা কে জানে। সেই ভোর থেকে এই রাত পর্যন্ত যা ঘটে গেল সতীশের কাছে মাঝে মাঝেই তা মিথ্যে বলে মনে

হচ্ছে। যেন যা ঘটে গেছে সেটা কোন ঘোরের মধ্যে দেখা দুঃস্বপ্ন। এ-রকম মনে হলেও সত্যি সত্যি কিছুই তো মিথ্যে নয়, এই এতটা রাতের নিমতলা স্ট্রীট, শ্মশানের বিশ্রী গন্ধ, গঙ্গার বাতাস, কাঠগোলা ধরনের গুদোমবাড়ি, টিমটিমে বাতি-জ্বলা দু-একটা পান-বিড়ির দোকান —এ সবই সত্যি। ওই তো আর এক দল লোক 'বলো হরি' ধ্বনি দিয়ে চলে গেল শ্মশানে। আসলে এটাই সত্যি, শ্মশান থেকে সতীনরা ফিরে যাচ্ছে : বাবা আর নেই, বাবার সবটাই চিতার আগুনে শেষ হয়ে গেছে। কালকেও বাবা ছিল, আজ শেষ রাত পর্যন্ত. অথচ এখন আর নেই। কোথায় গেল ? কাঠের ছাই হয়ে শ্মশানে পড়ে থাকল ? না ধোঁয়ায় বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেল ?

বাবা আর নেই, তবু মন যেন বলছে, বাড়ি ফিরে গিয়ে দোতলার সেই চৌকো মতন ঘরে বাবাকে আবার যেন দেখতে পাবে সতীন, নিজের বিছানায় শুয়ে আছে, পায়ের দিকের জানলার খড়খড়ি ভেজানো, মাথার দিকে ছোট দেরাজ, দেরাজের অনেকটা ওপরে সেই অচল ওয়ালক্লক, বাবার বন্ধুরা বাবাকে কাজ থেকে রিটায়ার করার সময় উপহার দিয়েছিল। ওটা আর চলত না। বাবাও সারাতে দিত না। কী আশ্চর্য, বাড়ি ফিরে গিয়ে বাবার ঘরে দাঁড়ালে সতীন সবই দেখতে পাবে, বাবার জামা-কাপড়, ছড়ি, চশমা, তুলোর গেঞ্জি, নিত্যপাঠ্য ধর্মের বই, মার একটা ছবি—বড়দাকে কোলে করে বসে আছে। ছবিটার কিছুই আর দেখা যায় না, সবই ফ্যাকাশে, তবু বাবা ওটা বড় আদর করে ঝুলিয়ে রেখেছিল।

সবই আছে। শুধু বাবাই আর নেই। আজ ভোরের দিকে চলে গেল। শেষ সময় কাউকেই আর বিব্রত করল না। হুড়োহুড়ি করতে দিল না। দিদি বাবার ঘরে একপাশে মাটিতে শুয়ে ছিল, দিদিকেও বাবা জানতে দিতে চায় নি ; কেমন করে যেন ঘুম ভেঙে ধড়ফড় করে উঠে দিদি দেখল বাবার গলায় ঘড়ঘড়ে একটা শব্দ হচ্ছে, তারপর সেই শব্দ থেমে গেল। তারপর দিদির ছোটাছুটি, দাদার হুদ্দাড় ওঠানামা, কান্না, ডাকাডাকি—যেন সমস্ত বাড়িটাই নিমেষে গা-ঝাড়া

দিয়ে বাবার ঘরে ছুটে গেল। সতীন জেগে উঠে দেখল বাবা চলে গেছে।

পাড়ার লোক, প্রতিবেশী বন্ধুটন্ধু, আত্মীয়স্বজন জমতে জমতে বেলা গড়িয়ে গেল। দুপুরেরও পর তারা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে বাবাকে ধুতিচাদর পরিয়ে, গলায় মালা, মাথার পাশে ফুলের তোড়া দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে। সেই বাবাকে এখন নিমতলার শ্মশানে ছাই করে রেখে তারা ফিরে যাচ্ছে। একদিন মাকেও তারা এনেছিল এই শ্মশানেই। বড়দার ইচ্ছে ছিল মাকে যে চিতায় দাহ করা হয়েছিল—বাবাকেও সেই চিতায় দাহ করা হোক। পাওয়া গেল না চিতাটা। অন্য কারুর দাহ হচ্ছিল। অগত্যা যেটা পাওয়া গেল বাবাকে সেখানেই শোওয়ানো হল। সব চিতাই তো এক।

সতীন অনুভব করল তার গা ঘেঁষে উমানাথ কিছু বলছে।

"এই ?"

তাকাল সতীন।

উমানাথ বলল, "গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নে না, আমারটা নে।"

মাথা নাড়ল সতীন।

"তুই বুঝতে পারছিস না", উমানাথ আবার বলল, "এত রাত্তিরে গঙ্গায় চান করলি, এই রকম শীত···, ঝপ করে ঠাণ্ডা লেগে গেলে বিপদে পড়বি।"

"ঠাণ্ডা লাগবে না।" সতীন বসা গলায় বলল।

কোরা কাপড়ের গন্ধ নাকে লাগছিল সতীনের। গায়ে এক টুকরো মার্কিন জড়ানো। মাথার চুল রুক্ষ, এলোমেলো, এখনও যেন জল শুকোয় নি। সতীন সামনে তাকাল, পাঁচ-সাত পা দূরে মেজদা, জামাইবাবু, পাড়ার পুরুত, মেজদার এক বন্ধু বিজয়দা। আরও সামনের দিকে বড়দার শ্বশুরবাড়ির দু-তিনজন আত্মীয়। বড়দা এইমাত্র রিকশায় উঠল তার এক শালাকে নিয়ে, খালি পায়ে হাঁটতে পারছে না। কষ্ট হচ্ছে। রিকশাটা এগিয়ে গিয়েছে সামান্য।

সতীনের পাশে উমানাথ। হাত-দুই পিছনে সতীনের আরও কজন

পাড়ার বন্ধু, তারক তুলু স্বপন। এরা আজ অনেক করেছে। সেই সকাল থেকেই তো ছোটাছুটি করছে, কোথায় খাট, কোথায় ফুল, কোথায় মাটির হাঁড়ি, খই। বাড়িতে ভিড়ও হয়েছিল কম নয়। পাড়ার কত লোকই না জুটেছিল। বাবার সমবয়সীরা প্রায় সকলেই এসে ঘুরে গেছে, পরামর্শ দিয়েছে। বড়দার শ্বশুরবাড়ির অনেকেই জুটেছিল। তারা সবাই বড়দা আর বউদিকে নিয়ে ব্যস্ত, যেন যে মানুষটা গেছে সে শুধু বড়দার বাবা। পিতৃশোক একা তারই। মেজদার দু-চারজন বন্ধুও—কলেজের—দুপুরের আগেই এসেছিল। ছিল কিছুক্ষণ। বিজয়দা মেজদার কলেজের বন্ধু নয়, পাড়ার বন্ধু। বিজয়দা আগাগোড়াই সঙ্গে রয়েছে। সঙ্গে রয়েছেন জামাইবাবু। বাস্তবিকপক্ষে জামাইবাবুই কী কী করতে হবে তার পুরো ভার নিয়ে এই কাজটা শেষ করেছেন। পান-খাওয়া ওই মানুষটা—যাকে সতীন শুধু বকেশ্বর ভাবত, সেই মানুষটিই এমন বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা করে সব করে গেলেন।

কেন কে জানে, সতীনের আজ জামাইবাবুকে বড় ভাল লাগছিল। অবশ্য সত্যি সত্যি যে খারাপ লাগত জামাইবাবুকে তা নয়, ওই যে চাকরি জুটিয়ে দেব জুটিয়ে দেব করেও কিছু করতে পারছিলেন না—তাতেই যেন মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল সতীনের। জামাইবাবুকে শুধু নয়, আজ এখন অনেককেই ভাল লাগছিল সতীনের, যেমন বিজয়দাকে, উমাকে, তারকদের। এরা এমন করে এসে দাঁড়িয়েছে—যেন সতীনদের সঙ্গে তাদের একটা সম্পর্ক রয়েছে। নিজেকে এভাবে দেখলে কেন যেন ভাল লাগে।

"সতু ?" তারক ডাকল।

"বল্ ?"

"একটু থেমে যা।" তারক বলল, "মেজদারা এগিয়ে যাক, একটা সিগারেট টেনে নে।"

"তোরা খা, আমার ভাল লাগছে না।"

"তোর শীত ধরে গেছে, কাঁপছিস ; গা গরম করে নে।"

সতীনের শীত না করছিল এমন নয়, কিন্তু সর্বক্ষণ সেটা খেয়াল

হচ্ছিল না। সহ্য হয়ে আসছিল ; কিংবা সে সহ্য করে নিচ্ছিল। এই রকমই হয়ত হয়, সকাল থেকে যা ঘটে যাচ্ছে একটার পর একটা তাতে স্বাভাবিক বোধ অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে পড়েছে। এভাবে খালি পায়ে কলকাতার রাস্তায় হাঁটা নিশ্চয় কষ্টকর—তবু সতীন হেঁটে যাচ্ছে, পায়ে লাগছে তবু হাঁটছে। মেজদাও। মেজদার তো আরও কষ্ট হওয়া উচিত, বাড়িতেও মেজদা খালি পায়ে থাকে না। মা-বাবা মারা গেলে এসব কষ্ট সহ্য করতে হয়, সকলেই করে, সতীনরা নতুন কিছু করছে না।

কিন্তু বড়দার কাণ্ডটা সতীনের ভাল লাগে নি। কেমন রিকশায় উঠে শালার সঙ্গে চলে গেল। খালি পায়ে হাঁটতে পারছে না, মাথা ঘুরছে, আরও কত কি হচ্ছে বড়দার। ভাগ্যিস মেজদার শালা নেই, তা হলে হয়ত মেজদাকেও রিকশায় চাপিয়ে নিয়ে চলে যেত। মানুষ বড় স্বার্থপর! শ্বশুরবাড়িটাড়ি থাকলে আরও স্বার্থপর হয়ে ওঠে।

এলোমেলো ভাবে দু-চারটে কথা মনে হবার পরই সতীনের আবার সকালের কথা মনে পড়ল। বাবা মারা যাবার পর বড়দা যা করছিল, একেবারে পাগলের মতন কাণ্ড। বুক চাপড়াচ্ছে, হাউমাউ করে কাঁদছে, বাবার পায়ে মাথা ঠেকাচ্ছে বার বার, তারপরই দৌড়ে পায়খানায় যাচ্ছে, ফিরে এসে নিজের ঘরে মাটিতে শুয়ে নিজের বুক ধড়ফড় থামাবার জন্যে ওষুধ খাচ্ছে। কত রকমই না করছিল। বাবার চেয়ে তখন বড়দাই যেন চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছিল। বউদি তার কান্নার পালা সামলে নিয়ে বড়দাকে নিয়ে পড়ল। বুকে হাত বোলাচ্ছে বড়দার, সরবত করে দিচ্ছে, ওষুধবিষুধ খাওয়াচ্ছে।

দিদি না থাকলে বাবার দিকে বোধ হয় কারুর নজরই পড়ত না—এমনই হাল করে তুলল বড়দা। দিদি বেশ রেগে গিয়েছিল। বউদিকে একবার কড়া কথাও বলেছে। বউদি কোন জবাব দেয় নি, কিন্তু মুখ দেখে মনে হল পরে বোঝাপড়া করে নেবে। সব চেয়ে আশ্চর্য, বাবা মারা যাবার পর-পরই বউদি বাবার ছোট দেরাজের চাবিটা নিজের ঘরে রেখে দিয়ে এল। যদি না দিদি বাবার তসরের চাদরটার খোঁজ করত

বাবাকে সাজাবার জন্যে—কেউ জানতেই পারত না বউদি চাবি সরিয়ে রেখেছে।

সতীন সংসারের এই সব নোংরামি খুঁটিয়ে দেখতে চায় নি। কে-ই বা চায়। তবু দেখতে না চাইলেও কিছু কিছু ধরা পড়ে যায় অত্যন্ত স্পষ্ট বলে। প্রথমে বড়দার পাগলামি দেখে সতীনের মনে হয়েছিল—বাবাকে হারানোর দুঃখ বড়দারই সব চেয়ে বুঝি বেশী লেগেছে। বড় ছেলে বলেই হয়ত। পরে তার মনে হল, বড়দা নাটুকে কাণ্ড করছে। নয়ত ফুল কেনার জন্যে কুড়িটা টাকা দেবে, না পনেরো টাকাতেই হবে এ নিয়ে কেউ ও-সময়ে মাথা ঘামায় না।

মেজদাকেই সতীন অন্যরকম দেখল। কোনো রকম চেঁচামেচি নেই, হইচই নেই। ঘরে দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ, চোখ সামান্য ছলছল করছে। একবার শুধু বাবার মুখে হাত বোলাল, পায়ের কাছে বসল একটু, তখন দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, মুখ ভারী, ঠোঁট কাঁপছে। এরপর আর মেজদা ঘরে থাকল না, নীচে নেমে গেল।

খুকিও বড় কান্নাকাটি করছিল। কিন্তু বাবার ঘরে বসে নয়। খুকিকে দেখে মনে হচ্ছিল, তার কথা সে যেন কাউকেই বলতে পারছে না। কেউ ওর দিকে তাকাবে এমনও সে মনে করছে না। একই বাড়ি, যে চলে গেল সে সকলেরই বাবা, তবু দেখ এমন একটা ভাব হয়ে থাকল, যেন বড়দা ছাড়া আর কারুর বাবা মারা যায় নি, সকলেরই নজর বড়দার দিকে। অন্যরা তেমন কিছু নয়। অন্তত সতীন আর খুকি তো নয়ই।

বড়দার ছেলেমেয়েকে সতীন দোষ দিচ্ছে না। তারা একেবারেই ছেলেমানুষ। অন্যদের দেখাদেখি তারাও একটু কাঁদল। কিন্তু বউদি কোন্ আক্কেলে ছেলেমেয়েদের মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিল সতীন বুঝতে পারল না। শোকের বাড়িতে তারা সময় মতন দুটি খেতে পারবে না, শুতে পারবে না বলেই নাকি? নাকি বড়দা বউদি চায় নি, ওই বাচ্চারা এই শোকের পর্বটা সব দেখুক। যাক গে, যাদের ছেলেমেয়ে তারা বুঝবে, সতীনের আর কী। মণি বুলু সন্ধ্যেবেলায় তো ফিরে আসছে

মামার বাড়ি থেকে।

"সতু?" উমানাথ আবার ডাকল।

সতীন কোনো জবাব দিল না।

অপেক্ষা করে উমানাথ বলল, "ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। এতে ভালই হল। মেসোমশাই কতদিন ধরে কষ্ট পাচ্ছিলেন ভেবে দেখ। কিছু তো করার ছিল না। তিনি শান্তি পেলেন।"

সতীন এবারও কিছু বলল না। কথাটা আজ সারাদিনে হাজার বার শোনা হয়ে গেল। যে শুনছে, বাড়িতে আসছে, সান্ত্বনা দিচ্ছে—সকলেই ওই একই কথা বলছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। কেননা বলার আর কিছু নেই। উমানাথও কতবার এই একই কথা বলল। কেন বলছে? সতীনকে সান্ত্বনা দিচ্ছে? আর কত দেবে? সতীনের এখন আর সান্ত্বনার দরকার নেই।

কথাটা ঘোরাবার জন্যে সতীন নিজেই বলল, "এটা কোন্ রাস্তা রে?"

"কি জানি! নামটাম জানি না।"

"আর খানিকটা এগিয়ে বিডন স্কোয়ার?"

"ওই তো—এসে পড়েছি।"

"কলকাতার রাস্তা রাত্রে কেমন দেখায় যেন—।"

উমানাথ একটা সিগারেট ধরাল। তার শীত করছে। গায়ে কালো রঙের একটা মেয়েলী চাদর। সতীনকে দিতে চেয়েছিল; নেয় নি সতীন।

"সতু, একটা সিগারেট টেনে নে।" উমানাথ আবার বলল।

পেছনে তারকরা কথা বলতে বলতে আসছে, একেবারে নিরিবিলি পথ, দু-চারটে ভিখিরি, মাতাল আর রাস্তার কুকুর ছাড়া তেমন কিছু চোখেও পড়ছে না। দূর দিয়ে একটা পুলিস ভ্যান চলে যাচ্ছিল।

ইচ্ছে ছিল না, তবু উমানাথের মন রাখতেই সতীন সিগারেট নিল। জামাইবাবু, মেজদা, বিজয়দা এগিয়ে রয়েছে। সিগারেট ধরিয়ে সতীন

মুঠোর মধ্যে আড়াল করে রাখল, যাতে জামাইবাবুরা মুখ ফেরালে দেখতে না পান।

সিগারেটে টান দিয়ে সতীনের ভালই লাগল। শীতের জন্যে। গঙ্গায় স্নানের পর তার কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল। বড়দার কুটুমরা খুব কাজের লোক। বড়দার জন্যে শালটাল নিয়ে এসেছিল। স্নানের পর ঝপঝপ বার করে দিল। মেজদা কিংবা সতীনের জন্যে কেউ কিছু আনে নি। আনার কথা ছিল। দিদি বলে দিয়েছিল, তাড়াহুড়োয় ভুল হয়ে গেছে। আসলে বড়দার সুখসুবিধের দিকে চোখ রাখার অনেক লোক, মেজদার বা তার তেমন কেউ নেই। মেজদাকে অবশ্য জামাইবাবু একটা খদ্দরের চাদর কেমন করে যে যোগাড় করে দিয়েছে।

তারক পেছন থেকে বলল, "কি রে, তুই টলে পড়ছিস নাকি ?"

সতীন বুঝতে পারল না। তার মাথা টলেছে বলে তার মনে হল না। বলল, "না, ঠিক আছি।"

ঠিক আছি বলা সত্ত্বেও সতীন শরীরের কথা খেয়াল করতেই খানিকটা দুর্বলতা বোধ করল। সকাল থেকে পেটে প্রায় কিছুই পড়ে নি, কাপ দুই-তিন চা, এক গ্লাস সরবত। ক্ষুধা তৃষ্ণা যাকে বলে তাও সতীন অনুভব করে নি। এসব সময় মানুষের মনেও থাকে না কিছু, সতীনের এমনও মনে হল, সারাদিনে সে একবার পেচ্ছাপও যেন করে নি, শরীরের সমস্ত জল যেন শুকিয়ে গেছে। চোখ জ্বালা করছিল। মাথাটাও ভার। পেট শক্ত হয়ে রয়েছে।

"এখন তোর সময়টা ভাল যাবে না—", উমানাথ বলল সতীনের গা ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে।

জবাব দিল না সতীন।

"একে গুরুদশা বলে জানিস", উমানাথ বন্ধুকে বোঝাচ্ছিল, "মা-বাবা মারা গেলে গুরুদশা চলে। আমার বাবা মারা যাবার পর একটা বছর যা চলেছিল···মেরে ফেলেছিল মাইরি। এখন তোকে একটু সাবধানে থাকতে হবে।"

সতীন কিছু বলল না। গুরুদশাটশা সে বোঝে না। বাবা মারা

যাবার আগেও তার এমন কি ভাল চলছিল? খারাপটা এমনিতেই তার চলবে। বাবা বেঁচে থাকলেও চলত। তবু তার ভাল বা খারাপের জন্যে বাবার বেঁচে না থাকার কোনো মানে হয় না।

অবশ্য সতীন ভেবে দেখেছে, বাবা যে চলে গেল এতে বাবার কষ্টটা বাঁচল। সকলেই এটা বলছে। বাবার দিন যে ফুরিয়ে এসেছিল সবাই সেটা জানত: দাদারা, দিদি, জামাইবাবু, সতীন, খুকি সকলেই জানত। মনে মনে তৈরী ছিল তারা। দিদি বাবার শেষ সময়ে কাছে থাকার জন্যে এ-বাড়িতে চলেও এসেছিল। কাজেই একেবারে আচমকা কিছু ঘটে নি, আঘাতটা সকলেই সহ্য করে নিতে পেরেছে। বড়দা ছাড়া কেউই বাড়িতে নাটুকে কাণ্ডও করে নি। সতীনও নয়। আরও কিছুটা রাস্তা শেষ হল। বিডন স্কোয়ার কয়েক পা মাত্র, চিৎপুরের ট্রাম লাইন যেন ঘুমিয়ে রয়েছে। ভাঙাচোরা একটি লরি পড়ে আছে এপাশে, লরির তলায় দিব্যি এক ভিখিরির সংসার। ধোঁয়া আর কুয়াশা কেমন চাপ হয়ে আছে পার্কের দিকে তাকালে বোঝা যায়। বাতাসে আবর্জনার দুর্গন্ধ।

উমানাথ বলল, "তোদের বাড়িতে এখন কিছুদিন খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগবে।"

সতীন অন্যমনস্ক ভাবে শব্দ করল। উমানাথ কোন কথা পাচ্ছে না বলার, যখন যা মনে আসছে এলোমেলো বলছে। কান করল না সতীন।

হঠাৎ তার কৃষ্ণার কথা মনে পড়ল। কাল সন্ধ্যেবেলা কৃষ্ণার বাড়ি গিয়েছিল সতীন, না গিয়ে উপায় ছিল না। বাড়ি বয়ে এসে খবর দিয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণা, খুকিকে বলে গিয়েছিল সতীন যেন অবশ্যই দেখা করে। ওখানে গিয়ে সতীন খানিকটা মুশকিলেই পড়েছিল। দুপুরে ঘুমোবার ওষুধ খেয়ে কৃষ্ণা টানা ঘুম দিয়ে সবে উঠেছে সতীন গিয়ে হাজির। কৃষ্ণার চোখমুখ ফোলা, ঘুম-ঘুম ভাব, একটু কেমন জড়ানো জিব। বার বার হাই তুলছিল। দিন-দুই নাকি একেবারে ঘুমোতে পারে নি কৃষ্ণা, ছটফট ছটফট্ করেছে, তারপর আজ দুপুরে বেশী করে ওষুধ

খেয়ে শুয়ে পড়েছিল। পাগল! কৃষ্ণার মধ্যে সত্যিই পাগলামির লক্ষণ আছে।

কৃষ্ণা সতীনকে একটা কথা বলেছিল কাল। বলেছিল, কৃষ্ণাদের যেসব বিষয়-আশয় আছে, তার দেখাশোনা করার জন্যে বাড়িতে বুড়ো সরকারবাবু রয়েছেন। ভদ্রলোক বিশ্বাসী, অনেক দিনের পুরনো, তাঁর কাজকর্মও পুরোনো ধাঁচের। সতীন এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কাজকর্ম শিখতে পারে। বুড়ো আর ক'দিন, তারপর সতীনকেই কৃষ্ণা রেখে দেবে।

"তুমি কিরকম মাইনে এখন চাও, বল? আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" কৃষ্ণা সাফসুফ বলেছিল।

সতীন এ-ধরনের চাকরির কথা ভাবে নি। অফিসে-টফিসে, ব্যাঙ্কে, কারখানায় মানুষ চাকরি করে—লোকের বাড়িতে আবার কিসের চাকরি? এরকম চাকরির কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। সতীনদের বাড়িতে দাদারা ভাববে, মিথ্যে কথা বলছে সে, কোন আজেবাজে পাল্লায় পড়েছে।

কৃষ্ণাকে সতীন ভয় পায়। পাগল, জেদী, খেয়ালী মেয়ে কৃষ্ণা। মুখের সামনে কিছু বলার মতন সাহস তার হয় নি। কোনো রকমে মাথা নেড়ে গিয়েছে। তাতে সম্মতি অসম্মতি দুইই বোঝাতে পারে। তা ছাড়া কৃষ্ণা কোন্ খেয়ালে কখন কী বলে তাই বা কে বলবে!

রাত্রে বাড়ি ফিরে সতীন বোনের সঙ্গে খানিকক্ষণ কৃষ্ণার গল্পও করেছিল। চাকরির ব্যাপারটা সে তেমন করে বলে নি। তারপর খুকি ঘুমিয়ে পড়লে সতীন ভাবছিল, কৃষ্ণার বাড়িতে চাকরিটা সত্যিই যদি নেয় তা হলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে? কৃষ্ণা কি তার সঙ্গে চাকর-বাকরের মতন ব্যবহার করবে? নাকি সতীনকে তার ডান হাত করে নেবে? এটাও কিন্তু আশ্চর্যের যে কৃষ্ণার মতন মেয়ে সতীনকে হঠাৎ এত সহানুভূতি, দয়া-মায়া দেখাচ্ছে! কেন?

রাত্রে এই সব ভাবতে ভাবতে সতীন ঘুমিয়ে পড়েছিল। বোধ হয় স্বপ্নও দেখেছিল কৃষ্ণাকে। বোধ হয় কেন, সত্যিই দেখেছিল;

ট্যাক্সির মধ্যে কৃষ্ণা আর সতীন, কৃষ্ণার কোলের ওপর একটা লোমে ভরা কুকুর বাচ্চা, তার গায়ে গাল ঘষছে কৃষ্ণা। সতীনের ভাল লাগছিল না।

যখন ঘুম ভাঙল সতীনের, খুকি পাগলের মতন তাকে ডাকছে। কিছু না বুঝেই সতীন লাফ মেরে উঠল, ছুটে গেল ওপরে। ঘরে বাতি জ্বলছে। দিদি বাবার পায়ের কাছে মুখ রেখে কাঁদছে, দাদা হায় হায় করছে।

সতীনের চমক ভাঙল। জামাইবাবুরা দাঁড়িয়ে গেছেন। ডাকছেন।

কাছে এল সতীনরা।

আশুতোষ বললেন, "অত পিছিয়ে থাকছ কেন, একসঙ্গে এসো।"

সতীনের বন্ধুরা মেজদাদের সঙ্গেই চলতে লাগল। বিডন স্কোয়ার ছাড়িয়ে, মিনার্ভা থিয়েটার পেরিয়ে তারা সেনট্রাল অ্যাভিনুর মুখে এল। ফাঁকা রাস্তা। কদাচিৎ দু-একটা গাড়ি চলে যাচ্ছিল।

এতগুলো লোক তারা একসঙ্গে হাঁটছে, পায়ের শব্দও শোনা যাচ্ছে, কিন্তু কারুর মুখেই যেন কথা নেই। প্রায় চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছিল সকলে।

হেঁটে যেতে যেতে আশুতোষ হঠাৎ মহীনকে বললেন, "তোমাদের একটা পর্ব শেষ হল, মহী। মা-বাবা যতদিন বেঁচে থাকে আমাদের একটা বাঁধাবাঁধি থাকে সংসারে। তারপর আজকাল আর সেই সংসারটা থাকে না। শ্বশুরমশাই থাকতে থাকতে কাজলের একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলে ভাল হত। তোমরা এখন ওটার ওপর নজর দাও।"

মহীন কোনো সাড়া দিল না।

সতীন জামাইবাবুর কথাটা শুনল। যেমন হাঁটছিল, হাঁটতে লাগল।

হাঁটতে হাঁটতে সতীনের মনে হল, বাবা বেঁচে থাকতেই তাদের সংসারে যে যার মতন পৃথক হয়ে গেছে। বড়দা বড়দার মতন, মেজদা মেজদার মতন। সতীনের কিছু হবার নেই তাই হতে পারে নি। খুকির কথা সতীন ধরছে না; খুকি মেয়ে, সে তো আজ হোক কাল

হোক আলাদা হয়ে যাবেই, যেমন দিদি গিয়েছে। দিদি তার বাপের বাড়ির ব্যাপারে মাঝে মাঝে কর্তৃত্ব করতে আসে, দিদির কথার দামও খানিকটা আছে—তবু দিদি তো সতীনদের সংসারের মানুষ আর নয়। খুকিরও ওই রকম হবে।

বড়দা যে কতটা আলাদা হয়ে গিয়েছে আজকাল স্পষ্টই চোখে পড়ে। সে তার বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে আলাদাই বলা যায়। নিজের ছেলেমেয়েদের জলখাবারের ব্যবস্থা বউদি এখন আলাদা করেই করে, সংসারের বারোয়ারী খরচের মধ্যে ওটা জড়ায় না। ডিম, দুধ, ওভালটিন, প্যাসট্রি, ফলটল ছেলেমেয়ের জন্যে আলাদা ভাবে কেনা হয়, রাখাও হয় আলাদা করে। বড়দার সুবিধার জন্যে একটা আলাদা হিটার আর মিটসেফ গিয়েছে ওপরে। বাবুর চা জলখাবার হয় বিকেলের। বাড়ির ট্যাক্স এবং ইলেকট্রিক বিল নিয়েও বড়দা মেজদার হালে একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে। বড়দা চায়, মেজদা সমস্ত খরচের অর্ধেকটা দিক। মেজদা দেব না বলে নি, তবে বলেছে—তোমার অসুবিধে থাকলে পুরোটাই না হয় আমি দেব, কিন্তু এই ধরনের প্যাঁচালো কথাবার্তা ছাড়ো। বড়দা নিজে মেজদার মুখোমুখি হতে চায় না, বউদিকে দিয়ে কথা বলায়। মেজদা বউদিকে সাফসুফ যা বলার বলে দেয়। দুজনে কথা ঠোকাঠুকিও চলে। সেদিন কোন কথায় ঝপ করে বেরিয়ে পড়ল যে বড়দা কোথায় যেন জমি কিনছে। মেজদা বউদিকে হাসিঠাট্টা করতে করতে বেশ ধুইয়ে দিল।

বড়দা যে জমিপত্তর কিনছে এটা বাড়িতে মাঝে মাঝে সন্দেহ করা হত। এখন আর সন্দেহ নয়, সতীনরাও জেনে গিয়েছে। খুকির ধারণা বড়দা লেক গার্ডেনস্‌এ জমি কিনেছে; সতীন শুনেছে লেক টাউনে। জমি কেনা হয়ে গিয়েছে না হব-হব করছে তা নিয়েও দুই ভাই-বোনের মধ্যে কথা হয় মাঝে মাঝে।

যাক গে, ও-সব কথা যাক—বড়দা কোথায় জমি কিনেছে, কেনা হয়ে গিয়েছে না হবে—তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। সোজা কথাটা এই, এই বাড়িতে থেকেও বড়দা আলাদা হয়ে যাচ্ছিল তার বউ

ছেলেমেয়ে নিয়ে। এ-বাড়ির শিক্ষা সহবত, এ-পাড়ার হাওয়া, এখানকার মানুষজন ওদের আর ভাল লাগছিল না। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, বড়দা আলাদা হয়ে যাচ্ছিল, আলাদা হয়েই যাবে। তার চালচলন, ধাত, নজর বদলে ফেলবে পুরোপুরি।

মেজদার ব্যাপার সতীন ধরতে পারছে না। তবে জগন্ময়ের মুখ থেকে যা শুনেছে সতীন তাতে বুঝতে পেরেছে, মেজদা যতই লেখাপড়া শেখা মানুষ হোক, কলেজের মাস্টার হোক, মেজদা অন্য একজনের বউয়ের সঙ্গে প্রেম-ভালবাসা করছে। জগন্ময়ের কথা সতীন অবিশ্বাস করতে পারত যদি না অনেক আগেই সেই চিঠি নিজের চোখে দেখত সতীন। অবিশ্বাসের কোথাও আর কিছু নেই। জগন্ময় যা বলেছে সবই সত্যি। জগন্ময় এটাও বলেছে, মহিলা কৃশ্চান। নিজেও কৃশ্চান জগন্ময়। কৃশ্চান মেয়ে হোস্টেলেই মহিলাকে নামিয়ে দিয়েছিল জগন্ময়। এরপর আর কথা কী?

বড়দার মতন না হলেও মেজদাও যে আলাদা হয়ে যাবে সতীন বুঝতেই পারছে। এমনিতেই মেজদা বাড়ির মধ্যে গা আলগা করেই থাকত বরাবর, কেমন একলা একলা, নিজের ঘর, নিজের বইপত্র, পড়াশোনা, কলেজ—এই সব নিয়ে। কাজেই এরপর, মাথার ওপর বাবা নেই, বড়দা পালাতে চাইছে—মেজদাই বা কোন্ দুঃখে বসে বসে কাঁদবে। মেজদাও আলাদা হয়ে যাবে, পরের বউ নিয়ে ঘর করতে হলে আলাদা না হয়ে উপায় কী! মেজদার এই ব্যাপারটা দিদি, দাদা, অন্য অন্য আত্মীয়রা কেউ সহ্য করবে না। সামাজিকতায় আটকাবে, ধর্মেও।...আবার মেজদারও এমন স্বভাব, যদি মনে মনে ভাবে, সে যা করছে সেটা ঠিক, তবে মেজদা সে-কাজ করবেই, কেউ রুখতে পারবে না। তা ছাড়া মেজদা তো অনেক কিছুই বিশ্বাস করে না, মানে না। এখানেও মানবে না। ওই মহিলা পরের বউ হোক, আর কৃশ্চানই হোক, কিছুই গ্রাহ্য করবে না সে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে এ-বাড়ির সবই ভেঙে গেল। দিদি অনেক আগেই পরের বাড়িতে চলে গেছে ; মা মারা গিয়েছে বেশ কয়েক বছর

হয়ে গেল। বাবা ছিল, বাবাও চলে গেল। বড়দা নিজের বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাবে, আজ কিংবা কাল। মেজদাও যে দিকে পা বাড়িয়েছে তাতে তাকেও আর ধরে রাখা যাবে না। থাকার মধ্যে খুকি আর সতীন। খুকিরও বিয়ে হয়ে যাবে যেমন করে হোক। তা হলে এক সতীনই থাকল।

নিজেকে সতীন আচমকা বড় একা, অসহায়, অক্ষম মনে করল। অদ্ভুত এক শূন্যতা যেন চারপাশে, তার আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। বুকের মধ্যে কিসের যে কষ্ট হল কে জানে, দু চোখে জল এসে পড়ল। হাঁটতে হাঁটতে চোখের জল মুছে নিল কোরা কাপড়ের খুঁটে।

শ্মশান থেকে বাড়ি ফিরতেই আবার কান্নার রোল উঠেছিল। অল্পক্ষণেই থামল। নীচের কলঘরে জল ছিল। পা ধুয়ে সিঁড়ির কাছে আসতেই দিদি বলল, "আগুনে হাত দিয়ে এই তেতোটা দাঁতে কাট। আর এইটে জিবে দে!"

সতীন দিদির হাতে-ধরা মালসার আগুনে হাত রেখে তাপ নিল। রেকাবি থেকে নিমপাতা নিয়ে দাঁতে কাটল। একটু চিনি জিবে ছোঁয়াল। উমানাথরা এবার চলে যাচ্ছে। তারক বলল, "সতু, কাল সকালে আসব।"

বন্ধুরা চলে গেলে সতীন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল। বড়দার ঘরে কারা যেন রয়েছে। হয়ত তার শালা-টালা। বাবার ঘরে এল সতীন। ফাঁকা ঘর। ধোয়া মোছা। বাবার খাট একেবারে ফাঁকা। একটা সতরঞ্জি পাতা রয়েছে। আলনা পরিষ্কার। ছড়িটড়ি কোণের দিকে রাখা। ঘরের মাঝখানে একটা প্রদীপ জ্বলছে। খুকি ঘরের একপাশে বসে আছে, পাশে জামাইবাবু। মেজদা ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

সতীন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। ঘরের বাতিটা ম্লান। বাবার ঘরে যেমন জ্বলত—সেই রকমই জ্বলছে। জানলা ভেজানো। ফাঁকা

খাটের দিকে তাকিয়ে থাকল সতীন। বাবা নেই। তবু এতকালের অভ্যস্ত চোখে বাবা যেন চোখের তলায় শুয়ে ছিল। সতীন বাবাকে দেখছে না, তবু দেখছে। দুর্বল, রুগ্ন, অসহায় বাবা।

দিদি পাশে ছিল, চাপা গলায় বলল, "ওই পিদিমের কাছে গিয়ে বোস্। বাবাকে প্রণাম কর্।"

দু মুহূর্ত দাঁড়িয়ে সতীন আস্তে আস্তে দু-তিন পা এগিয়ে গেল। নীচু হল। তারপর হাঁটু মুড়ে পিঠ এগিয়ে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করল বাবাকে। তার মাথার সামনে প্রদীপটা জ্বলছে।

প্রণাম করতে করতে সতীন শুনল কাজল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মাথা তুলল না সতীন। বুকের তলা থেকে সমস্ত শরীর দুমড়ে মুচড়ে ভীষণ এক কান্না এল তার। ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল সতীন। কাজলও কাঁদছে।

কাঁদতে কাঁদতে সতীন বাবাকে মনে মনে কী বলল কে জানে।

মাথা তুলে সতীন এবার বসল। তার গাল গড়িয়ে জল পড়ছে। চোখ ঝাপসা। কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না স্পষ্ট করে, সবই ঝাপসা। ঘরে আর কেউ কাঁদছে না। একেবারে চুপচাপ সব।

বাবার বিছানার দিকে তাকাল সতীন। কেউ নেই। ফাঁকা খাট পড়ে আছে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে সতীনের কেমন মনে হল, যে মানুষটি চলে গেল সেই মানুষটির সঙ্গে সতীনের কেমন যেন ব্যবধান থেকে গেছে। মানুষটি তার বাবা ছিল। তবু বাবা এবং সতীনের মধ্যে কেমন যেন একটা দূরত্ব থেকে গেছে। ছেলে হয়েও সতীন বাবার ঠিক অতটা কাছে এগুতে পারে নি—দিদি বা বড়দা যতটা পেরেছে। এমন কি খুকিও। কেন? কেন সতীন তার বাবার বুকের গোড়ায় যেতে পারে নি? কেন বাবা তাকে একান্ত করে জড়িয়ে ধরে নি?

বাবার ওপর ঠিক অভিমান হল না সতীনের; বরং নিজের ওপরই তার ঘৃণা হল। সে বয়সে শুধু ছোট বলেই নয়, বিদ্যায়বুদ্ধিতে, লেখা-

পড়ায়; স্বভাবে, দায়িত্বে বাবার কাছে কোনোদিন যোগ্য বলে তার পরিচয় দিল না। সে অযোগ্য, বোকা, অক্ষম, অকর্মণ্য। বাবা তাকে তাই ভাবত। আর সতীন তার বাবাকে বরাবর তফাত থেকে দেখেই এসেছে। বাবার জন্যে তার, নিজেরই বা কতটুকু মায়া-মমতা টান ছিল? বাবার জন্যে সে কবে ছট্‌ফট করে বেড়িয়েছে? কবে বাবার দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে?

সতীনের গলা বুজে আবার কান্না এল। মাথা নাড়ল সতীন। বাবাকে সত্যি সত্যিই সতীন কোনোদিন বুঝতে পারে নি। বাবাও তাকে বোঝে নি। এই অদ্ভুত, ভীষণ ফাঁক আর ভরতি করা যাবে না। বাবা নেই। বাবা চলে গেছে। সতীন আছে।

প্রথম পর্ব সমাপ্ত